মাসুদ রানা

স্পর্ধা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

স্পর্ধা

কাজী আনোয়ার হোসেন

নিজ দেশে
কবির চৌধুরীর হাতে আটকা পড়েছেন
খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
সাথে রয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দুই তেল-সম্রাট—
একজন বাদশাহ, আরেকজন প্রিন্স।
ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা হয়ে গেছে সবাই।
কেউ যখন কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না,
তখন এক এক করে বুদ্ধি দিতে শুরু করল
প্রেসিডেন্টের সহযাত্রী ভারতীয় এক
বাঙালী ছোকরা। সাংবাদিক।
অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল গোল্ডেন গেট ব্রিজে।
পাগল হওয়ার দশা হলো পাগল-বৈজ্ঞানিকের।
কেন জানি ছোকরাটার সাথে মাঝে মাঝেই
মিল পাচ্ছে কবীর চৌধুরী মাসুদ রানার।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

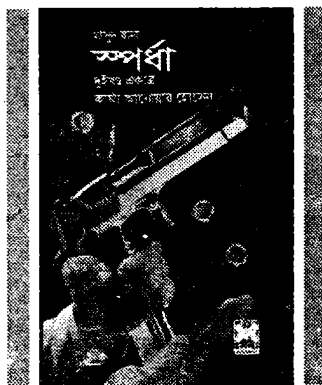
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

স্পর্ধা

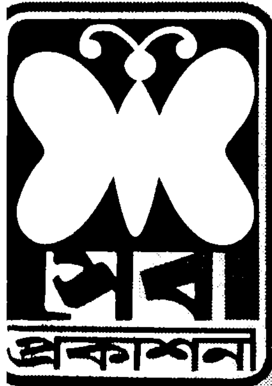
(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7129-8



বাহাত্তর টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SPARDHA
Part: I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৮০/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অনধিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৭৬/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিপর্যস্ত+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস	৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৭৪/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ যুদ্ধের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চন্দ্রদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

স্পর্ধা-১

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

এক

পুলিস নয়, পুলিসের ইউনিফর্ম পরে আছে। প্রকাণ্ড শরীর, তার সাথে মানানসই বড় একটা মাথা। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, কোঁকড়া। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে আভিজাত্য। গোটা অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রতিভার ছটা। একনজর তাকালেই মনে হয়, যুগস্রষ্টা কালজয়ী পুরুষ হওয়ার জন্যেই যেন তার জন্ম। পুলিস ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় একেবারেই তাকে মানায় না।

তার যা প্ল্যান, সেটাকে দুঃসাহসিক বললেও কম বলা হয়। চিন্তাটা সম্ভবত বদ্ধ কোন উন্মাদের মাথাতেই শুধু আসতে পারে, কিংবা আসতে পারে দুর্লভ কোন প্রতিভার মাথায়। এই অপারেশন সফল করে তুলতে হলে থাকতে হবে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা—তা তার আছে। এমন ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়—পায়নি। দরকার অকুতোভয়, বিশ্বস্ত, নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মী—যোগাড় হয়েছে। ছোট বড় খুঁটিনাটি হাজারটা কাজ, এর কোনটাতেই এতটুকু খুঁত থাকা চলবে না, তাই বার বার রিহার্সেল দিয়ে যান্ত্রিক নৈপুণ্য আদায় করা দরকার—কর্মীদের সেভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য সমস্ত বাধা বিঘ্নের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছে এই প্ল্যান, কোথাও কোন গোলযোগ দেখা দিলে কি করতে হবে তাও সবাইকে জানিয়ে রাখা হয়েছে।

জায়গাটা ড্যালি সিটি আর সান ফ্রান্সিসকোর মাঝখানে, লেক মারসেড। বাতিল একটা গ্যারেজের ভেতর রয়েছে ওরা। কবীর চৌধুরীকে নিয়ে মোট বারোজন। ওদের মধ্যে আরও তিনজনের পরনে রয়েছে পুলিসের ইউনিফর্ম।

গ্যারেজ মানে মুখ খোলা একটা শেড। ছাল ওঠা কংক্রিটের মেঝেতে ইঁদুরের বড় বড় গর্ত। দেয়াল আর সিলিঙে মাকড়সার জাল। শেডের ভেতর একটা মাত্র গাড়ি, পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। বাসের মত দেখতে, কিন্তু বাস নয়। চকচকে একটা যান্ত্রিক দানব, কাঁধ সমান উঁচু থেকে পুরোটাই নীলচে কাঁচ দিয়ে ঢাকা। বাসে যেমন সীট থাকে, এতে তা নেই, আছে ত্রিশটা সুইভেল চেয়ার। চেয়ারগুলো পাশাপাশি বা সার করে ফেলা হয়নি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে, সৌখিন কোটিপতির বৈঠকখানায় যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি চেয়ারের সাথে একটা করে ডাইনিং টেবিল, বিলাস বহুল বিমানে যেমন থাকে, টানলেই বেরিয়ে আসবে। পিছনের দিকে রয়েছে একটা ক্লোকরুম আর বার। এগুলোর পিছনে অবজারভেশন ডেক।

অবজারভেশন ডেকের মেঝে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নিচে দেখা যাচ্ছে গভীর খাদ আকৃতির ব্যাগেজ ডিপার্টমেন্ট। জায়গাটা লম্বা-চওড়ায় সমান, সাড়ে সাত ফিট। ব্যাগ-ব্যাগেজের বদলে ভেতরে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে রয়েছে একজোড়া জেনারেটর, কয়েকজোড়া সার্চলাইট, তার মধ্যে দুটো বিশ ইঞ্চি: একজোড়া অদ্ভুত দর্শন অস্ত্র, তেপায়া সহ, দেখতে অনেকটা মিসাইলের মত; মেশিন-পিস্তল; দুটো বড় আর চারটে ছোট কাঠের বাক্স; একপ্রস্থ রশি। কবীর চৌধুরীর লোকজন এখনও মালপত্তর ভরছে।

এই কোচ কিনতে কবীর চৌধুরীর পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে নব্বুই হাজার ডলার। যে কাজে এটাকে ব্যবহার করা হবে তার তুলনায় এই বিনিয়োগ নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে করছে সে। ডেট্রয়েটের একটা কোম্পানী এই কোচের নির্মাতা, সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টা কোচ বানিয়েছে তারা কোচটা রস পেরট-কে দিয়ে কিনিয়েছে কবীর চৌধুরী। পেরট কোম্পানীকে জানায়, তার মালিক একজন প্রচারবিমুখ মিলিওনিয়ার, কোচটাকে তিনি হলুদ রঙ করা অবস্থায় ডেলিভারি নিতে ইচ্ছে করেন। ডেলিভারি নেয়ার সময় ওটার রঙ হলুদই ছিল, কিন্তু এখন ওটা দুধ-সাদা।

বাকি পাঁচটা কোচের মধ্যে দুটো কিনেছে দু'জন মিলিওনিয়ার, তারা অবসর বিনোদনের জন্যে ব্যবহার করবে ওগুলো। এই দুটো কোচের পিছনে খানিকটা করে জায়গা আছে, একটা করে মিনি কার রাখার জন্যে। আশা করা যায় কোচ দুটোর জন্যে বিশেষভাবে দুটো গ্যারেজ তৈরি করা হয়েছে, এবং বছরের পঞ্চাশ হপ্তাই ওগুলো বিশ্রাম নেবে সেখানে।

বাকি তিনটে কোচ কিনেছে সরকার।

ভোরের আলো ফুটতে আরও একটু দেরি আছে তখনও।

সান ফ্রান্সিসকোর সরকারী গ্যারেজে রয়েছে কোচ তিনটে। সবগুলোই সাদা। দেয়ালে পিঠ ঠেকানো একটা ক্যানভাস চেয়ারে বসে নাক ডাকছে গার্ড। তার কোলের ওপর পড়ে রয়েছে রায়টগান, হাত দুটো চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে। পিছনের ছোট দরজা দিয়ে ওরা দু'জন যখন ঢুকল, গার্ড তখন ঝিমাচ্ছিল। গ্যাস গানের ট্রিগার টানলে কোন আওয়াজ হয় না, হলেও ঝিমুনি ভাবটা কাটিয়ে জেগে উঠতে পারত না গার্ড, কারণ গ্যাসটুকু ফুসফুস স্পর্শ করা মাত্র গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে সে। ঝিমুনির মধ্যে কি ঘটে গেছে, কিছুই তার জানা নেই। এক ঘণ্টা পর যখন তার ঘুম ভাঙবে, ঘুমটা এত গভীর আর দীর্ঘ হলো কেন ভেবে একটু হয়তো অবাক হবে সে, কিন্তু যা ঘটে গেছে তার কিছুই টের পাবে না। ঘুমিয়ে পড়েছিল, এই অপরাধটা সে তার বসের কাছে স্বীকার করবে বলে মনে হয় না।

তিনটেই কবীর চৌধুরীর কোচের মত দেখতে। তবে মাঝখানেরটা তার সঙ্গীদের চেয়ে দু'টন বেশি ভারী। এর কারণ, সাধারণ প্লেট গ্লাসের বদলে এতে রয়েছে বুলেট প্রুফ কাঁচ। এই কোচের ভেতরের অঙ্গসজ্জা এমনই মনোলোভা আর বিলাসবহুল যে একজন ভোগসুখপরায়ণ ভাগ্যবান পুরুষই শুধু এটাকে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারে। কোচটাকে এভাবে তৈরি করার কারণ আর কিছুই নয়, খোদ মহামান্য প্রেসিডেন্ট এটাকে তাঁর ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে ব্যবহার করবেন।

তাই এর নামকরণ করা হয়েছে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ। দুই সেট সোফা, পরস্পরের দিকে মুখ করে ফেলা হয়েছে। মোটাসোটা একজন মানুষ, ঘটে যার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, এই সোফায় বসার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। সোফাগুলো এতই নরম, এতই গভীর আর আরামদায়ক যে ভারী একজন লোক বসার পর উঠতে চাইলে হয় প্রচণ্ড ইচ্ছে-শক্তির নয়তো আর কারও সাহায্য নিতে হবে তাকে। চারটে আর্মচেয়ারের ব্যাপারেও এই কথা খাটে। বসার আয়োজন বলতে এই। দরকার হলেই বরফ-পানি পাওয়া যাবে, কিন্তু কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার উৎসমুখ। চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কফি টেবিল। অনেকগুলো সোনালি ফুলদানি, দৈনিক বরাদ্দের তাজা ফুল এখনও পৌঁছায়নি এসে। এই অংশের সামনের দিকে রয়েছে ওয়াশরূম আর বার। সাধারণত বারের রেফ্রিজারেটরে দুনিয়ার সেরা মদ থাকে, কিন্তু বিশেষ কারণে আজ তা নেই। মদের বদলে ওতে রয়েছে ফ্রুট জুস আর সফট ড্রিঙ্ক। বিশেষ কারণটা হলো, এবার যাঁরা প্রেসিডেন্টের মেহমান হয়ে এসেছেন তাঁদের মদ স্পর্শ করা মানা, সবাই আরব এবং মুসলমান।

ওয়াশরূম আর বারের পর কমিউনিকেশন সেন্টার, কোচের পুরোটা প্রস্থ জুড়ে যার বিস্তৃতি। প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মেলা বসেছে, প্রেসিডেন্ট কোচে থাকলে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয়ার জন্যে লোক থাকে এখানে। বলা হয়, কোচের যা দাম তারচেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়েছে এই কম্পার্টমেন্ট গড়ে তুলতে। যে রেডিও টেলিফোন সিস্টেমটা রয়েছে তার সাহায্যে দুনিয়ার যে-কোন শহরের সাথে যোগাযোগ করা যায়। কাঁচের আবরণে মোড়া একসেট রঙিন বোতাম আছে, বিশেষ চাবি ছাড়া ওই আবরণ সরানো সম্ভব নয়। মোট পাঁচটা বোতাম। প্রথমটা টিপলে সাথে সাথে যোগাযোগ ঘটবে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সাথে। দ্বিতীয়টা পেন্টাগনের জন্যে। তিন নম্বর বোতাম এয়ারবোর্ন স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের জন্যে। চার নম্বর, মস্কোর সাথে যোগাযোগ। পাঁচ নম্বর, লন্ডনের সাথে। এই কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা ফোন লাইন চলে গেছে প্রেসিডেন্টের জন্যে নির্দিষ্ট সীটের পাশে।

কিন্তু আগন্তুকরা প্রেসিডেনশিয়াল কোচ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। তারা সামনের দরজা দিয়ে বাঁ দিকের কোচে ঢুকল, সাথে সাথে ড্রাইভারের সীটের পাশ থেকে সরিয়ে ফেলল একটা মেটাল প্লেট। নিচের দিকে টর্চের আলো ফেলল একজন লোক, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখে বোঝা গেল যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কাছ থেকে একটা জিনিস নিল সে। পুটিন ভরা পলিথিন ব্যাগের মত দেখতে জিনিসটা, তার সাথে জোড়া লাগানো রয়েছে একটা মেটাল সিলিন্ডার—লম্বায় তিন ইঞ্চির বেশি হবে না, ডায়ামিটারে একইঞ্চি। সিলিন্ডারটা অ্যাঢেসিভ টেপ দিয়ে একটা ধাতব অবলম্বনের সাথে আটকাল সে। কাজ করার সহজ সাবলীল ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, যা করছে সে-সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে। লোকটা একহারা চেহারার, শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই, নাম চেসটন—একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট।

পিছনের দিকে চলে এসে বারে ঢুকল ওরা। বারের পিছনে, একটা টুলের ওপর

দাঁড়াল চেস্টন, ওভারহেড কাবার্ডের দরজা হাত দিয়ে সরিয়ে ভেতরে তাকাল। প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রায় এবার যারা তাঁর সঙ্গী হবে, তাদের আর যাই অসুবিধে হোক, তেষ্টায় কোনরকম কষ্ট পেতে হবে না। মদের বোতলগুলো দু'ভাগে ভাগ করে খাড়া অবস্থায় রাখা হয়েছে। বাঁ দিকে দশটা বোতল, প্রতি সারিতে পাঁচটা করে, বুরবন আর স্কচ। কাবার্ড থেকে চোখ নামিয়ে নিচে তাকাল চেস্টন, তারপর ঝুঁকে পড়ে কাবার্ডের বাইরে যে বোতলগুলো রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করল। ভেতর আর বাইরের বোতলগুলোর মধ্যে কোন অমিল নেই, বাইরেরগুলোও সম্পূর্ণ ভরা। তার মানে বোঝা যায়, বাইরেরগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাবার্ডের ভেতর কেউ হাত লাগাবে না।

কাবার্ডের গোল ঘরগুলো থেকে দশটা বোতল তুলে সঙ্গীর হাতে দিল চেস্টন। সঙ্গী পাঁচটা বোতল রাখল কাউন্টারে, বাকি পাঁচটা ভরল তার ক্যানভাস ব্যাগে। এরপর চেস্টনকে অদ্ভুতদর্শন একটা ইকুইপমেন্ট দিল সে। জিনিসটার তিনটে অংশ। ছোট একটা সিলিন্ডার, কোচের সামনে যেটা ফিট করা হয়েছে এটা সেই রকমই দেখতে। একটা মৌচাক আকৃতির ডিভাইস, লম্বায় এবং ডায়ামিটারে সমান, দু'ইঞ্চি। আরেকটা ডিভাইস, দেখতে গাড়ির ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মত, তবে এটার একটা প্লাস্টিক হেড রয়েছে। ওটা আর মৌচাক তার দিয়ে সিলিন্ডারের সাথে জোড়া লাগানো।

মৌচাকের গোড়ায় রাবারের একটা শোষ-নল রয়েছে, কিন্তু জিনিসটার ওপর তেমন আস্থা নেই চেস্টনের। দ্রুত কাজ করে এই রকম একটা সিরিশের টিউব পকেট থেকে বের করে মৌচাকের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঠা লাগাল সে, আঠা লাগানো দিকটা কাবার্ডের গায়ের সাথে চেপে ধরল। এরপর বড় আর ছোট সিলিন্ডারের সাথে জিনিসটাকে জুড়ে দিল, সবশেষে তিনটে জিনিসই ভেতর দিকের গোল ঘরের সাথে, যে ঘরগুলোয় বোতল রাখা হয়, টেপ দিয়ে আটকাল। পাঁচটা বোতল নিয়ে সামনের গোল ঘরগুলোয় আবার রাখল সে। ডিভাইসটা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেল, কাবার্ড খুললেও সহজে কেউ দেখতে পাবে না।

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করে টুল থেকে নামল চেস্টন। টুলটা আগের জায়গায় রেখে বাস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গার্ড তখনও শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, তার নাক ডাকার ছন্দে কোন পতন ঘটছে না। গ্যারেজ থেকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করল চেস্টন। জিজ্ঞেস করল, 'এস-ওয়ান?'

ড্যালি সিটির উত্তরে বাতিল গ্যারেজের ভেতর তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড।' কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত, আনন্দ বা উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই তাতে, তা থাকার কোন কারণও নেই। একটানা ছয় হপ্তা প্রস্তুতি নেয়ার পর আজ কাজ করার সময় কোন ত্রুটি দেখা দিলেই বরং আশ্চর্য হত সে। 'তুমি আর জ্যাক অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাও। অপেক্ষা করো।'

*

টম ওয়াল্টার আর জন মারকুয়েজ, দু'জনের অনেক কিছুই অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। সুদর্শন, আকার-আকৃতি প্রায় একই, ওয়াল্টারের বয়স যদি পঁচিশ হয় মারকুয়েজের বয়স চব্বিশ কিংবা ছাব্বিশ হবে, দু'জনেরই মাথায় রয়েছে সোনালি চুল।

এই হোটেল কামরায় যে দু'জন শুয়ে ছিল, এইমাত্র যাদের ঘুম ভেঙেছে, তাদের সাথেও ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের অদ্ভুত সব মিল রয়েছে। বিশেষ করে গায়ের রঙ আর শারীরিক গঠন, চারজনের প্রায় একই রকম। চেহারায় ক্রোধ আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা, চোখে এখন আর ঘুমের লেশমাত্র নেই, কিন্তু লাল হয়ে আছে। ওদের একজন তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল, 'তোমরা কারা? কি চাও? জানো, আমরা কারা?' চট করে আরেকবার ওয়াল্টারের হাতটা দেখে নিল। 'ভেবেছ, তোমার হাতের খেলনা দেখে আমরা ভয় পাব? বেরোও, বেরিয়ে যাও...'

'আরে এসব কি!' অবাক হবার ভান করল ওয়াল্টার, কিন্তু তার কথা বলার ভঙ্গিটা হাস্য-রসাত্মক। 'ভদ্রলোকেরা এভাবে চিৎকার করে নাকি! বেরিয়ে যাও...একজন ন্যাভাল অফিসার হয়ে এরকম ভাষা ব্যবহার করছ, ছি!' নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে বেরেটা পিস্তলটা দেখল সে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল সাইলেন্সার, তারপর মুখ তুলে আবার বলল, 'তুমিও জানো, এটা খেলনা নয়।'

মুখে যাই বলুক, খেলনা যে নয় লোকটা তা জানে। ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের আচরণে শান্ত ঠাণ্ডা একটা পেশাদারী ভাব আছে, সেটাই ওদের দু'জনকে ভয় পাইয়ে দিল। বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে কি ঘটবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হলো না, তাই চুপচাপ শুয়েই থাকল ওরা।

বেরেটা ধরা হাতটা ওয়াল্টারের শরীরের পাশে ঢিলে ভঙ্গিতে ঝুলছে, পিস্তলটা ধরে আছে অবহেলার সাথে। কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা লেদার ব্যাগ খুলল মারকুয়েজ, ভেতর থেকে বের করল একপ্রস্থ রশি। লোক দু'জনকে এত দ্রুত আর শক্ত করে বেঁধে ফেলল সে, বুঝতে অসুবিধে হয় না দীর্ঘদিন চর্চার ফলে আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছে এই কাজে। তার কাজ শেষ হতে একটা কাবার্ড খুলল ওয়াল্টার, ভেতর থেকে একজোড়া স্যুট বের করল, তার একটা মারকুয়েজকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'গায়ে হয় কিনা দেখো।'

গায়ে তো স্যুটগুলো হলোই, হ্যাটগুলোও হলো মাথায়। হ্যাট বা স্যুট ছোট-বড় হলেই বরং আশ্চর্য হত ওয়াল্টার। বস্ সম্পর্কে জানা আছে তার, মিস্টার কবীর চৌধুরী আগেই সব তথ্য যোগাড় করে রাখেন, যাতে কাজের সময় কোন অসুবিধেতে পড়তে না হয়।

ছয় ফিট লম্বা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করল মারকুয়েজ। চেহারায় ক্ষীণ একটু বিষণ্ন ভাব ফুটল, বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আমার আসলে আইনের লোক হওয়াই উচিত ছিল। দেখো না, ইউ.এস. নেভীর একজন লেফটেন্যান্টের স্যুট কি চমৎকার মানিয়ে গেছে আমাকে।' ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াল্টারের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকেও কিন্তু দারুণ মানিয়েছে।'

বন্দীদের একজন জানতে চাইল, 'এই ইউনিফর্ম তোমরা কেন চু…' নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'এই ইউনিফর্ম কেন দরকার তোমাদের?'

'বোকাদের নিয়ে এই এক জ্বালা! ইউনিফর্ম কেন দরকার, এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকছে না?'

বন্দী লোকটার চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল, 'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ…'

'হ্যাঁ। এবং তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, সিকোরস্কি, আমরা তোমাদের চেয়ে ভালই চালাতে পারি।'

'কিন্তু ইউনিফর্ম! এ-জিনিস তো তোমরা বানিয়েও নিতে পারতে! এত ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার ছিল!'

'তোমাদের সাথে কিছু ডকুমেন্ট থাকে—আইডেনটিফিকেশন, লাইসেন্স ইত্যাদি। ওগুলোও আমাদের দরকার।' ওয়াল্টার তার সদ্য পরা স্যুটের পকেটে চাপড় দিল। 'এতে নেই। কোথায় আছে?'

অপর বন্দী বলল, 'পচে মরো, জাহান্নামে যাও!'

ওয়াল্টার উত্তেজিত হলো না। বলল, 'তোমরা এখন অসহায়। বেয়াদবি করলে মারব। কথা শুনলে আদর হয়তো করব না, কিন্তু টরচারের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কোথায়?'

প্রথম লোকটা বলল, 'নেভী ওগুলোকে ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট বলে মনে করে। আমাদের ওপর হুকুম ছিল, তাই কাগজপত্র সব ম্যানেজারের সেফে জমা রেখেছি।'

অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াল্টার। 'কি জ্বালাতন, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ কেন!'

'বিশ্বাস না করলে…'

প্রথম বন্দীকে বাধা দিয়ে ওয়াল্টার বলল, 'কাল সন্ধের সময় এই হোটেলে উঠেছ তোমরা। রিসেপশনিস্টের পাশে একটা আর্মচেয়ারে কে বসেছিল, মনে আছে?'

'কে?'

'লালচুলো একটা মেয়ে? সুন্দরী? মনে পড়ে?'

বন্দীরা চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। বোঝা গেল, মনে পড়েছে।

'মেয়েটা ফিরে খেয়ে বলেছে, তোমরা কেউই কিছু জমা রাখোনি। কাজেই, তোমরা মিথ্যে কথা বলছ।'

'সত্যি-মিথ্যে বুঝি না,' দ্বিতীয় বন্দী বলল, 'ডকুমেন্ট তোমরা পাবে না।'

ওয়াল্টার এমন ভাবে শুরু করল, লোকটার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'তোমাদের সামনে তিনটে পথ খোলা আছে। হয় বলবে। না হয় আমরা তোমাদের মুখ বেঁধে মারধর করার পর বলবে কিংবা, আমরা সার্চ করব, তোমরা দেখবে—অবশ্য, তখনও যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।'

প্রথম বন্দীকে নার্ভাস দেখাল। 'তোমরা কি আমাদেরকে…মানে, খুন করতে চাও?'

'কেন, খুন করব কেন?' সত্যি সত্যি যেন আকাশ থেকে পড়ল মারকুয়েজ।

'আমরা পুলিসের কাছে যাব,' দ্বিতীয় বন্দী বলল, 'আবার দেখলে তোমাদের চিনতে পারব।'

'তোমরা আর আমাদের দেখবে না।'

'কিন্তু মেয়েটাকে? ওকেও আমরা চিনতে পারব…'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ওয়াল্টার। 'সে তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে।' মারকুয়েজের দিকে তাকাল সে। 'যন্ত্রপাতি বের করো। এভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

লেদার ব্যাগ থেকে এক জোড়া সরু মুখের প্লায়ার্স বের করল মারকুয়েজ। 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাদের মুখে টেপ লাগাতে যাচ্ছি আমি…।'

বন্দীরা আবার পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রথম জন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, দ্বিতীয় লোকটা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। প্রথমজন বলল, 'ভাগ্যে যা আছে তা তো ঘটবেই। শুধু শুধু নিজের চেহারা নষ্ট করতে যাই কেন?'

'এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা!'

'কার্পেটের তলায়। দরজার কাছে।'

কার্পেটের নিচেই পাওয়া গেল ডকুমেন্টগুলো, দুটো ওয়ালেটের ভেতর। ওয়ালেট খুলে ভেতরের কাগজপত্র দ্রুত পরীক্ষা করল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। দুটো ওয়ালেটেই বেশ কিছু ডলার রয়েছে, সেগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখল তারা।

তাই দেখে রাগে গর গর করে উঠল দ্বিতীয় বন্দী, বলল, 'চোর হলেও লোক তোমরা খারাপ নও!'

'ভুল করলে,' সবিনয়ে বলল মারকুয়েজ। 'আমরা চোর নই—ডাকাত। অল্পে সন্তুষ্ট নই, তাই ডলারগুলো নিচ্ছি না।' কথা শেষ করে স্যুটের পকেট থেকে আরও কিছু ডলার বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে। ওয়াল্টারও তাই করল।

টেবিলের ওপর প্রায় এক হাজার ডলার জমল। বন্দীরা আবার দৃষ্টি বিনিময় করল। একজন বলল, 'এত টাকা, আর তোমরা বলছ অল্প!'

'আমাদের নজর আরও বড়।'

হাতে প্লায়ার্স নিয়ে বিছানার দিকে এগোল মারকুয়েজ। 'এবার তোমাদের মুখ বন্ধ করব।'

বন্দীদের চোখে আতঙ্ক আর সন্দেহ ফুটে উঠল। একজন বলল, 'কিন্তু এইমাত্র বললে…' বিছানার ওপর উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'ভয় পেয়ো না। মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে গুলি করতাম, সাইলেন্সার থাকায় কোন শব্দ হত না। ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে গেলেই চিৎকার করে লোক জড়ো করবে, তা হতে দিই কিভাবে? কিছু না, মুখে শুধু টেপ লাগাব।'

বন্দীদের মুখ বন্ধ করার পর ওয়াল্টার বলল, 'আমরা যে কাপড়গুলো রেখে যাচ্ছি, ওগুলো পরো তোমরা। ইউ. এস. নেভীর অফিসাররা শুধু আন্ডারঅয়্যার পরে রাস্তায় বেরুবে,' শিউরে উঠল সে, 'ভাবা যায় না!'

'আমরা চলে যাবার পর তোমরা ক্যাঙ্গারু নাচ নাচবে, জানি,' বলল

মারকুয়েজ। লেদার ব্যাগ থেকে একটা গ্যাস গান বের করল সে। 'কিন্তু তা আমরা চাই না। আমরা চাই, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক শান্তিতে ঘুমাও তোমরা। দুঃখিত,' বলে গ্যাস গানের ব্যারেল বন্দীদের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।

কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল ওরা। দরজার গায়ে ঝুলিয়ে দিল একটা নোটিস, তাতে লেখা, বিরক্ত করবেন না। এরপর তালার ভেতর প্লায়ার্স ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিল মারকুয়েজ, তালার কলকজা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। চাবি দিয়েও ওটাকে আর খোলা যাবে না, দরজা খুলতে হলে তালা ভাঙতে হবে।

নিচে নেমে এসে রিসেপশন ক্লার্কের দিকে এগোল ওরা। অল্প বয়স, প্রফুল্ল বদন। ওদেরকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হাসির সাথে সুপ্রভাত জানাল।

'কাল রাতে আপনার ডিউটি ছিল না,' মন্তব্য করল ওয়াল্টার।

'ছিল না, স্যার। ম্যানেজমেন্ট বিশ্বাস না করলেও, আসলে ডেস্ক ক্লার্কেরও মাঝে মধ্যে এক-আধটু ঘুম দরকার হয়।' হঠাৎ তার চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল। 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করব, স্যার?'

'কি প্রশ্ন?' ওয়াল্টারকে একটু সতর্ক দেখাল।

'আপনারাই তো প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রার ওপর হেলিকপ্টার নিয়ে পাহারায় থাকবেন, তাই না?'

ওয়াল্টার হাসল। 'হ্যাঁ। এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। কাল রাতে আমাদের নামে একটা অ্যালার্ম কল এসেছে—কার্টার আর মারটিন। কলটা কি রেকর্ড হয়ে গেছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'শুনুন,' গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে বলল ওয়াল্টার, 'কাজটা উচিত হচ্ছে না, তবু নেভীর কিছু জিনিস কামরায় রেখে যাচ্ছি আমরা। ওখানে কারও ঢোকা চলবে না। কাজ থেকে ফিরতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে আমাদের। আপনি যদি কথা দেন...'

'অবশ্যই কথা দিচ্ছি, আপনাদের কামরার ধারে কাছে যাবে না কেউ। এখুনি একটা নোটিস...'

'সেটা আমরা ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথম যে টেলিফোন বুদ পেল তার পাশে থামল ওরা। মারকুয়েজের কাছ থেকে লেদার ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়াল্টার। ব্যাগ থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করে সুইচ অন করল।

ড্যালি সিটির উত্তরে বাতিল গ্যারেজের ভেতর অপেক্ষা করছিল কবীর চৌধুরী। যোগাযোগ হতে ওয়াল্টার জানতে চাইল, 'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড। জায়গায় চলে যাও।'

সান ফ্রান্সিসকো থেকে উপসাগরের উত্তরে ম্যারিন কাউন্টি, জায়গাটার নাম

সসেলিটো। সসেলিটো থেকে অনেকটা ওপরে পাহাড়ী এলাকা, কেবিনগুলো একটার কাছ থেকে আরেকটা বহু দূরে, খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। এই রকম একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা ছয়জন। দেখে মনে হতে পারে, খেটে খাওয়া লোকের একটা দল। চারজনের পরনে ওভারঅল, নোংরা হয়ে আছে। বাকি দু'জনের গায়ে রঙ ওঠা রেনকোট। তোবড়ানো একটা স্টেশন ওয়াগনে চড়ে শহরের দিকে রওনা হলো তারা। তাদের দক্ষিণে গোল্ডেন গেট ব্রিজ আর সান ফ্রান্সিসকো, দিনের প্রথম রোদ লেগে ঝলমল করছে আকাশ ছোঁয়া সার সার অট্টালিকা।

মেইন রোডে উঠে এল স্টেশন ওয়াগন। নোঙর ফেলা কয়েকশো জলযান আর বোটহাউসকে পাশ কাটিয়ে এল ড্রাইভার, ঢুকে পড়ল একটা সাইড রোডে। ওয়াগন থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সে। পাশের লোকটাকে নিয়ে রাস্তায় নেমেই গা থেকে খুলে ফেলল রেনকোট, সাথে সাথে ইউনিফর্ম পরা ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট পেট্রলম্যান হয়ে গেল দু'জন। ড্রাইভারের নাম রজার হীল, পরনে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম। লোকটা ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা, মোটাসোটা, লালমুখো, চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাকে দেখে পুলিস বলেই মনে হয়, যদিও পুলিসের সাথে তার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। তার সঙ্গী, বব ইয়ং, সে-ও বেশ লম্বা, তবে মোটা নয়। ববের মুখে অনেকগুলো কাটাকুটির দাগ, বেশিরভাগই ধারাল ছুরির ডগা থেকে তৈরি হয়েছে। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে রাখা তার একটা বদভ্যাস।

পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। একটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল এলাকার পুলিস স্টেশনে। কাউন্টারের পিছনে দু'জন পুলিসকে দেখা গেল। একজন যুবক, অপরজন তার বাপের বয়েসী। দু'জনকেই ক্লান্ত আর ম্লান দেখাচ্ছে। তাদের লম্বা ডিউটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খানিক পরই বাড়ি ফিরে ঘুম দেবে। সার্জেন্ট আর পেট্রলম্যানকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারা। হাসি হাসি চেহারা করল, কিন্তু চোখে প্রশ্ন।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং,' রসিক অফিসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো রজার হীল। 'আমি সার্জেন্ট হীল, সাথে পেট্রলম্যান ইয়ং।' পকেট থেকে টাইপ করা একটা কাগজ বের করে চোখ বুলাল সে। 'তোমরা নিশ্চয়ই হাউসেন আর ফগেল? চেহারায় কিছুটা মিল আছে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বাপ-বেটা নও।'

'জ্বী, না,' বলল হাউসেন। যুবকের কথায় টেক্সাসের আঞ্চলিক টান। 'কিন্তু আপনি আমাদের নাম জানলেন কিভাবে?'

হাউসেনের মুখের সামনে হাতের কাগজটা একবার দোলাল হীল। 'এতে আছে।' হাসি খুশি চেহারায় একটু গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ল। 'বোঝা গেল, আমরা যে আসছি, তোমাদের বস্ সেটা তোমাদেরকে জানায়নি। ব্যাড, ভেরি ব্যাড। ব্যাপারটা আজ সকালের মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে। ফাইনাল চেক-আপ করতে বেরিয়ে এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড চোখে পড়ল, ইচ্ছে করলে এমন রিপোর্ট দিতে পারি, একটারও চাকরি থাকবে না। এই রাজ্যে বেশিরভাগ পুলিস হয় অশিক্ষিত, নয় পাথর—কানে শুনতে পায় না।'

বয়স্ক ফগেল সবিনয়ে শুরু করল, 'সার্জেন্ট, আমরা কি দোষ করেছি তা যদি জানতে পারি…'

'দোষ? তোমরা? না-না, তোমরা কেন দোষ করবে, সব আমার কপালের লিখন! তা না হলে ভোর অন্ধকার থাকতে কাজে বেরিয়েছি, এখনও পেটে দানাপানি পড়ল না কেন!' কাগজের ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে। 'চারটে জিনিস ঠিক আছে কিনা জানতে চাই আমি।'

'জ্বী, বলুন!'

'দিনের প্রথম পালা বদলের সময়। তারা ক'জন আসে পেট্রল কারগুলো কোথায় সেলগুলোর কি অবস্থা।' মুখস্থই ছিল হীলের; তবে অভিনয়টা নিখুঁত করার জন্যে কাগজে চোখ রেখে প্রশ্নগুলো করল সে।

'আর কিছু না?'

'না এখানে আমি দু'মিনিটের বেশি নষ্ট করতে রাজি নই। সেই রিচমন্ড পর্যন্ত সবক'টা পুলিস স্টেশনে যেতে হবে আমাকে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।'

'পালা বদল সকাল আটটায়,' বলল হাউসেন। 'এমনি সময়ে চারজন আসে, আজ আসবে আটজন। কারগুলো…' বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।

'চলো, দেখব।'

বোর্ড থেকে চাবি নামাল ফগেল। ওদেরকে পথ দেখিয়ে গ্যারেজে নিয়ে এল সে। চকচকে এক জোড়া পুলিস কার, যেন এইমাত্র শো-রুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। একজন প্রেসিডেন্ট, একজন কিং আর একজন প্রিন্স এই পুলিস স্টেশনের এলাকা দিয়ে যাবেন, তাই ঘষে-মেজে রঙ লাগিয়ে নতুন করে তোলা হয়েছে গাড়ি দুটোকে।

'ইগনিশন কী?'

'ইগনিশনে।'

অফিসরূমে ফিরে এসে প্রবেশ পথের দিকে তাকাল হীল, জানতে চাইল, 'চাবি?'

'জ্বী?'

চোখ বুজে একটু হাসল হীল, বলল, 'বলেছি না, পাথর!' তারপর চোখ মেলে কটমট করে তাকাল। 'আমিও জানি, দরজায় কখনোই তালা লাগানো হয় না। কিন্তু আজ সকালে মুহূর্তের নোটিসে তোমাদের সবাইকে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। তখন? তোমরা কি স্টেশন খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়বে?'

'ও, আচ্ছা,' বলে বোর্ডের দিকে হাত তুলে একটা চাবি দেখাল ফগেল।

'এবার, সেল দেখব।'

চাবি হাতে হীলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ফগেল। একটা প্যাসেজ ধরে খানিক এগিয়ে বাঁক নিল ওরা, এখন আর অফিস থেকে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। সেলের সামনে দাঁড়াল ফগেল।

'ভেতরে ঢুকব।'

সেলের তালা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ফগেল। ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল হীল, তারপর এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকাল সিলিঙের দিকে।

'ওটা কি?'

তাড়াতাড়ি সেলের ভেতর ঢুকে হীলের পাশে দাঁড়াল ফগেল, ওপর দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড পর বলল, 'ঝুল।'

'ঝুল? ঝুল কোত্থেকে এল?'

'মাকড়সার জালে ধোঁয়া লেগে…'

'ধোঁয়া? সেলের ভেতর ধোঁয়া আসে কোত্থেকে?' কঠিন সুরে জানতে চাইল হীল।

'জ্বী, মানে, হাজতিরা সিগারেট খায় তো…'

পকেট থেকে একটা হাত বের করল হীল, 'কিন্তু তুমি খাবে গুলি,' হাতের রিভলভারটা ফগেলের পাঁজরে চেপে ধরে বলল সে, 'যদি এই সেল থেকে বেরুবার চেষ্টা করো।'

হাঁ হয়ে গেল ফগেল। হাঁ-টা আরও একটু বড় হলো হাউসেনকে দেখে। তার পিঠে রিভলভার ধরে সেলের ভেতর ঢুকছে বব ইয়ং।

বন্দীদের মুখের ভেতর তুলো ভরে ঠোঁটে টেপ লাগিয়ে দেয়া হলো। লোহার বার-এ পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসানো হলো, দুই বারের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বের করে নিয়ে এসে দু'জোড়া হাতে লাগিয়ে দেয়া হলো হাতকড়া। হাতকড়ার চাবি পকেটে ভরল হীল। অফিস কামরায় ফিরে এসে বোর্ড থেকে আরও দু'সেট চাবি নিয়ে পকেটস্থ করল সে। তারপর ববের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল। দরজার চাবিও চলে গেল তার পকেটে। উঠান ঘুরে এবার ওরা ফিরে এল গ্যারেজে। গাড়ি দুটো বের করল। গ্যারেজের দরজায় তালা লাগাবার জন্যে রয়ে গেল হীল, সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে আসার জন্যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল বব।

তারা চারজন যখন স্টেশনে ঢুকল, দেখে তখন আর খেটে খাওয়া মানুষ বলে মনে হলো না। পরনে ওভারঅল নেই, চারজনই এখন ইউনিফর্ম পরা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পেট্রল।

ওদেরকে নিয়ে ইউএস একশো এক ধরে উত্তর দিকে ছুটল জোড়া পুলিস কার। তারপর বাঁক নিয়ে স্টেট ওয়ান ধরে পশ্চিম দিকে। মাউন্ট টামালপাইজ স্টেট পার্কে থামল ওরা। পকেট থেকে ওয়াকি-টকি বের করল হীল, জিনিসটা তার ইউনিফর্মের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। বোতাম টিপে বলল, 'এস-ওয়ান?'

বাতিল গ্যারেজে এখনও অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'ও. কে.।'

'গুড। থাকো।'

নব হিল-এর মাথায় বিলাসবহুল পাঁচতারা একটা হোটেল, কাল রাতটা এখানেই কাটিয়েছেন মেহমানরা। ডিনারের পর গভীর রাত পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। তেল নিয়ে আলোচনার আমন্ত্রণ পেয়ে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আলোচনা এখনও শুরুই হয়নি। কাল রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্যের

রাজনীতি। চলতি দুনিয়ায় যার তেল আছে তাকেই সবাই তেল মাখায়, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের চীফ এগজিকিউটিভ-ও এই রীতি ভাঙতে চান না। মেহমানদের খুশি করার জন্যে রাতটা তিনি তাঁদের সাথে এই হোটেলেই কাটিয়েছেন।

মাত্র সকাল হয়েছে হোটেলের উঠান আর সামনের রাস্তা এক রকম নির্জনই বলা যায়। সব মিলিয়ে মাত্র সাতজন লোককে দেখা গেল। তাদের ছয়জন হোটেলের সামনের সিঁড়িতে রয়েছে। বাকি একজন রাস্তায়।

সাত নম্বর লোকটা প্রায় ছয় ফিট লম্বা, সুদর্শন, তার হাবভাবে বুদ্ধিমত্তা আর ক্ষিপ্রতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। জুলফি এবং কানের ওপর কিছু কিছু চুলে পাক ধরলেও, চেহারা থেকে তারুণ্যের ভাব এখনও অদৃশ্য হয়নি। শান্ত ধীর ভঙ্গিতে রাস্তায় পায়চারি করছে সে।

বাকি ছয়জন লোক তাকে লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় করছে। এদের মধ্যে দু'জন হলো গেট-কীপার, দু'জন পুলিস, বাকি দু'জন সাদাপোশাকে এফ.বি.আই.। এফ.বি.আইদের গায়ে কোট, দু'জনেরই বাঁ দিকের বগলের কাছটা কেমন বেঢপ ভাবে ফুলে আছে।

সাত নম্বর লোকটাকে নিয়ে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে ওরা। একজন নাগরিক যদি রাস্তায় পায়চারি করে, সেখান থেকে তাকে চলে যেতে বলার কোন আইন নেই। কিন্তু নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে লোকটাকে ওখানে থাকতে দেয়াও চলে না। কাজেই কি করা যায় ঠিক করার জন্যে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করল তারা। ঠিক হলো, ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে গিয়ে লোকটার সাথে কথা বলবে। বুঝিয়ে, অনুরোধ করে বা অন্য যে-কোন উপায়ে লোকটাকে ওখান থেকে সরাতে হবে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল ইউনিফর্ম। পায়চারি রত লোকটার সাথে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'গুড মর্নিং, স্যার। কিছু যদি মনে না করেন, স্যার,··· বোঝেনই তো···ইয়ে, আপনি যদি অন্য কোথাও গিয়ে হাওয়া খান···মানে, এখানে আমরা একটা দায়িত্ব পালন করছি তো···'

লোকটা বাধা দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমিও যে একটা দায়িত্ব পালন করছি না, কে বলল তোমাকে?'

'স্যার, প্লীজ! ব্যাপারটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। হোটেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা···'

'হ্যাঁ, তাঁদের নিরাপত্তা!' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তোমরা সবাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমিও কি কম উদ্বিগ্ন?' কোটের ভেতরের পকেটে হাত গলিয়ে ওয়ালেট বের করল সে, সেটা মেলে ধরল ইউনিফর্মের চোখের সামনে।

ওয়ালেটের ভেতর কার্ডটা দেখে প্রথমে ইউনিফর্মের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, তারপর ঝুলে পড়ল মুখ। ঢোক গিলল সে। কালো ছায়া পড়ল চেহারায়। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে দু'একবার তোতলাল। 'আ-আমি দুঃখিত, স্যা-স্যার, মি. রোজেন, স্যার!'

'দুঃখিত আমিও। দুঃখিত আমেরিকার জন্যে, দুঃখিত যাদের তেল নেই

তাদের সবার জন্যে। ওহ্ গড, কি একখানা সার্কাস!' ইউনিফর্ম পরা অফিসারের চেহারা যতক্ষণ না সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল ততক্ষণ কথা বলে গেল সে। পায়চারি কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও থামেনি।

ধাপ বেয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল অফিসার। খোঁচা মারা ব্যঙ্গাত্মক হাসির সাথে একজন এফ.বি.আই. বলল, 'খুব দেখিয়েছ! সামান্য একজন লোককে হটাতে পারো না, তাহলে ভিড় সরাবে কিভাবে?'

'তুমি নাহয় একবার চেষ্টা করে দেখো না।'

তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল এফ.বি.আই.। বলল, 'এটা আবার একটা কাজ নাকি। ঠিক আছে, তুমি যখন দেখতেই চাও, যাচ্ছি।' সিঁড়ির তিনটে ধাপ নেমে থমকে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, লোকটা তোমাকে কি যেন দেখাল—কার্ড?'

'কার্ড,' মুচকি হেসে বলল পুলিস অফিসার।

'কে?'

'হাসালে দেখছি!' খোঁচা মারা ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে প্রতিশোধ নিল পুলিস অফিসার। 'তুমি কেমন এফ.বি.আই. হে, নিজের ডিপুটি ডিরেক্টরকে চিনতে পারো না?'

'জেসাস!' এফ.বি.আই.-এর চোখের পলকে সিঁড়ির মাথায় ফিরে আসাটা অলৌকিক একটা ব্যাপার বলে মনে হলো।

'কি হলো,' অবাক হবার ভান করল পুলিস অফিসার। 'ভদ্রলোককে হটাবে না?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে উঠল এফ.বি.আই.-এর চেহারা। ভারী গলায় বলল, 'এখন থেকে এ ধরনের ছোটখাট কাজ ইউনিফর্মদের ওপর ছেড়ে দিলাম আমি।'

একজন বেল-বয়, মাঝ-বয়েসী, সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো। খানিক ইতস্তত করল সে, তারপর ধাপ বেয়ে নেমে এল রাস্তায়। পায়চারি থামিয়ে তাকে কাছে আসার জন্যে হাত নেড়ে উৎসাহ দিল ব্যারি রোজেন। লোকটার মুখে বয়সের ছাপের সাথে যোগ হয়েছে দুশ্চিন্তার গভীর কয়েকটা রেখা। কাছে এসে বলল, 'আপনি কি স্যার ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিচ্ছেন না? সিঁড়িতে ওদের সাথে এফ.বি.আই.-ও রয়েছে।'

'কোথায় ঝুঁকি?' রোজেন সকৌতুকে হাসল। 'ওরা দু'জন ক্যালিফোর্নিয়া এফ.বি.আই., আর আমি ওয়াশিংটন। খোদ ডাইরেক্টর জেনারেলও যদি ওদের কোলের ওপর এসে বসে, ওরা চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। কি খবর নিয়ে এসেছ, বুলি?'

'তাঁরা সবাই তাঁদের স্যুটে ব্রেকফাস্ট সারছেন, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়নি কারও।'

'দশ মিনিট পর পর খবর চাই আমি।'

'জ্বী, স্যার। আপনি বলছেন বটে ঝুঁকি নেই, কিন্তু আমার কেমন যেন লাগছে। হোটেলের ভেতরের অবস্থা কি, জানেন? এফ.বি.আই. গিজ গিজ করছে। সকাল থেকে ছয় বার চেক করা হয়েছে আমাকে। এক অফিস থেকে আরেক অফিসে

যেতে হলে ম্যানেজারকেও থামানো হচ্ছে। আর, ওই যে জানালাগুলো দেখছেন, প্রতিটি জানালার পিছনে একটা করে রাইফেল, প্রতিটি রাইফেলের পিছনে একজন করে স্নাইপার।'

হাসি হাসি মুখ করে রোজেন বলল, 'আমি জানি, বুলি। ঝড়ের ঠিক মধ্যিখানটায় রয়েছি আমি, যেখানে বাতাসের কোন উপদ্রব নেই। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'কিন্তু যদি একবার ধরা পড়েন…'

'পড়ব না। আর যদি পড়িও, তোমার কোন ভয় নেই।'

'কি বলছেন ভয় নেই! আপনার সাথে কথা বলছি, সবাই দেখছে না?'

'কেন? কারণ আমি এফ.বি.আই.। কথাটা আমি বলেছি তোমাকে। তুমি অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখোনি। সিঁড়ির মাথায় ওরা ছয়জনও ঠিক তাই বিশ্বাস করে—আমি এফ.বি.আই.। তাছাড়া, বুলি, ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের বরাত দিয়ে আবেদনের সুযোগ তো খোলাই থাকবে তোমার।'

বুলি বিদায় নিল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো ছয়জন লোকের চোখের সামনে পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করল রোজেন। 'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?' কবীর চৌধুরীর নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর

'যথাসময়েই।'

'গুড। এস-ওয়ান এখন রওনা হচ্ছে। প্রতি দশ মিনিটে একবার। রাইট?'

'রাইট স্যার। আমার যমজের খবর কি, স্যার?'

কোচের পিছন দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। মুখ আর হাত বাঁধা লোকটা দু'ধারের আসনের মাঝখানে পড়ে আছে, তার আর রোজেনের চেহারায় আশ্চর্য মিল।

'বাঁচবে।'

দুই

প্রকাণ্ড কোচটাকে ধীরেসুস্থে দুশো আশি নম্বর রোডে তুলে নিয়ে এল রস পেরট, তারপর সাউদার্ন ফ্রিওয়ে ধরে উত্তর-পুব দিকে ছুটিয়ে দিল। কোন কোন মানুষকে দেখলেই মনে হয়, বাঘ। সেই দুর্লভদের মধ্যে রস পেরট একজন। বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার নয়, একটু বরং খাটোই বলা যায়, কিন্তু গাঁট্টাগোট্টা। কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল খুলি কামড়ে আছে, মাথাটা হুবহু কুমড়ো আকৃতির। কান আর মাথার মাঝখানে কোন ফাঁক নেই, মনে হয় খুলির সাথে ও-দুটো যেন সাঁটা। নাকটা বেশ বড়, কিন্তু চ্যাপ্টা; সন্দেহ নেই অতীতে শক্ত ভারী কিছুর সাথে ওটার সংঘর্ষ হয়েছিল। তার একটা প্রবণতা হলো, জেগে থাকা অবস্থায় চেহারায় উদাস, বিষণ্ন একটু হাসি ধরে রাখা, যেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে তার

চারপাশে যে অসংখ্য অনিশ্চিত ঘটনা ঘটছে তা থেকে গা বাঁচাবার এটাই সবচেয়ে নিরাপদ চাতুরী। মায়াভরা নীল চোখ, দেখে কখনোই মনে হবে না এই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত সম্ভব। এ চোখ যেন সমাধানের অযোগ্য জীবনের নানান জটিলতায় হতভম্ব একজন লোকের চোখ। কিন্তু কুমড়োর ভেতর তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে রস পেরট, আর তাই খুব বেশিদিনের পরিচয় না হলেও অতি দ্রুত কবীর চৌধুরীর ডান হাত হয়ে উঠতে পেরেছে সে।

কোচের সামনে বসে আছে দু'জন। দু'জনের পরনেই লম্বা সাদা কোট। প্রেসিডেনশিয়াল মোটর শোভাযাত্রায় যারা ড্রাইভারের দায়িত্ব পালন করবে তাদের জন্যে এই পোশাক নির্ধারণ করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, জ্যাকেট পরা বা আস্তিন গুটানো ভাল চোখে দেখে না তারা।

সান ফ্রান্সিসকোর পথ-ঘাট এখনও ভাল করে চেনা হয়ে ওঠেনি কবীর চৌধুরীর, তাই কোচ চালাবার দায়িত্ব পড়েছে রস পেরটের ওপর। এখানেই তার জন্ম। গাড়ি না চালালেও, রস পেরটের চেয়ে কম ব্যস্ত নয় কবীর চৌধুরী। তার সামনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির একটা প্যানেল রয়েছে, একটা বোয়িং-এর কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে খুব সামান্যই অমিল পাওয়া যাবে এর। কমিউনিকেশন সিস্টেম হিসেবে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে যা আছে তার সাথে এটার তুলনা চলে না, কিন্তু কবীর চৌধুরীর যা দরকার তার সবই এতে আছে। বরং, কয়েকটা যন্ত্রপাতির মান নিজ হাতে আরও উন্নত করে নিয়েছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সীটে বসা লোকটার দিকে একবার তাকাল কবীর চৌধুরী। চার্লি ব্রাউন একজন নিগ্রো, মানুষের চেয়ে ভালুকের সাথেই যেন তার সাদৃশ্য বেশি। শান্ত মেজাজের লোক, কখনোই ধৈর্য হারায় না, কবীর চৌধুরীর একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্য।

'প্লেট, চার্লি? এনেছ?'

চার্লির মাথার চুল আর ভুরুর মাঝখানে নগণ্য একটু খালি জায়গা নিয়ে কপাল, সেখানে কয়েকটা রেখা ফুটল। এর অর্থ, একাগ্র মনোযোগের সাথে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। এক সেকেন্ড পর কালো মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল। 'ইয়েস, স্যার! এনেছি, স্যার।' সামনের দিকে ঝুঁকে সীটের তলা থেকে স্প্রিং-ক্লিপ লাগানো একজোড়া নাম্বার প্লেট তুলল সে। প্রেসিডেনশিয়াল মোটর শোভাযাত্রায় যে কোচ তিনটে ব্যবহার করা হবে সেগুলোর সাথে কবীর চৌধুরীর কোচের বাইরের চেহারার কোন অমিল নেই, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সরকারী কোচে রয়েছে ওয়াশিংটন ডি.সি. প্লেট, আর তারটায় রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া প্লেট। চার্লির হাতে যে প্লেট রয়েছে সেটা ওয়াশিংটনের, সরকারী গ্যারেজে অপেক্ষারত তিনটে কোচের একটার নম্বর আর তার হাতের প্লেটের নম্বর একই।

'ভুলো না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সামনের দরজা দিয়ে আমাকে নামতে দেখলে তুমিও পিছনের দরজা দিয়ে নেমে যাবে। তোমার প্রথম কাজ প্লেট বদলানো।'

'আমার মনে আছে, স্যার।'

মুহূর্তের জন্যে একটা সঙ্কেত বেজে উঠল। একটা বোতামে চাপ দিল কবীর

চৌধুরী।

'এস-ওয়ান?' নব হিল থেকে জানতে চাইল ব্যারি রোজেন।

'ইয়েস?'

'যথাসময়ে। চল্লিশ মিনিট।'

'গুড।' বোতামে আরেকবার চাপ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল কবীর চৌধুরী, তারপর আরেকটা বোতামে চাপ দিল। 'এস-ফোর?'

'এস-ফোর।'

'রওনা হও।'

চুরি করা পুলিস কারে স্টার্ট দিল লালমুখো রজার হীল। পিছনে দ্বিতীয় গাড়ি নিয়ে প্যানোরামিক হাই-ওয়েতে উঠে এল সে। গাড়ি খুব জোরে ছোটাল না, তাতে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে টামালপাইজ রাডার স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। রাডার স্টেশনের কোথায় কি আছে সব তাদের মুখস্থ, স্মৃতিতে জমা আছে গোটা এলাকার লে-আউট, চোখ বেঁধে দিলেও স্টেশনের যে-কোন অংশে যেতে পারবে তারা।

ছয় ফিট তিন ইঞ্চি, রজার হীল, তার সঙ্গীদের বলল, 'আমরা পুলিস, তাই না? জনসাধারণের অভিভাবক। অর্থাৎ গুলি করা চলবে না। বসের নির্দেশ।'

সঙ্গীদের একজন জানতে চাইল, 'কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে?'

'তোমার ভাগের অর্ধেক টাকা কাটা যাবে।'

'আমি বাবা তাহলে গুলির মধ্যে নেই।'

আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-থ্রী?'

এস-থ্রী চেসটন আর জ্যাকের কোড নাম্বার, যারা ঘুমন্ত গার্ডের নাকে গ্যাস ছেড়ে সরকারী কোচগুলোর একটায় উঠেছিল। সরকারী গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়েছিল ওরা। এখন আবার ফিরে এসে গ্যারেজের সামনে ডিউটি দিচ্ছে। চেসটন সাড়া দিল, 'এস-থ্রী।'

'খবর বলো।'

'শুধু দু'জন ড্রাইভার পৌঁচেছে।'

'গার্ড?'

'ঘুম থেকে উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, কিছু সন্দেহ করেনি।'

'অপেক্ষা করো।'

আরেকটা সঙ্কেত ধ্বনি হতে হাত বাড়িয়ে অন্য একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী।

'এস-ফাইভ। যথাসময়ে। ত্রিশ মিনিট।'

'গুড।'

নতুন আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-টু?' যারা দু'জন প্রায় একই গঠনের, সেই মারকুয়েজ আর ওয়াল্টারের কোড নম্বর এটা।

'ইয়েস?'

'তোমরা এবার রওনা দিতে পারো।'

'দিলাম, স্যার,' বলল ওয়াল্টার। মারকুয়েজকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেল সে, গন্তব্য ইউ.এস. নেভী স্টেশন অ্যালামেডা। ন্যাভাল এয়ার ইউনিফর্মে সত্যি চমৎকার মানিয়েছে ওদেরকে। দু'জনেরই কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা করে ফ্লাইট ব্যাগ, লেদার ব্যাগের জিনিস-পত্র এগুলোয় ভরে নিয়ে সেটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে ওরা। নেভী স্টেশনের কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল, যেন খুব তাড়া আছে। স্টেশনে ঢোকার মুখে দু'জন গার্ডকে দেখল, হন হন করে হাঁটায় তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই ঘেমে গেল ওরা। একজন গার্ড দু'পা এগিয়ে এল ওদের দিকে। পকেট থেকে বের করে তাকেই ওরা কার্ড দেখাল।

'লেফটেন্যান্ট কার্টার, লেফটেন্যান্ট মারটিন। হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা বেশ একটু দেরি করে ফেলেছেন, স্যার।'

'জানি,' বলল ওয়াল্টার। 'সরাসরি হেলিকপ্টারে যাব আমরা।'

'কিন্তু স্যার, সেটা তো নিয়ম নয়। তাছাড়া, কমান্ডার মিডো আমাকে বলে রেখেছেন, পৌঁছেই তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে হবে আপনাদের।' নাবিক গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে চুপি চুপি বলল, 'কমান্ডারের মেজাজ সুবিধের মনে হলো না, স্যার।'

'অ্যাঁ! বলো কি!' সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়ে উঠল ওয়াল্টার। 'তার অফিসটা কোন্ দিকে?'

'বাঁ দিকে, দু'নম্বর দরজা, স্যার।'

মারকুয়েজকে সাথে নিয়ে দ্রুত সেদিক এগোল ওয়াল্টার, দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। যুবক এক পেটি অফিসার ডেস্কের পিছনে বসে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে তার ডান দিকের একটা দরজা দেখিয়ে দিল ওদেরকে। তার আচরণই বলে দিল, কমান্ডারের ঘরে যে অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা হতে যাচ্ছে তাতে নিজের কোন ভূমিকা চায় না সে।

নক করে ভেতরে ঢুকল ওয়াল্টার, মাথা নিচু করে আছে। খোলা ফ্লাইট ব্যাগে চোখ রেখে কিছু খুঁজছে, এই রকম ভাব। এই সাবধানতার কোন দরকার ছিল না। অধীনস্থ কর্মচারীদের কোন ত্রুটি দেখতে পেলে বড় সাহেবরা সাধারণত যা করে থাকে, কমান্ডার গ্লেন মিডোও ঠিক তাই করছিল—সামনের একটা প্যাডে ওয়াল্টার আর মারকুয়েজের নামে অভিযোগ লিখছিল সে।

ওয়াল্টারের পিছু পিছু ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল মারকুয়েজ, কোন শব্দ হলো না। ফ্লাইট ব্যাগটা ডেস্কের কিনারায় রাখল ওয়াল্টার, তার ডান হাত ব্যাগের আড়ালে পড়ে গেছে। সেই সাথে অ্যারোসল গ্যাস ক্যানটাও।

'দয়া করে এলে তাহলে?' কমান্ডার মিডো বোস্টনের লোক, গলার আওয়াজে সেখানকার তীব্র টান। 'তোমাদের ওপর কড়া হুকুম ছিল,' কথা শেষ না করে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল সে। 'জানি, অজুহাতের কোন অভাব হবে না···' হঠাৎ চোখ পিট পিট করল সে, কিন্তু এখনও অমঙ্গল কিছু আশঙ্কা করেনি। 'তোমরা কারা? তোমরা তো কার্টার আর মারটিন নও!' রাগে, বিস্ময়ে আরও লাল হয়ে

উঠল ফোলা বেলুন আকৃতির লালচে চেহারা।

'না, দেখতেই তো পাচ্ছেন, নই।'

এতক্ষণে বিপদ টের পেল কমান্ডার। ডেস্কের একটা বোতামের দিকে হাত বাড়াল সে। তার হাত বোতাম স্পর্শ করার আগেই অ্যারোসল ক্যানের বোতামে চাপ দিল ওয়াল্টার, প্রায় সাথে সাথেই ডেস্কের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল মিডো। মারকুয়েজের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ওয়াল্টার, ইঙ্গিত পেয়ে দরজা খুলে বাইরের অফিসে বেরিয়ে গেল মারকুয়েজ, পিছনে একটা হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সে, অপর হাতে ব্যাগের ভেতরটা হাতড়াচ্ছে।

ডেস্কের পিছনে চলে এল ওয়াল্টার, ফোনের নিচে বোতামগুলো পরীক্ষা করল, তারপর রিসিভার তুলতে শুরু করে চাপ দিল একটায়। 'টাওয়ার?'

'স্যার?'

'লেফটেন্যান্ট কার্টার আর মারটিনকে ইমিডিয়েট ক্লিয়ার্যান্স দাও,' বলল ওয়াল্টার, কথার সুরে বোস্টনের টান প্রকট।

এস-থ্রীকে আবার ডাকল কবীর চৌধুরী। চেসটন আর জ্যাক, সরকারী গ্যারেজের সামনে ডিউটি দিচ্ছে। 'খবর বলো।'

'লাইনে দাঁড়াচ্ছে, স্যার।'

সরকারী গ্যারেজের ভেতর আসলেও এক লাইনে দাঁড়াচ্ছে কোচগুলো। দুটো কোচে উঠে পড়েছে আরোহীরা, ওগুলো এখন রওনা হবার জন্যে তৈরি। চেসটন আর জ্যাক যেটায় উঠেছিল, এ-দুটোর মধ্যে সেটাও রয়েছে। এই কোচ বরাদ্দ করা হয়েছে সাংবাদিক, বেতারকর্মী আর ক্যামেরাম্যানদের জন্যে। আরোহীরা যারা উঠেছে তাদের মধ্যে মহিলা রয়েছে চারজন। তিনজনের বয়স আঁচ করা প্রায় অসম্ভব। বাকি একজন যুবতী। কোচের পিছন দিকে একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তিনটে সিনে ক্যামেরা বসানো হয়েছে সেখানে। মোটর শোভাযাত্রায় এই কোচ সবার আগে থাকবে, তার ঠিক পিছু পিছু আসবে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ, ফলে ভি.আই.পি.-রা সারাক্ষণ ক্যামেরার চোখে থাকতে পারবেন।

এই কোচে বিদেশী লোকও আছে। ওয়ালথার, কোল্ট, বেরেটা, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কিংবা আর যে-সব স্মল আর্মস আছে সেগুলো দেখলেই চিনতে পারবে এমন আরোহী রয়েছে তিনজন। কিন্তু এদের পায়ের সামনে যদি একটা টাইপ রাইটার আর একটা ক্যামেরা রাখা হয়, কোন্‌টা কি চিনতে পারবে না। এই কোচের নাম দেয়া হয়েছে লীড কোচ।

এই কোচের একজন আরোহী, ক্যামেরা চিনতে কোন অসুবিধে হবে না তার। সাথে একটা রয়েছেও, যদিও সেটাকে শুধু একটা ক্যামেরা বলা সঙ্গত হবে না—অত্যন্ত জটিল একটা অ্যাপারেটাস। ওয়ালথার, কোল্ট, বেরেটো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কিংবা আর যে-সব স্মল আর্মস আছে সেগুলো দেখামাত্র শুধু যে চিনতে পারবে সে তাই নয়, কোন্‌টার কি বৈশিষ্ট্য তাও বলে দিতে পারবে। এ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখার অনুমতি পায় সে, প্রায় সময় রাখেও। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানে সে নিরস্ত্র, প্রয়োজন হবে না মনে করে সাথে আনেনি। আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও তার ক্যামেরার তলায় লুকানো রয়েছে একটা মিনিয়েচারাইজড,

ট্রানজিসটারাইজড ট্র্যানসিভার রেডিও। তার কাগজপত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সে একজন ভারতীয়, নাম প্রদ্যুৎ মিত্র। লন্ডনের দ্য নিউজ পত্রিকার একজন রিপোর্টার। সত্যি এবং মিথ্যের মিশেল দেয়া তথ্য এগুলো। আসলে সে ভারতীয় নয়, বাংলাদেশী। তার নাম প্রদ্যুৎ মিত্রও নয়, শ্রীমান মাসুদ রানা। তবে দ্য নিউজের একজন রিপোর্টার বটে।

দ্য নিউজের সম্পাদক জহিরুল ইসলাম এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছে রানাকে। মধ্যপ্রাচ্যের দুই কর্ণধারের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তেল-আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করতে হবে ওকে। বলাই বাহুল্য, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে রানা। সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই চেনে ওকে, সেই চেনা মুখকে যদি রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখে, সন্দেহ এবং অপ্রত্যাশিত বিপদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে-কারণেই ছদ্মবেশ।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পিছনে থাকবে রিয়্যার কোচ। লীড কোচের চেয়ে আরোহী সংখ্যা এতে বরং বেশি, কিন্তু রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যান মাত্র দু'একজন, বাকি সবাই এফ. বি. আই। খানিক পর মোটর শোভাযাত্রা যখন শুরু হবে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের সাথে ফোর্ট নক্সের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই কোন কোন রিপোর্টার ভাবছে, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের এত লোক এখানে না থাকলেও চলত।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে লোক রয়েছে মাত্র তিনজন, সবাই ক্রু। সাদা কোট পরা ড্রাইভার, তার 'রিসিভ' সুইচ নিচের দিকে নামানো, রেডিওর স্পীকার থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। বারের পিছনে রয়েছে সুন্দরী এক যুবতী, রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য মনে করছে নিজেকে। আরও পিছন দিকে, নিজের কমিউনিকেশন কনসোলের সামনে বসে রয়েছে রেডিও অপারেটর।

কবীর চৌধুরীর কোচে একটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফাইভ,' স্পীকার থেকে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'যথাসময়ে। বিশ মিনিট।'

দ্বিতীয় আরেকটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফোর। সব ঠিক আছে।'

'গুড।' এই প্রথম নিজেকে একটু স্বস্তি বোধ করার অনুমতি দিল কবীর চৌধুরী। টামালপাইজ রাডার স্টেশন দখল করাটা তার প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। জানতে চাইল, 'স্ক্যানারগুলোয় লোক বসানো গেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

আরেকটা সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ওয়ান?' উত্তেজিত সুরে জানতে চাইল ওয়াল্টার। 'এস-টু। আমরা উড়তে পারি?'

'না। বিপদ?'

'কিছুটা।' হেলিকপ্টারে এখনও স্টার্ট দেয়নি ওয়াল্টার, কন্ট্রোলের সামনে বসে

আছে। দেখল, কমান্ডার মিডোর অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক, বাঁক ঘুরে বিল্ডিঙের আড়ালে চলে গেল সে? বুঝতে অসুবিধে হলো না, কমান্ডারের অফিসের দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে লোকটা, ছুটে জানালার কাছে যাচ্ছে ভেতরের দৃশ্য দেখার জন্যে। মারকুয়েজকে নিয়ে ওই অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে এসেছে ওয়াল্টার, চাবি তার পকেটেই রয়েছে।

সান্ত্বনা এইটুকু যে লোকটা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালেও আসল ঘটনা এখুনি কিছু টের পাবে না। কমান্ডারকে চেয়ারের ওপর ফেলে আসেনি ওরা, অচেতন কমান্ডার আর পেটি অফিসারকে বাথরুমে রেখে এসেছে। ভাগ্যই বলতে হবে, বাথরুমে কোন জানালা নেই। বাথরুমের দরজাতেও তালা দেয়া হয়েছে, সে-চাবিও তার পকেটে।

আবার বাঁক নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। এখন আর ছুটছে না। হন হন করে কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, অস্থির ভাবে চারদিকে তাকাল। লোকটা কি ভাবছে, পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারল ওয়াল্টার। কমান্ডার এবং পেটি অফিসার হয়তো জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত, হয়তো এই অফিসেরই অন্য কোথাও আছে তারা—এখন যদি 'বাঘ, বাঁচাও!' বলে চিৎকার জুড়ে দেয় সে, কমান্ডারের ধমকের ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আবার ভাবছে, কিন্তু সত্যি যদি ওদের কোন বিপদ হয়ে থাকে? নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ না করাটা তখন হয়ে দাঁড়াবে একটা অপরাধ, গালমন্দ করবে অফিসাররা। আবার পা চালাল সে, স্টেশন কমান্ডারের অফিসের দিকে যাচ্ছে, প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করবে কমান্ডার মিডো ঠিক কোথায় আছেন বা কি করছেন। খানিক দূর হেঁটেই গেল সে, তারপর আর ধৈর্য রাখতে পারল না, ছুটল।

মুখের সামনে ওয়াকি-টকি তুলে কথা বলল ওয়াল্টার, 'যতদূর বুঝতে পারছি,স্যার, বিপদ গুরুতর।'

'যতক্ষণ সম্ভব থাকতে চেষ্টা করো। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে উঠে পড়ো আকাশে। রন্ডিভু রিমেইন্স।'

রস পেরট কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাল। 'সমস্যা, চীফ?'

'হ্যাঁ। ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ বিপদের ভয় করছে, এখুনি টেক অফ করতে চায়।'

'হুঁ।' চিন্তামগ্ন হলো পেরট।

'সময়ের আগেই যদি টেক অফ করে ওরা, আমাদের অপেক্ষায় মিনিট দশেক ঘুর ঘুর করতে হবে আকাশে। কল্পনা করতে পারো? প্রেসিডেন্ট এবং মিডল ইস্টের অর্ধেক তেলের দু'জন মালিক যে শহরে রয়েছে সেখানে যদি হাইজ্যাক করা দুটো হেলিকপ্টার মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকে, তাদের পরিণতি কি আশা করতে পারো তুমি?'

চিন্তার জাল থেকে নিজেকে এখনও মুক্ত করতে পারছে না পেরট, তাই আবার একবার হুঁ করল।

'গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে না?' বলে চলেছে কবীর চৌধুরী।

'সামরিক অফিসারদের চেনা আছে আমার, ওরা ভয় পেয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে ওস্তাদ। এক্ষেত্রেও কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইবে না। হুকুম দেবে, ও-দুটোকে গুলি করে নামাও। ওদের ওই ঘাঁটিতে সদা-প্রস্তুত ফ্যান্টম আছে।'

চিন্তা করছে, সেই সাথে কোচও চালাচ্ছে পেরট। 'আমার ধারণা,' এইটুকু বলে বিরতি নিল সে, সরকারী গ্যারেজের পিছন দিকে ধীরেসুস্থে দাঁড় করাল কোচটাকে। এই গ্যারেজের ভেতরই রয়েছে মোটর শোভাযাত্রার তিনটে কোচ—লীড, প্রেসিডেনশিয়াল এবং রিয়্যার। '...এটা একটা সমস্যা হলেও, উৎকট সমস্যা নয়।'

'ব্যাখ্যা করো,' ভারি সুরে বলল কবীর চৌধুরী। পেরটের বুদ্ধির ওপর তার অগাধ আস্থা, সেজন্যেই তাকে এই অপারেশনে নিজের ডান হাত বানিয়েছে সে।

'সময়ের আগেই যদি টেক অফ করতে বাধ্য হয় ওরা, আপনি ওদেরকে নির্দেশ দিতে পারেন, সারাক্ষণ যেন শোভাযাত্রার ওপর ঝুলে থাকে।'

আর কিছু শোনার দরকার ছিল না, পেরট যা বলতে চায় এ-থেকেই তা বুঝে নিল কবীর চৌধুরী। কিন্তু পেরট ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে শোনার জন্যে কৌতূহল বোধ করল সে। বলল, 'তারপর?'

'প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ওপর ঝুলে আছে এই রকম এক জোড়া হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাবার নির্দেশ দেবে, এত বড় রামছাগল এমন কি সামরিক বাহিনীতেও নেই, চীফ। গুলি যদি করেই—বুম! সাথে সাথে না থাকবে প্রেসিডেন্ট, না থাকবে আরবী তেলের রাজা আর রাজপুত্র, না থাকবে চীফ অভ স্টাফ, আর না থাকবে মেয়র সিলভার।'

'তুমি বলতে চাইছ, গুলি খাওয়া হেলিকপ্টার প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ওপর পড়ে বিধ্বস্ত হতে পারে?'

'পারে, চীফ,' মুচকি একটু হাসি দেখা গেল পেরটের ঠোঁটে। 'গুলি করার অর্ডারটা যদি কোন অ্যাডমিরাল দেন, তাঁকে আর পেনশন ভোগ করতে হবে না। অবশ্য কোর্ট-মার্শাল থেকে যদি প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হয় তবেই সে-প্রশ্ন উঠবে।'

'তোমার পরামর্শটা মন্দ নয়,' কবীর চৌধুরীর গলা শুনে বোঝা গেল, খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে সে, পুরোপুরি নয়। 'তুমি ধরেই নিচ্ছ, এয়ার কমান্ডার তোমার মতই একজন সুস্থ চিন্তা-ভাবনার অধিকারী, ধরে নিচ্ছ তোমার লাইনেই ভাবনা-চিন্তা করবে সে। কিন্তু সে যে তোমার ঠিক উল্টোটা নয়, বুঝব কিভাবে? তবে, তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করেও পারছি না, আর যখন কোন উপায় নেই। আমাদের স্লোগান কি, মনে আছে তো?'

'আছে, চীফ।' সুর করে গাইল পেরট, 'সামনে চলো, সামনে চলো, সামনে চলো রে!' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, 'চীফ, আপনাদের বাংলা ভাষাটা কিন্তু দারুণ সুইট।'

'আমার একটা পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলেছি কি?' পেরটের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কবীর চৌধুরী তার ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলে চলল, 'বাংলা ভাষাকে ভিত্তি হিসেবে রেখে, দুনিয়ার সমস্ত ভাষার সংমিশ্রণে এমন একটা বিশ্বজনীন ভাষা তৈরি করতে চাই আমি যে ভাষায় কথা বললে গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান প্রাণীরাও

তা বুঝতে পারবে…'

'গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান প্রাণী, চীফ?' পেরটের ধারণা হলো, শুনতে তার ভুল হয়েছে।

'হ্যাঁ, তারা আসবে!' কি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা। কোন সুদূরে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। 'তাদেরকে আমি আনব। আমার বিজ্ঞান সাধনা যদি মিথ্যে না হয়, তাদের অস্তিত্বও মিথ্যে নয়—হতে পারে না। আমি…'

একটা সঙ্কেত বেজে উঠল। সাথে সাথে বাস্তবে ফিরে এল পাগল বৈজ্ঞানিক। চোখ নামিয়ে মৃদু সুরে বলল, 'দুঃখিত, পেরট।' তারপর হাত বাড়াল বোতামের দিকে।

'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?'

'এস-থ্রী।' সরকারী গ্যারেজ থেকে চেসটন কথা বলছে। 'লীড কোচ এই মাত্র বেরিয়ে গেল।'

'প্রেসিডেনশিয়াল কোচ বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

পেরটের দিকে ফিরে চোখ-ইশারায় নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। কোচ স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগোল পেরট। সামনে গ্যারেজের কোণ, বাঁক নিয়ে গ্যারেজের পাশে চলে যাচ্ছে কোচ।

আবার সঙ্কেত বেজে উঠল।

'এস-ফাইভ। যথাসময়ে। দশ মিনিট।'

'গুড। গ্যারেজে চলে এসো।'

আবার সঙ্কেত। রিপোর্ট করছে চেসটন। 'স্যার, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে।'

'গুড।' আরেকটা বোতাম চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'রিয়্যার কোচ?'

'ইয়েস?' অপরিচিত গলা, এই প্রথম শুনছে কবীর চৌধুরী।

'মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করো। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেছি। রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ভাবে আটকা পড়ে গেছে একটা ক্রেন। কিছু না, স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। তবু ঝুঁকি নেয়া চলবে না। তাই বলে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। সীট ছেড়ে কাউকে উঠতে হবে না। মিনিট কয়েকের জন্যে গ্যারেজে ফিরে আসছি আমরা, কর্তৃপক্ষ নতুন একটা রুট ঠিক করলেই আবার বেরুব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

ধীরেসুস্থে আরেকটা বাঁক ঘুরে সরকারী গ্যারেজের সামনের দিকে চলে এল কবীর চৌধুরীর কোচ। গ্যারেজের দরজা ঘেঁষে এগোল সেটা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্যারেজের ভেতর আগের জায়গাতেই রয়েছে রিয়্যার কোচ, তার আরোহীরা কবীর চৌধুরীর কোচের চার ভাগের সামনের তিন ভাগই দেখতে পাচ্ছে। সামনের সীটগুলোর উল্টো দিকের দরজা দিয়ে পেরটকে নিয়ে নামল কবীর

চৌধুরী, হাবভাবে কোন রকম অস্থিরতা নেই। গ্যারেজে ঢুকল হাসি মুখে। গ্যারেজের ভেতর থেকে নিগ্রো চার্লিকে দেখতে পেল না কেউ, কারণ কবীর চৌধুরীর কোচ থেকে পিছনের দরজা দিয়ে নিচে নামল সে। নেমেই কাজে লেগে গেল। পুরানো নাম্বার প্লেটের গায়ে নতুন প্লেটটা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

গ্যারেজের অনেকটা পিছনে রয়েছে রিয়্যার কোচ, আরোহীরা কৌতূহলের সাথে সাদা কোট পরা দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল। এমন কিছু ঘটেনি যাতে তাদের কারও মনে সন্দেহের ছায়া পড়তে পারে। গ্যারেজ থেকে রিয়্যার কোচ বেরিয়ে যেতে দেরি করছে বটে, কিন্তু জীবনের কোন্ কাজটাই বা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটে! এই দেরির সাথে অল্পবিস্তর সবাই তারা অভ্যস্ত। ড্রাইভারের পাশের দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল কবীর চৌধুরী, মিটি মিটি হাসিটা এখনও লেগে আছে মুখে। অলস ভঙ্গিতে তাকে ছাড়িয়ে গেল পেরট, যেন কোন কাজ নেই তাই কোচের পিছন দিকটায় ঘুরে আসতে যাচ্ছে। রিয়্যার কোচের আরোহীদের মধ্যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক নিশ্চয়ই আছে, তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার জন্যে গ্যারেজের সামনে রয়েছে চেসটন আর জ্যাক। অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখাচ্ছে তারা, কিন্তু কিচ্ছু করছে না।

সামনের বাঁ-হাতি দরজা খুলে দুটো ধাপ ওপরে উঠল কবীর চৌধুরী। ড্রাইভারকে বলল, 'কিছু করার নেই। এই রকম ঘটেই থাকে। নতুন একটা রুট ঠিক করছে ওরা, সেটা ধরেই নব হিলে যাব আমরা।'

একটু অবাক দেখাল ড্রাইভারকে, তার বেশি কিছু না। জানতে চাইল, 'হ্যারি কোথায়?'

'হ্যারি?'

'লীড কোচের ড্রাইভার।'

'ও! ওর নাম তাহলে হ্যারি।' কাঁধ ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কি আর করা!'

'অসুস্থ?' সন্দেহ ডালপালা মেলতে শুরু করল। 'এই তো মাত্র দু'মিনিট আগে...' মৃদু দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ঝট করে পিছন দিকে তাকাল ড্রাইভার। বিস্ফোরণের ক্ষীণ শব্দের সাথে সাথেই শোনা গেল কাঁচ ভাঙার এবং চাপে পড়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার হিস্‌স্ আওয়াজ। কোচের পিছন দিকটা এরই মধ্যে ঘন গাঢ় ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। ড্রাইভার বিস্ফারিত চোখে দেখল, ভৌতিক চেহারার এক টুকরো মেঘ কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে কোচের ভেতর। কোচের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে পেরট, দরজাটা যাতে বন্ধই থাকে সেজন্য সেটার গায়ে হেলান দিয়ে আছে সে। ঘন ধোঁয়ার জন্যে তাকে দেখতে পেল না ড্রাইভার। কোচের প্রতিটি আরোহী, অন্তত যাদেরকে এখনও দেখা যাচ্ছে, সীটের ওপর একটু ঘুরে বসে যার যার পকেটে হাত ভরে আগ্নেয়াস্ত্র বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু এমন কাউকে দেখছে না তারা যাকে গুলি করা যায়।

বিস্ময়ের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে ড্রাইভার। আরো দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হলো। দম বন্ধ করে নিয়ে গ্রেনেড আকৃতির দুটো গ্যাস বোমা

ছুঁড়ল কবীর চৌধুরী—একটা ড্রাইভারের পায়ের কাছে, অপরটা দু'সারি সীটের মাঝখানের প্যাসেজে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সিঁড়ির ধাপ থেকে কোচের মেঝেতে উঠে দাঁড়াল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা, হাতলটা চেপে ধরে হেলান দিল কবাটের গায়ে। যদিও এই অতিরিক্ত সাবধানতার কোন দরকার ছিল না, কারণ এই গ্যাস নাকে একবার ঢুকলে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় মানুষ। দশ সেকেন্ড কাটল। দরজা খুলে কোচ থেকে নেমে পড়ল কবীর চৌধুরী। কোচের সামনে চলে এসে দম ছাড়ল সে। তার এক সেকেন্ড আগেই ওখানে পৌঁচেছে পেরট। চেসটন তার সঙ্গীকে নিয়ে ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে গ্যারেজের মেইন গেট। এই মুহূর্তে পরনের ওভারঅল খুলছে তারা, ওভারঅলের নিচে থেকে বেরিয়ে আসছে নিখুঁত ফিট করা দামী স্যুট।

'হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি?' পেরট আর কবীর চৌধুরীর দিকে সবিস্ময়ে ঘন ঘন তাকাল চেসটন। 'আমার স্যার, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে!'

সকৌতুকে হাসল কবীর চৌধুরী।

'কিন্তু,' হঠাৎ দারুণ চিন্তিত দেখাল চেসটনকে, 'স্যার, নাকে ওই গ্যাসের একটু ছোঁয়া লাগলেই যদি একজন লোক জ্ঞান হারায়, তাহলে ফুসফুস ভরে গেলে কি অবস্থা হবে? ওরা তাহলে তো একজনও বাঁচবে না!'

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে তালা দিল দরজায়। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে একবার পেরট আর একবার কবীর চৌধুরীর দিকে তাকাচ্ছে চেসটন। মিটি মিটি হাসি নিয়ে তার অস্বস্তিটুকু উপভোগ করছিল কবীর চৌধুরী। তারপর বলল, 'অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে নিউট্রাল হয়ে যাবে গ্যাস। এখন তুমি যদি ওই কোচে ওঠো, তোমার কিছুই হবে না। তবে ওখানে যারা রয়েছে, এক ঘন্টার আগে তাদের কারও জ্ঞান ফিরবে না।'

গ্যারেজের সামনে চলে এসেছে ওরা, এই সময় একটা ট্যাক্সি থেকে নামল জন কনওয়ে। কোচে চড়ল সবাই, মোটর শোভাযাত্রায় এটাই এখন রিয়্যার কোচ হবে। স্টার্ট দিয়ে কোচ ছাড়ল পেরট। নব হিলের দিকে চলল ওরা।

কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। 'এস-টু?'

'জ্বী, স্যার।'

'খবর কি?'

'শান্ত। বড় বেশি শান্ত, স্যার। আমার ভাল ঠেকছে না।'

'কি ঘটছে বলে মনে করো?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। যদি আন্দাজ করতে বলেন…'

'করো।'

'একজন অফিসার টেলিফোন করে আমাদের ওপর গাইডেড মিসাইল ছোঁড়ার নির্দেশ চাইছে, স্যার।'

'কার কাছ থেকে নির্দেশ চাইছে?'

'দেশের হাইয়েস্ট মিলিটারি অথরিটির কাছ থেকে, স্যার।'

'তার মানে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে। যোগাযোগ হতে একটু সময় লাগবে, কি বলো?'

'ভুল হলে মাফ করবেন, স্যার,' বলল ওয়াল্টার। 'আমার ধারণা দেশের হাইয়েস্ট মিলিটারি অথরিটি এই মুহূর্তে নব হিলে রয়েছেন।'

'ওহ, গড!' বিড়বিড় করে উঠল কবীর চৌধুরী। ভাবল, তাই তো! জেনারেল পীল, চীফ অভ স্টাফ, এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা, হোটেল হপকিন্সে প্রেসিডেন্টের পাশের কামরাতেই রয়েছেন। মোটর শোভাযাত্রায় তাঁরও অংশগ্রহণ করার কথা। 'তার সাথে যোগাযোগ করা হলে কি ঘটবে বলে মনে করো তুমি?' মনে মনে উদ্বেগ বোধ করলেও কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে তার কোন প্রকাশ ঘটল না।

'শোভাযাত্রা বাতিল ঘোষণা করা হবে, স্যার।' ওয়াল্টার জানে, প্রেসিডেন্ট চীফ অভ দি আর্মড ফোর্সেস হলেও সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে চীফ অভ স্টাফ জেনারেল পীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। 'এক মিনিট, স্যার।' কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর আবার কথা বলল সে, 'গেটের একজন গার্ড এই মাত্র টেলিফোন ধরল, স্যার। ব্যাপারটা অনেক কিছু হতে পারে, আবার কিছু নাও হতে পারে।'

ঘাড়ে আর গলায় চিটচিটে ঘাম অনুভব করল কবীর চৌধুরী। এই অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বের জন্যে আড়াই মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়েছে তাকে। এখন যদি শোভাযাত্রা বাতিল করা হয়, টাকাটা পানিতে পড়বে। কন্ট্রোল যদি হেলিকপ্টার দুটোকে টেক-অফ করার অনুমতি না দেয়, বুঝতে হবে কর্তৃপক্ষ বিপদ টের পেয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে শোভাযাত্রা অবশ্যই বাতিল করা হবে।

এটা সেটা নানা দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল কবীর চৌধুরীর মনে। এক রাষ্ট্রের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরানো দেনা আছে তার। তাদের কাছ থেকেই আরও আড়াই মিলিয়ন কর্জ করেছে। এই অপারেশন সফল হলে মোটা একটা টাকা পাবে বলে আশা করছে সে। দেনা শোধ করেও হাতে প্রচুর থাকবে, যা দিয়ে অন্তত তিনটি বছর অন্য কোন দিকে খেয়াল না দিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই অপারেশন যদি সফল না হয়…পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

'এস-ওয়ান?'

'ইয়েস?' কবীর চৌধুরী অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল তার দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সাথে শক্তভাবে জোড়া লেগে আছে।

'স্যার, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না!' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল ওয়াল্টার। 'টাওয়ার আমাদেরকে এইমাত্র টেক-অফের অনুমতি দিল।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল কবীর চৌধুরী, এই সময় কে যেন তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল হিমালয় পাহাড়টা। তারপর শান্ত সুরে বলল, 'কথায় বলে, উপহার পাওয়া ঘোড়ার মুখের ভেতরটা দেখতে নেই। তোমার কি ধারণা, অনুমতিটা কেন পেলে?'

'গার্ডরা নিশ্চয়ই টাওয়ারকে জানিয়েছে যে ওরা আমাদের কাগজপত্র চেক করে দেখেছে—ঠিক আছে সব।'

'দেরি কোরো না, স্টার্ট দাও। রোটরের আওয়াজ হলে তোমার গলা পাওয়া

যায় কিনা শুনতে চাই।'

সিকিউরিটির লোকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটো লাইন তৈরি করেছে, দু'লাইনের মাঝখানে ছয় ফিট চওড়া একটা গলি, এক লাইনের লোক আরেক লাইনের লোকের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে গলিটা হোটেল থেকে শুরু হয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, অতি সামান্য একটু দূরত্ব। রাস্তা থেকে পথিক এবং যানবাহন সব একশো গজ সরিয়ে দিয়ে একটা ব্যারিকেডও রাখা হয়েছে। তাছাড়াও চারদিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা। এতে করে আরব দেশের রাজা আর পারস্য উপ-সাগরের প্রিন্স অস্বস্তি বোধ করছেন, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তাদের নিজেদের দেশে—যেখানে প্রাণহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এবং বহুকাল চর্চার ফলে হত্যাকারীরা শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখাতে পারঙ্গম—এই দৃশ্য দৈনন্দিন জীবনেরই একটা অংশ। বরং সিকিউরিটির এই আয়োজন না থাকলেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতেন। তাছাড়া, এই ব্যাপক আয়োজনের অভাব ঘটলে তাঁরা এই ভেবে কাতর হতেন যে মেহমান হিসেবে তাঁদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না। বলাই বাহুল্য, সেক্ষেত্রে তেল আলোচনা ব্যর্থ হবার সমূহ আশঙ্কা থাকত।

সবার আগে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। ক্ষীণ একটু বিষণ্ন হাসি লেগে আছে তাঁর ঠোঁটে, এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু যেন উদাস হয়ে উঠলেন, সম্ভবত হাত নাড়ার জন্যে কেউ নেই লক্ষ করে। দীর্ঘদেহী, একটু মোটাসোটাই বলা যায়, ধূসর রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুটে চমৎকার মানিয়েছে। তাঁর অভিজাত চেহারা ভোগ-বিলাসী রোমান সম্রাটের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাথায় রুপোলি চুল, লোকে বলাবলি করে এইটেই তাঁর সবচেয়ে গর্বের এবং আনন্দের বস্তু। ওভাল অফিসে তাঁর থাকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁকে ছাড়া ওই অফিসে আর কাউকে পাঠাবার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না ভোটাররা—ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ইত্যাদি দেখিয়ে তাদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন মাল্টি-মিলিওনিয়ার। মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন, মানুষ তাঁকে পছন্দ করছে, সর্বত্রই তাঁর প্রশংসা—গত পঞ্চাশ বছরে আর কোন প্রেসিডেন্টের কপালে এতটা জোটেনি। বরাবরের মত আজও তাঁর হাতে সরু একটা ছড়ি রয়েছে। এই ছড়ির ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। বছর কয়েক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে সামান্য একটু চোট পেয়েছিলেন তিনি, তখন দু'দিনের জন্যে তাঁকে একটা ছড়ি ব্যবহার করতে হয়। পায়ের ব্যথা সেরে গেল, কিন্তু হাতের ছড়ি তাঁর হাতেই রয়ে গেল, সেটাকে তিনি হারিয়ে যেতে দিলেন না। তাঁর যে ছড়ির কোন দরকার করে না, সবাই তা জানে। তিনি রুজভেল্টের ভক্ত, হতে পারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার ইচ্ছে থেকে ছড়ির প্রতি এই আসক্তি। কারণ যাই হোক, সেই থেকে এই ছড়ি ছাড়া তাঁকে কেউ দেখেনি।

কোচের পাশে পৌঁছলেন তিনি, খানিকটা ঘুরলেন, মৃদু হেসে সামান্য বাউ করে মেহমানদের প্রথমজনকে কোচে ওঠার আমন্ত্রণ জানালেন।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আর সম্মান একমাত্র তাঁরই তো পাবার অধিকার।

দুনিয়ার সব তেল এক করলে যতটুকু হবে, তাঁর একার তেল তারচেয়ে কম নয়। দীর্ঘদেহী, কিন্তু রোগা নন, অথচ শরীরে এক ছটাক মেদ নেই। পরনে চোখ ধাঁধানো সাদা আলখাল্লা, নিচের অংশ কংক্রিটের মেঝেতে লুটাচ্ছে। মাথার চারদিক ঘিরে রয়েছে একটা আচ্ছাদন, সেটাও সাদা এবং চোখ-ধাঁধানো। তীক্ষ্ণ, ধারাল, একটু লম্বাটে চেহারা, সুন্দর করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চোখ জোড়ায় ঈগল পাখির দৃষ্টি, ঘন ভুরু দুটো চোখের ওপর কার্নিসওয়ালা টুপি। ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে মনে করা হয় তাঁকে, ইচ্ছে করলেই তিনি হতে পারতেন স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী শাসক, কিন্তু দুটোর কোনটাই হননি। তাঁর বিরুদ্ধে সত্যি মিথ্যে অনেক অভিযোগ আছে, কিন্তু প্রজারা তাঁর প্রশংসাও করে। কারও আইন মানার দরকার হয় না তাঁর, তিনি শুধু নিজের তৈরি আইন মেনে চলেন।

এরপর এলেন প্রিন্স। তাঁর ছোট্ট শেখ-রাজ্য এতই ছোট যে সেখানে রাজা উপাধি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না কেউ। আরব বাদশা জমির যা খাজনাপাতি পান তাঁর পাঁচ ভাগের এক ভাগও প্রিন্স পান না, অথচ তাঁর প্রভাবও রাজার মতই বিরাট। তাঁর দেশটা ছোট, অনুর্বর বালি ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই গোটা দেশ তেল-সাগরের ওপর ভাসছে। মিশুক, খোশ-মেজাজী ব্যক্তিত্ব। বিশ্বাসযোগ্য মহল থেকে বলা হয়, তাঁর গাড়িতে সামান্যতম যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও, সেই মুহূর্তে অচল জ্ঞানে বাতিল করা হয় সেটা, আর কখনও ব্যবহার করা হয় না—জেনারেল মোটরের জন্যে এটা একটা খুশির খবর সন্দেহ নেই। তিনি একজন দক্ষ পাইলট, নিপুণ রেস-কার ড্রাইভার, পৃথিবীর সেরা কয়েকটা নাইটক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ইন্টারন্যাশনাল প্লেবয় হিসেবে খ্যাতি পাবার জন্যে চাল-চলনে প্রায়ই তাঁকে বেহিসেবী হতে হয়েছে, তাতে অবশ্য কাউকে প্রতারিত, আহত বা কলঙ্কিত হতে হয়নি। ভোগ-বিলাসের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকলেও তাঁর খুলির ভেতর রয়েছে কমপিউটর ব্রেন, যেটা তাঁকে ঝানু ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মাঝারি গঠনের মানুষ, ভাল স্বাস্থ্য, মৃত্যুর সময়ও তাঁর পরনে ঐতিহ্যবাহী আরব পোশাক থাকবে না। স্যাভিল রো-র ভাল খদ্দেরদের একজন তিনি। তাঁর জুতো কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি করে হংকঙের চীনারা। সরু গোঁফ আছে, এতই সরু যে কয়েক হাত দূর থেকে সেটা চোখেই পড়ে না।

তাঁদের পিছু পিছু এল সাদ ফাহিম আর শেখ খায়ের, প্রথমজন বাদশার আর দ্বিতীয়জন প্রিন্সের তেল-মন্ত্রী। এরা দু'জনেই পশ্চিমা কাপড় পরে আছেন। দু'জনেরই মেদবহুল শরীর, নড়তে চড়তে বারোমাস। সাদ ফাহিমের রয়েছে ছাগলদাড়ি, শেখ খায়েরের দাড়ি-গোঁফ কামানো।

এরপর কোচে উঠলেন জেনারেল পীল। সামরিক পোশাক নয়, পরে আছেন হালকা নীল ডোরা কাটা কাপড়ের স্যুট, তবু তাঁকে একজন জাঁদরেল জেনারেল বলে চিনতে ভুল হয় না। কোমরে শুধু যদি একটা তোয়ালে জড়ানো থাকে, তাহলেও তাঁকে একজন মারমুখো যোদ্ধা বলে চেনা যাবে। ছয় ফিটের ওপর লম্বা, সারা শরীরে পাকানো রশির মত পেশী, ষাট বছর বয়সেও হাঁটা-চলার মধ্যে আশ্চর্য শক্তি আর প্রাণ-চাঞ্চল্যের বিচ্ছুরণ লক্ষ করার মত। নীল চোখ জোড়া ছায়া পড়া

লেকের পানি যেন, শান্ত আর ঠাণ্ডা। একটা কথা দু'বার কখনও জিজ্ঞেস করেন না। এমনকি তাঁর খয়েরী রঙের চুলে চকচকে ভাবটুকু পর্যন্ত এখনও অম্লান। জেনারেল পীল তেল বা তেলের বাজার দর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নন, আলোচনায় তিনি দর কষাকষি করতে পারবেন বলে সাথে আছেন ব্যাপারটা তাও নয়। যুদ্ধজাহাজ, ট্যাংক আর প্লেনের জন্যে তেল তাঁর দরকার—এবং দরকার মত চাইলেই পান, কে কোত্থেকে যোগাড় করবে সেটা তাঁর মাথাব্যথা নয়। তাঁর উপস্থিতির অন্যতম কারণ হলো, সামান্য একটা রাস্তা পেরোতে হলেও প্রেসিডেন্টের তাঁকে দরকার হয়। প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে বলেও থাকেন, জেনারেল পীলের অ্যাডভাইসের ওপর ভীষণ ভাবে নির্ভর করেন তিনি। জেনারেলের রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং নিরেট কমনসেন্স, ওয়াশিংটনের হাই-অফিশিয়ালরা তাঁকে ঈর্ষা করলেও এই দুই গুণের জন্যে তাঁর পদোন্নতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ওয়াশিংটনে যারা ঠাণ্ডা মাথার বিবেচক তারা সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেছে, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে জেনারেল পীলের কোন বিকল্প হতে পারে না। এই অতিরিক্ত দায়িত্ব কাঁধে চাপায় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীকে পরিচালনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে থাকে না বটে, কিন্তু দুটো দায়িত্বই তিনি সমান দক্ষতার সাথে পালন করে চলেছেন। কেউ তাঁকে কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখেনি। তিনি একজন স্বনামধন্য রাজনীতিক বা স্টেটসম্যান হতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মসূত্রে তিনটে অভিশাপ আছে তাঁর জীবনে—এক, মিথ্যে কথা বলতে পারেন না, দুই, অসৎ হতে পারেন না, তিন, অটল নৈতিকতা বোধ।

এরপর কোচে উঠলেন স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার। এই পদে সদ্য বরণ করা হয়েছে তাঁকে, এখনও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি। এই পদের জন্যে যে কোয়ালিফিকেশন দরকার ছিল তা তাঁর আছে, বরং বেশিই আছে, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমাণ নেহাতই কম। এনার্জি বা শক্তি একটা জিনিস, যা তাঁর অঢেল আছে। অত্যন্ত ছটফটে আর নার্ভাস টাইপের মানুষ, হাত আর চোখ মুহূর্তের জন্যেও শান্ত থাকে না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, দশ লাখে একটা ব্রেন। মরু তেল মালিকদের সাথে এই তাঁর প্রথম মুখোমুখি হওয়া। তিনি যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী বলে ধরে নিয়েছেন নিজেকে, সেটা তাঁর হাবভাব দেখে বেশ বোঝা যায়।

এরপর কোচে উঠলেন জেমস ফেয়ার। অস্বাভাবিক মোটা, মাথার পিছন দিকটা ছাড়া বাকি সবটুকুই টাক। তাঁর থুতনি আর গলায় কখনও তিনটে, কখনও পাঁচটা ভাঁজ পড়ে—নির্ভর করে কোনদিকে ঘাড় ফিরিয়ে থাকেন তার ওপর। সাধারণত মোটা মানুষদের চেহারায় যা দেখা যায় না, বিষণ্ণ একটা ভাব আছে তাঁর চেহারায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ব্যর্থ কৃষক, নিজের ফার্মে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী নন, তাঁর লক্ষ্য মান ভাল করা। অনেকেই বিশ্বাস করতে রাজি হবেন না, কিন্তু আসলে আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তেলপতিদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনায় প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করবেন তিনি।

সবশেষে এগিয়ে এলেন মাইক সিলভার। প্রেসিডেন্ট তাঁর পিঠে হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঠেলে দিলেন, কিন্তু এক পা পিছিয়ে এসে হাত-ইশারায় প্রেসিডেন্টকে এগিয়ে যাবার অনুরোধ জানালেন সিলভার। মৃদু হেসে অনুরোধ রাখলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে অনুসরণ করে ধাপ বেয়ে কোচে উঠলেন সিলভার। ভদ্রলোকের চেহারাই বলে দেয়, তাঁর পূর্ব-পুরুষরা ইতালীয় ছিলেন। পেটমোটা বলতে বা বোঝায় ইনি তাই, কিন্তু যথেষ্ট শক্তি রাখেন শরীরে। এনার্জি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ আছে, কিন্তু তাতে তাঁর রাতের ঘুম হারাম করার দরকার হয় না। তিনি সাথে আছেন—একটা কারণ, যাত্রীদের একজন গাইড দরকার। আরেকটা কারণ, প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারী ভাবে প্রেসিডেন্টই মেহমানদের হোস্ট বটেন, কিন্তু এই এলাকাটা মাইক সিলভারের, তিনি একাধারে হোস্ট এবং অতিথি। কারণ তিনিই সান ফ্রান্সিসকোর মেয়র।

রিয়্যার কোচ থেকে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল কবীর চৌধুরী। একটা বোতামে চাপ দিল সে। 'এস-টু?'

ওয়াল্টার সাড়া দিল, 'ইয়েস।'

'আমরা রওনা হলাম।'

'যাত্রা শুভ হোক, স্যার।'

মোটর শোভাযাত্রা শুরু হলো। সামনে রয়েছে একটা পুলিস কার, আর মোটরসাইকেল আউটরাইডাররা। তারপর লীড কোচ, প্রেসিডেনশিয়াল কোচ এবং রিয়্যার কোচ। অবশেষে আরও একটা পুলিস কার এবং দু'জন মোটরসাইকেল আউটরাইডার। এই মোটর শোভাযাত্রার সাথে মেহমানদের শহর দেখানোর কোন সম্পর্ক নেই, তা দেখানো হয়েছে কাল বিকেলে এয়ারফোর্স ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পরপরই। আজকের এটা নিতান্তই বিজনেস ট্রিপ। ক্যালিফোর্নিয়া বরাবর এগোবে। শোভাযাত্রা, ভ্যান নেস, লম্বার্ড, রিচার্ডসন এভিনিউ হয়ে পৌছুবে প্রেসিডিয়ো-তে। যাত্রা শুরুর বিন্দু থেকে সামনের সবটুকু রাস্তায় আজ সকালের জন্যে সাধারণ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভায়াডাক্ট অ্যাপ্রোচ ধরে এগোল শোভাযাত্রা। বাঁক নিল ডান এবং উত্তর দিকে। আর তারপরই নাক বরাবর দেখা গেল গোল্ডেন গেট ব্রিজ—দূর থেকে মনে হলো, ওদের সামনে শূন্যে ঝুলে আছে যেন।

তিন

প্রকৌশল জগতে গোল্ডেন গেট ব্রিজ একটা বিস্ময়। সান ফ্রান্সিসকোর লোকেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে, প্রকৌশলগত দক্ষতা আর নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে এটা

এই জগতের একমাত্র বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। সবাই জানে, এটা তৈরি হবার পরপরই পৃথিবীর সেরা, সুন্দরতম ব্রিজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ইঁট রঙা বিশাল দুটো টাওয়ার রয়েছে, ঘন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে উঠে গেছে আকাশের দিকে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভেসে আসে এই কুয়াশা, প্রায় সময়ই ব্রিজের ওপরের অংশটাকে বাদ রেখে ঢেকে ফেলে নিচের সবটুকু—তখন মনে হয় গোটা ব্রিজ শূন্যে ভাসছে। আর যখন কুয়াশা সম্পূর্ণ সরে যায়, স্তম্ভিত বিস্ময়ে দর্শকরা উপলব্ধি করে যে জাঁকজমকের সাথে এই রকম একটা বিশাল মেকানিক্যাল মহাকাব্যের কথা মানুষ শুধু যে কল্পনা করার স্পর্ধা রাখে তাই নয়, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার কারিগরী জ্ঞান এবং দক্ষতাও তার আছে। এমন কি চোখ যখন সাক্ষ্য দেয় যে, হ্যাঁ, ওটা ওখানে আছে, তখনও নির্দ্বিধায় মেনে নিতে ইতস্তত করে মন।

গোল্ডেন গেট ব্রিজ সৃষ্টির কৃতিত্ব এককভাবে মাত্র একজন মানুষের ওপর বর্তায়। ভদ্রলোকের নাম যোশেফ. বি. স্ট্রস। ভদ্রলোক যে জেদি ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কাজে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা টপকাতে হয় তাঁকে। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও কম ছিল না। তাঁর আর্কিটেক্ট বন্ধুরাও তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে। তারা বলেছিল, তোমার এই স্বপ্ন টেকনিক্যাল দিক থেকে অসম্ভব। কারও কথায় কান দেননি যোশেফ। কাজে নেমে পড়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এই গোল্ডেন গেট ব্রিজ। উদ্বোধন করা হয় উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে।

উনিশশো চৌষট্টি সালে ভ্যারাজ়ানো-ন্যারোজ ব্রিজ তৈরির আগে পর্যন্ত এটাই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা সিঙ্গেল-স্প্যান সাসপেনশন ব্রিজ। আজও সবচেয়ে লম্বা ব্রিজের চেয়ে গোল্ডেন গেট মাত্র বিশ গজ ছোট।

গোল্ডেন গেট নদীর গা থেকে অস্বাভাবিক চওড়া টাওয়ার দুটো ওপর দিকে সাড়ে সাতশো ফিট উঠে গেছে, লম্বায় ব্রিজটা পৌনে দু'মাইল। বানাতে তখন খরচ পড়েছিল সাড়ে তিন কোটি ডলার। এখন তৈরি করতে খরচ লাগবে চব্বিশ কোটি ডলার বা তারও বেশি।

এক শ্রেণীর আমেরিকানদের খুব উপকারে লাগছে গোল্ডেন গেট ব্রিজ। জীবনের বোঝা যাদের কাছে অসহ্য বলে মনে হয়, যারা এই বোঝা ফেলে পালাতে চায়, তাদের কাছে এই ব্রিজ বিদায় নেয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। কম করেও পাঁচশো আত্মহত্যার কথা জানা গেছে, ধরা যায় আরও পাঁচশোর কথা জানা যায়নি। রেকর্ড রয়েছে, এদের মধ্যে বেঁচে গেছে মাত্র আটজন। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার মানে তারা বেঁচে গেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ব্রিজ থেকে পানির গা দুশো ফিট নিচে, পানির সাথে শরীরের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হওয়ার পরও কেউ যদি বেঁচে যায়, গোল্ডেন গেটের দানব আকৃতি ঢেউ আর তীব্রগতি স্রোত তার বিদায় নেয়ার ইচ্ছেটাকে খুব দ্রুততার সাথে পূরণ করে দেবে। এই ঢেউ আর স্রোতের কারণে, ব্রিজের দু'ধারেই, বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত, সারাক্ষণ কাঁপছে।

দৈত্যাকার প্রথম টাওয়ারের নিচ দিয়ে এগোল মোটর শোভাযাত্রা। বিলাসবহুল

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে হাস্য-রসিকতায় ছেদ পড়ল হঠাৎ করেই। গোল্ডেন গেট ব্রিজে উঠলে সবারই এই দশা হয়, মুখে কথা ফোটে না। বাদশার চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটল, ব্রিজটাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর রাজ্যে এ-ধরনের ব্রিজ নেই, কিন্তু সেটা তাঁর মনোবেদনার কারণ হলো না। তিনি দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে এর চেয়ে বড় একটা ব্রিজ তৈরি করে সবাইকে তাক লাগাবার জন্যে যত বড় নদী দরকার, অত বড় নদীই তাঁর রাজ্যে নেই।

জুনের চমৎকার একটা সকাল। গোটা বে এলাকা ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর একটা ছবি যেন। ওদের সামনে গোল্ডেন গেট বরাবর উজ্জ্বল সবুজ আর হলুদ রঙা খেত-খামার, উর্বর আদিগন্ত জমিতে ফসলের আবাদ। ওদের ডান দিকে সূর্য, এরই মধ্যে নির্মেঘ আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। নিচে গোল্ডেন গেটের নীল-সবুজ পানি, ঝলমল করছে রোদ পড়ে।

গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখে প্রিন্সের অনুভূতি হলো সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি তাঁর নিজের যুগের মানুষ, কিছু দেখে বিস্মিত হলে সেটা প্রকাশ করতে দ্বিধায় ভোগেন না। বললেন, 'আমি মুগ্ধ। আমেরিকা এই ব্রিজ নিয়ে গর্ব করতে পারে। যদি কখনও সুযোগ হয়, এর ওপর কিছুক্ষণ হাঁটব আমি।' কথাটা বলার সময় তিনি জানলেন না, একটু পরই সুযোগটা পেতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু সুযোগ পেলেও হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

বাদশা এবং প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'টেকনিক্যাল নো-হাউ দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছে আমেরিকা, কিন্তু আপনাদের নদী কোথায়, যে ব্রিজটা তৈরি হবে?'

'আপনি বলতে চাইছেন, মি. প্রেসিডেন্ট,' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল প্রিন্স, 'আগে আমরা একটা কৃত্রিম লেক তৈরি করি, তাহলে ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ হবে আপনার, তাই না?'

বাদশার চেহারা থেকে গাম্ভীর্যের ছায়া একটু সরে গিয়ে আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল, তিনি বললেন, 'আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়!'

নিজের চারদিকে, কোচের ভেতর, আরও একবার চোখ বুলিয়ে প্রিন্স বললেন, 'আপনার স্টাইল আমার খুব পছন্দ, মি. প্রেসিডেন্ট। কিভাবে বেড়াতে হয়, আপনি জানেন। এই রকম একটা কোচ সম্ভব, আমাকে কেউ বলেনি। আমার একটা থাকলে মন্দ হত না।'

'এই মুহূর্তে আরেকটা কোচ তৈরির নির্দেশ দিলাম আমি,' সহাস্যে বললেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর মুখের কথাই হুকুম, সাত তাড়াতাড়ি জায়গামত পৌঁছে যাবে। 'কোচটা আপনাকে উপহার দিতে পেরে আমার দেশ সম্মানিত বোধ করবে। ওতে আরাম আয়েশ আর সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা অবশ্যই আপনার নিজের স্পেসিফিকেশন অনুসারে হবে।'

শুকনো গলায় বাদশা বললেন, 'প্রিন্স তার যে-কোন ভেহিকেলের অর্ডার এক ডজনের কম দেন না। আপনি যদি তাঁকে একটা উপহার দেন, আরও অন্তত এক জোড়া তিনি কিনে নেবেন।' হাত তুলে আকাশের দিকে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। মাথার ওপর দুটো ন্যাভাল হেলিকপ্টার রয়েছে। 'ধন্যবাদ, মি.

প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের নিরাপত্তার দিকটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখছেন।'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন, কিন্তু তাঁর হাসিতে কোন মন্তব্য পাওয়া গেল না। যা দিবালোকের মত সত্য, সে-ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগ কোথায়?

জেনারেল পীল বললেন, 'সিকিউরিটির ব্যবস্থা যেটুকু চোখে পড়ছে, স্রেফ লোক দেখানো, ইওর হাইনেস।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে চীফ অভ স্টাফের দিকে তাকালেন বাদশা, মুখ খোলার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কাজেই ব্যাপারটা জেনারেল পীলকে ব্যাখ্যা করতে হলো।

'ব্রিজের ওপারে আমাদের সিকিউরিটি অফিসার আর মাঝে মধ্যে দু'একটা পুলিস কার ছাড়া এখান থেকে সান রাফায়েল পর্যন্ত কিছুই আপনার চোখে পড়বে না, ইওর হাইনেস। অথচ সিকিউরিটির কড়া ব্যবস্থা ঠিকই করা হয়েছে। এখান থেকে সান রাফায়েলের মাঝখানে প্রতি গজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এফ. বি. আই.। তারা সবাই সশস্ত্র। স্নাইপার সবখানে আছে, এমনকি আমেরিকাতেও।'

'বিশেষ করে আমেরিকাতে,' প্রেসিডেন্ট গম্ভীর মুখে বললেন।

চেহারায় কৃত্রিম সিরিয়াস ভাব ফুটিয়ে তুলে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজেই আমরা নিরাপদ?'

হাসি খুশি, সদা প্রফুল্ল ভাব ফিরে পেলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'সম্পূর্ণ। ধরে নিন, ফোর্ট নক্সের ভল্টে রয়েছেন আপনারা।'

ঠিক এই সময় পরপর পাঁচটি ঘটনা ঘটল। একটা দাগ আঁকা আছে, ব্রিজের মধ্যভাগ নির্দেশ করে। ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল লীড কোচ এই দাগ পেরিয়ে আসার পরপরই।

রিয়্যার কোচে সামনে কনসোল নিয়ে বসে আছে কবীর চৌধুরী, কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিল সে। দু'সেকেন্ড পর লীড কোচের সামনের অংশে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটল, ড্রাইভারের একরকম পায়ের নিচেই। আহত হয়নি, কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল লোকটা, বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চাপ দিল ব্রেক পেডালে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'সুইট জেসাস!' ঘাবড়ে গেল ড্রাইভার। কোচের হাইড্রলিক লাইন অদৃশ্য হয়েছে, বুঝতে আরও এক সেকেন্ড সময় নিল সে। হ্যান্ড-ব্রেক টেনে লকড পজিশনে নিয়ে এল, তারপর ফার্স্ট গিয়ার দিল। সাথে সাথে কমতে শুরু করল কোচের গতি।

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দু'পাশটা ধরল কবীর চৌধুরী। পিছনে, তার সঙ্গীরাও তাই করল—যে যার সামনের সীটের পিছনটা দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল। প্রথম সারির সীটে কোন আরোহী নেই। গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে এসে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক পেডালে চাপ দিল রস পেরট, যেন মেঝে ফুটো করে নিচের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে ওটাকে।

রিয়্যার কোচের পিছনে পুলিস কার রয়েছে। রিয়্যার কোচ ব্রেক করলে পিছনে

লাল আলো জ্বলার কথা, জ্বলল না, তার কারণ আগেই তার ছিঁড়ে রেখেছে পেরট। মোটর শোভাযাত্রা এগোচ্ছিল ধীর গতিতে, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল, পুলিস কারও রিয়্যার কোচের পঁচিশ ফিট পিছনে থেকে অনুসরণ করে আসছিল। পুলিস কারের ড্রাইভারের মনে কোন রকম উদ্বেগ বা সন্দেহ ছিল না, জানে, মোটর শোভাযাত্রা উপলক্ষে আজ সকালে ব্রিজের ওপর সাধারণ যানবাহন চলাচল নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কার চালাবার ফাঁকে দু'এক সেকেন্ডের জন্যে দু'পাশের অপরূপ সৌন্দর্য দেখার লোভও তাই সামলায়নি সে। তাই, বিপদ যখন টের পেল, দুটো গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব কমে তখন অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। পাকা ড্রাইভার, কিন্তু বিস্ময় সামলে তৎপর হতে সে-ও যথেষ্ট সময় নিল। ব্রেক করল সজোরে এবং অকস্মাৎ, কিন্তু তখন রিয়্যার কোচ থেকে দূরত্ব মাত্র পাঁচ ফিট।

নিরেট এবং অচল একটা জিনিসের সাথে ঘণ্টায় বিশ মাইল গতিতে ছুটে এসে ধাক্কা খাওয়া, আরোহীদের জন্যে মোটেও কৌতুককর কোন ব্যাপার নয়। চারজন পুলিস অফিসার, কম বেশি সবাই চোট পেল।

সংঘর্ষের মুহূর্তটিতে কন্ট্রোল প্যানেলের আরও একটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। লীড কোচ, যার গতি শুধু হ্যান্ডব্রেকের সাহায্যে শ্লথ হচ্ছে, এই মুহূর্তে গতি ঘণ্টায় দশ মাইল, তার পিছন দিকের ড্রিঙ্ক কেবিনেটে ছোট্ট আরও একটা বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের পরপরই হিস্‌স্ শব্দ শোনা গেল, যেন প্রচণ্ড চাপে পড়ে আটকা পড়া বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা কম্পার্টমেন্ট ঘন, ধূসর রঙের গ্যাসে ঢাকা পড়ে গেল। ড্রাইভার জ্ঞান হারাবার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কোচ, ডান দিকে সরে গিয়ে রাস্তার কিনারা দু'ফিট থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রিজের ধারে সেফটি ব্যারিয়ার রয়েছে, ট্যাংকের চেয়ে দুর্বল কিছু এসে ধাক্কা দিলে ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচ কোন বিপদে পড়ল না। লীড কোচের ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠতে দেখে ঠিক সময়েই ব্রেকে চাপ দিল ড্রাইভার, ডান দিকে সরে যাওয়া লীড কোচকে এড়াবার জন্যে আরও একটু বাঁ দিকে সরে গেল সে, থামল সেটার পাশেই। বারোজন আরোহীর প্রত্যেকের চেহারায় অসুখী ভাব ফুটল, হেরফের শুধু মাত্রার। এখনও কেউ তাঁরা সন্দিহান বা সতর্ক হয়ে ওঠেননি।

শোভাযাত্রার নাকের ডগায় ছিল দু'জন মোটর সাইকেল আউটরাইডার আর একটা পুলিস কার। আশ্চর্যই বলতে হবে, পিছনে এতক্ষণ ধরে যা ঘটছে, তার কিছুই তারা টের পায়নি। লীড কোচ দাঁড়িয়ে পড়েছে, এইমাত্র লক্ষ্য করল ওরা। সাথে সাথে ঘুরতে শুরু করল।

ওদিকে রিয়্যার কোচে সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটছে। বাঁ-হাতি দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল রুস পেরট, চার্লি নামল উল্টো দিকের দরজা দিয়ে, ঠিক যখন দু'জন মোটর সাইকেল আউটরাইডার কোচের প্রায় পাশে এসে দাঁড়াল। পেরট বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠুন! এক গোঁয়ারগোবিন্দ ঝামেলা করছে।'

মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে পেট্রলম্যান দু'জন লাফ দিয়ে কোচে উঠল। যে দুটো মোটরসাইকেল আর পুলিস কার ফিরে আসছে, তাদের আরোহীরা এই পেট্রলম্যানদের এখন আর দেখতে পাবে না, কাজেই এদের ব্যবস্থা

করার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই। কোচে উঠেই পেট্রলম্যানরা পিছন দিকে এগোল, সরু প্যাসেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একজন লোককে পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ওদের পিছন থেকে নির্দেশ এল, 'হল্ট!' দু'জনই পাথর হয়ে গেল।

কোচের দরজা দিয়ে এক এক করে দ্রুত সাতজন লোক বেরিয়ে এল। এদের পাঁচজন যোগ দিল পেরট আর চার্লির সাথে, তারপর সামনের কোচগুলোর দিকে ছুটল।

বাকি দু'জন ছুটল পিছন দিকে, নাক ভাঙা পুলিস কার লক্ষ্য করে। কোচের ভেতর আরও দু'জন লোককে দেখা গেল, পিছনের দরজাটা দড়াম করে খুলল তারা, নিরীহদর্শন একটা টিউব আকৃতির ইস্পাতকে তেপায়ার ওপর বসাল। কবীর চৌধুরী আর রোজেন যেখানে ছিল সেখানেই থাকল। হাত-পা বাঁধা লোকটাও পড়ে থাকল প্যাসেজে। তার মুখে তুলো গোঁজা রয়েছে, কিন্তু চোখ দুটো খোলা। রাজ্যের ঘৃণা আর জিঘাংসা নিয়ে রোজেনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কারণ রোজেনই তার পরিচয় ছিনতাই করেছে।

পুলিস কারের দিকে যারা ছুটে গেল তাদের নাম টেরি আর হুয়ান। গিয়ে দেখল, সামনের দরজার দুটো জানালাই খোলা, অর্থাৎ কাঁচ নামানো। ভেতরের চারজন অফিসার সবাই চোট পেয়েছে, তবে কারও অবস্থাই গুরুতর নয়। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, নাকের হাড় যে ভেঙে গেছে সন্দেহ নেই। পিছনে বসা আরেকজনের কপাল ফুলে আলু। সংঘর্ষের ফলে সবাই হতভম্ব, এখনও নিজেদের সামলে নিতে পারেনি। এটা একটা বিপদ, হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে তৈরি থাকা দরকার, এই চিন্তা উদয় হয়নি কারও মাথায়। টেরি আর হুয়ান দু'জন দু'দিকের দরজা খুলে ওদের হাল হকিকত জানতে চাইল, ভাল করে না শুনেই চু-চু আওয়াজ করে সহানুভূতি প্রকাশ করল, সেই সাথে নিজেদের কাজও গুছিয়ে নিচ্ছে। হাতল ঘুরিয়ে সামনের জানালা দুটোর কাঁচ তুলে দিল ওরা। টেরি তার দরজাটা বন্ধ করল। আর হুয়ান নিজের দরজা বন্ধ করার আগে গাড়ির ভেতর একটা গ্যাস বোমা ফেলল।

পুলিস কার আর মোটরসাইকেল আউট রাইডাররা ফিরে আসছে। এই দৃশ্য তাদের কারও চোখে পড়ল না। গাড়িগুলো দাঁড়াল, আরোহীরা নামল, তারপর সতর্কতার সাথে এগোল লীড কোচের দিকে। এই সময় ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল রস পেরট, চার্লি আর তাদের সঙ্গীদের। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কোন না কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

'জলদি!' গলার রগ ফুলে উঠল পেরটের। 'আড়াল নাও! ওই কোচের পেছনে দু'জন বেজন্মা ওত পেতে আছে—একজনের কাছে বাজুকা, আরেকজনের কাছে মেশিন-পিস্তল। কোচের পিছনে, জলদি!'

পুলিস অফিসাররা তাড়াতাড়ি পিঠ দেখাল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে কিনা চট করে পরীক্ষা করল পেরট। যাচ্ছে না। ওদিক থেকে অবশ্য কোন বিপদ আসবে বলে মনে করছে না সে। তবে ওদের কীর্তিকলাপ দেখতে পেলে আরোহীরা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরজা। তখন তালা ভাঙা একটা ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে।

চার্লিকে ইঙ্গিত দিল পেরট, আরেকজন লোককে নিয়ে কোচের পিছন দিকে চলে গেল সে। পুলিস অফিসাররা তাকে অনুসরণ করতে যাবে, পিছন থেকে চার্লি বলল, 'খুন হতে না চাইলে মাথার পিছনে হাত তোলো!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ছয়জন।

'ঘোরো। সাবধান।'

ঘুরে ওরা দেখল, একজোড়া সাবমেশিন-পিস্তল ওদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চেহারা থেকে রাগ এবং আত্মবিশ্বাস দুটোই অদৃশ্য হলো ওদের। ওদের ওপর নজর রাখল চার্লি, অপর একজন ওদের রিভলভারগুলো হোলস্টার থেকে বের করে নিল। পেরট তার সঙ্গীকে নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠছে দেখতে পেয়ে, পড়িমরি করে সেদিকে ছুটল বাকি দু'জন লোক।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরা বিপদ সম্পর্কে এখনও কিছু জানেন না। একটু বিরক্ত, একটু হতাশ, খানিকটা বিষণ্ন দেখাল তাঁদের, কিন্তু কাউকেই অস্থির বা উদ্বিগ্ন দেখাল না। আরোহীদের দু'একজন আসন ছেড়ে গাত্রোত্থানের উদ্যোগ নিচ্ছেন, এই সময় ধাপ বেয়ে কোচে উঠতে দেখা গেল রস পেরটকে।

'সুধীবৃন্দ, আপনারা সবাই আরাম করে বসুন,' বলল সে। 'কিছু না, সামান্য একটু দেরি।' সাদা কোটের এমনই মহিমা—রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে একজন কসাইয়ের পরনে শুধু যদি অ্যাপ্রনও থাকে, ভিড়ের ভেতর তার জন্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়—গায়ে ঢিল দিয়ে শান্ত হলো সবাই।

সবাইকে শান্ত করার কাজটি শেষ করেই কোটের ভেতর থেকে কদাকার চেহারার একটা অস্ত্র বের করল পেরট। ডাবল ব্যারেল, বারো বোর শটগান, সহজে সাথে রাখার জন্যে ব্যারেল আর স্টকের বেশির ভাগ কেটে ফেলা হয়েছে।

রাজার চেহারায় কৌতুক ফুটে উঠল, প্রিন্সের কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কি কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে করেন আপনি?'

'হাইজ্যাক, হোল্ড-আপ, কিডন্যাপ,' প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে কথা বলছে পেরট, 'এটাকে যা খুশি বলতে পারেন আপনারা। আপনাদের ভালর জন্যে আমার তরফ থেকে সবাইকে একটাই অনুরোধ, কেউ নড়াচড়া করবেন না।'

'গুড গড ইন হেভেন!' এইটুকু বলেই ভাষা হারিয়ে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন তিনি—কুমড়ো আকৃতির মাথা, খুলির সাথে সাঁটা কান, চ্যাপ্টা নাক—চেহারাটা বাঘের মত, কিন্তু ঠোঁটে রয়েছে বিষাদ মাখা একটু হাসি। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকলেন, রস পেরট যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছে, এই দুনিয়ার মানুষ নয়। মুহূর্তের জন্যে রাজা আর প্রিন্সের দিকে একবার তাকালেন তিনি। তারপর আবার ঝট করে ফিরলেন পেরটের দিকে। প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা, কিন্তু নিজেকে বিস্ফোরিত হতে দিলেন না। এরচেয়ে অনেক বড় সংকটেও নিজেকে শান্ত রাখতে অভ্যস্ত তিনি। তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে হে তুমি? আমি জানতে চাইছি, তুমি সুস্থ কিনা! আমি কে, জানো? যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেছ?'

'জানি।' বিষণ্ন হাসিটুকু পেরটের ঠোঁটে আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়ল। 'নিয়তি আপনাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে ছেড়েছে। আর আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে

এসে প্রেসিডেন্টের দিকে বন্দুক ধরতে বাধ্য করেছে। এ-ব্যাপারে আমার বা আপনার কারও কিছু করার নেই। তবে, একথা ঠিক, প্রেসিডেন্ট হওয়াই আপনার কাল হয়েছে। অবশ্য, আরও অনেক প্রেসিডেন্টের বেলায়ও কথাটা সত্যি। প্রেসিডেন্টের দিকে বন্দুক তাক করা আমেরিকার ইতিহাসে নতুন কোন ঘটনা নয়, তাই না? প্লীজ, আমার কাজে বাধা দেবেন না।'

চীফ অভ স্টাফ জেনারেল পীলের দিকে সরাসরি তাকাল পেরট। কোচে ওঠার মুহূর্ত থেকে জেনারেলের দিকে একটা সতর্ক চোখ'রেখেছে সে। 'জেনারেল, আপনার সাথে সবসময় একটা পিস্তল থাকে। প্লীজ, আমাকে সেটা দিন। কোন রকম চালাকি করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না; নিশানা ঠিক হলে, আপনার পয়েন্ট টুটু-ও কম ভয়ঙ্কর নয়। তবে, আমার হাতের এটার সাথে তুলনা চলে না; ট্রিগারটা যদি টেনে দিই, আপনার বুকে একটা সুড়ং তৈরি হবে, এদিকে ঢুকিয়ে ঠেলা দিলে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে একটা টেনিস বল। আমি জানি, সাহস আর আত্মহননের ঝোঁক, এই দুটোকে এক করে গুলিয়ে ফেলার লোক আপনি নন।'

চীফ অভ স্টাফের চেহারা দেখে মনে হলো, তিনি হাসি চাপছেন। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন একবার। পকেট থেকে খুদে একটা কালো অটোমেটিক বের করে বাড়িয়ে দিলেন পেরটের দিকে।

আলগোছে সেটা নিল পেরট, বলল, 'ধন্যবাদ। আপনাদের কার কপালে কি আছে, আমি জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি আমাদের কারও বিরুদ্ধে যদি কেউ আঙুলটিও নাড়েন, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। শান্ত হয়ে বসে থাকুন, কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

কোচের ভেতর অটুট নিস্তব্ধতা নামল। বাদশার চোখ দুটো বন্ধ, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা; মনে হচ্ছে প্রার্থনা করছেন। হঠাৎ করেই চোখ মেলে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর জানতে চাইলেন, 'ফোর্ট নক্সের ভল্ট, মি. প্রেসিডেন্ট, ঠিক কতটুকু নিরাপদ?'

'হোয়াট! এ অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'বিশ্বাস করলে ভাল করবে, ডিকসন,' বলল কবীর চৌধুরী। একটা হাতে ধরা মাইক্রোফোনে কথা বলছে সে। 'প্রেসিডেন্ট, বাদশা আর প্রিন্স এখন আমাদের মুঠোয়।'

'কিন্তু···এ সম্ভব নয়!'

'দু'এক মিনিট যদি অপেক্ষা করো, প্রেসিডেন্ট নিজেই তোমাকে কনফার্ম করবেন। ইতিমধ্যে, প্লীজ, বোকার মত কিছু করে বোসো না, বা আমাদের কাছে পৌঁছুবার কোন চেষ্টা কোরো না। আমরা বরং তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। দক্ষিণ প্রবেশ মুখের কাছে কয়েকটা পেট্রল কার আছে তোমাদের, তাই না? ওগুলোর সাথে তোমার রেডিও যোগাযোগও আছে, ঠিক?'

একজন চীফ অভ পুলিস সম্পর্কে যার যে ধারণাই থাকুক, তার সেই ধারণার সাথে আর্ল ডিকসনের চেহারা কোন মতেই মিলবে না। তালপাতার সেপাই,

বাতাসে উড়ছে বলে মনে হয়। চোখে ভারি পাওয়ারের বাই ফোকাল। মাথায় চুল প্রচুর, কিন্তু ব্রাশ করার সময় হয় না। তাঁকে দেখে নাম করা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বলে মনে হয়। খুব বেশি লম্বা বলেই বোধহয়, একটু কুঁজো দেখায়। পরনে রক্ষণশীল পোশাক, দাড়ি-গোঁফ সব কামানো। বয়স পঞ্চান্ন, কিন্তু দেখে মনে হয় পঁয়ষট্টি। অসাধারণ বুদ্ধি রাখেন বলেই কয়েক হাজার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক আজ তাঁর এলাকায় স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রাণের দুশমন হলেও, তারা সবাই স্বীকার করে, চীফ অভ পুলিস হিসেবে ডিকসনের চেয়ে যোগ্য লোক এই এলাকায় এর আগে কেউ আসেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে, আর্ল ডিকসনের অসাধারণ বুদ্ধিও, সাময়িক ভাবে হলেও, বেশ কিছুটা ঘোলা হয়ে পড়েছে। তাঁকে হতভম্ব দেখাল। বললেন, 'ঠিক।'

'গুড। অপেক্ষা করো।'

ঘাড় ফেরাল কবীর চৌধুরী। কোচের পিছন দিকে দাঁড়ানো লোক দু'জনকে ইঙ্গিত দিল। দরজার কাছে ফিট করা রিকয়েললেস মিসাইল থেকে আচমকা হুস্ করে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। তিন সেকেন্ড পর দক্ষিণ টাওয়ারের দুই পাইলনের মাঝখানে ভোজবাজির মত ধূসর রঙের ঘন একটা মেঘ দেখা গেল। প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে সেটা। মাইক্রোফোনে কথা বলল কবীর চৌধুরী। 'দেখলে, ডিকসন?'

'এক ধরনের বিস্ফোরণ,' চীফ অভ পুলিস বললেন। আগের চেয়ে অনেক শান্ত শোনাল তাঁর গলা। 'প্রচুর ধোঁয়া···কিন্তু ধোঁয়া কিনা···'

'নার্ভ গ্যাস। স্থায়ী কোন রিয়্যাকশন নেই, কিন্তু সাথে সাথে অক্ষম করে দেয়। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে নিউট্রাল হতে সময় নেয় দশ মিনিট। এই গ্যাস যদি আমাদের ব্যবহার করতে হয়, আর তখন যদি উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর অথবা উত্তর-পুব দিক থেকে বাতাস বয়, পরিণতির জন্যে দায়ী হবে তুমি, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'এই গ্যাসের বিরুদ্ধে প্রচলিত মাস্ক অচল। সেটাও তুমি বোঝো তো?'

'বুঝি।'

'ওই একই ধরনের আরও একটা উইপন আছে আমাদের, ব্রিজের উত্তর দিকটা কাভার করছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'পুলিস স্কোয়াড আর ইউনিট, এবং আর্মড ফোর্সকে তুমি ব্যাখ্যা করে বোঝাবে, ব্রিজে আসার চেষ্টা করা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে। ওদেরকে তুমি নির্দেশ দেবে, কেউ যেন ব্রিজে আসার চেষ্টা না করে। আমার এই কথাগুলো কি পরিষ্কার বুঝতে পারছ তুমি?'

'পারছি।'

'আমি জানি, এরই মধ্যে রিপোর্ট পেয়েছ তুমি, দুটো ন্যাভাল হেলিকপ্টার ব্রিজের ওপর চক্কর দিচ্ছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।' পুলিস প্রধানের চেহারা থেকে বিধ্বস্ত ভাবটা কেটে যাচ্ছে। অসাধারণ বুদ্ধি একটু একটু করে ফিরে পেতে শুরু করেছেন তিনি। 'সত্যি কথা বলতে কি, ও-দুটোর উপস্থিতি আমাকে একটু ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথাটা খাটাও,' উপদেশ দিল কবীর চৌধুরী। 'তুমি অত্যন্ত

বুদ্ধিমান লোক, আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি, এই মুহূর্তে তোমার বুদ্ধি ঠিক থাকুক। কারণ, তুমি যদি বুদ্ধি হারিয়ে ফেল, সমূহ বিপদ ঘটে যাবার আশঙ্কা তাতে শুধু বাড়বে। সামান্য দুটো 'কপ্টার দেখে যদি ধাঁধায় পড়ে যাও, সেটা শুভলক্ষণ বলে ভাবতে পারি না। ও-দুটো এখন আমাদের হাতে। আমার কথা ঠিক মত শুনছ তো, ডিকসন?'

'শুনছি।'

'আরও মনোযোগ দিয়ে শোনো, আখেরে ভাল হবে। সবগুলো লোকাল আর্মি আর ন্যাভাল এয়ার কমান্ডারের হেডকোয়ার্টারে অ্যালার্ম পাঠাও। ওদেরকে বলো, ও-দুটো হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাবার জন্যে কোন ফাইটার পাঠানো হলে, বা অন্য কোন ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হলে তার পরিণতিতে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মেহমানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে। ওদেরকে আরও বলো, কোথাও থেকে কোন প্লেন বা আর কিছু টেক-অফ করা মাত্র সাথে সাথে জানতে পারব আমরা। বলো, মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্টেশনও আমাদের কব্জায় চলে এসেছে।'

'গুড গড!' পুলিস প্রধানের গলাটা একটু কেঁপে গেল।

'তিনি এই মুহূর্তে তোমাকে কোন সাহায্য করবেন না। রাডার স্টেশনে আমার লোক যারা রয়েছে, তারা সবাই যোগ্য রাডার অপারেটর। ওই স্টেশন উদ্ধার করার জন্যে আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্স কেউ কোনরকম চেষ্টা চালাতে পারবে না। যদি চালায়···কি হবে, ডিকসন?'

'কি?'

'রাডার স্টেশন দখল করার জন্যে কোন হামলা চালানো হলে, আমি জানি, সেটা আমরা ঠেকাতে পারব না,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানি, হামলাটা চালাবার নির্দেশ যার কাছ থেকে আসবে তার ওপর প্রেসিডেন্ট খুশি হবেন না। কারও বোকামির জন্যে তাকে যদি একটা কান হারাতে হয়, কিভাবে তার ওপর খুশি হবেন তিনি, ডিকসন?'

'বলুন!'

'সেই লোকের ওপর আরব বাদশা আর প্রিন্সও খুশি হবেন না। তেল বিক্রি করতে এসে যদি কান কাটা যায়, সে দুঃখ তাঁরা রাখবেনই বা কোথায়! ডিকসন?'

'বলুন!'

'আমার কথা স্পষ্ট?'

'জ্বী।'

'ভেব না, আমি সিরিয়াস নই। তিনটে ডান দিকের কান প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ডেলিভারি দেব আমরা।'

'কথা দিচ্ছি রাডার স্টেশন দখল করার জন্যে কোন রকম চেষ্টা চালানো হবে না।'

অত্যন্ত যোগ্য অফিসার ক্যাপ্টেন ওয়াকার। পুলিস চীফ তাকে নিজের ডান হাত বলে মনে করেন। ওয়াকারের মাথায় সোনালি চুল, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, সদা হাস্যময়। পুলিস প্রধানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ ৎ দ্রুত একবার চোখ

রগড়াল। না, ভুল দেখেনি সে। চীফ সত্যি ঘামছেন। দশ বছর একসাথে কাজ করছে তারা, চীফকে এই প্রথম ঘামতে দেখল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করল ওয়াকার। হাতটা নামিয়ে চোখের সামনে ধরল। ঘামে ভেজা হাতটা চিকচিক করছে দেখে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'আশা করি,' কবীর চৌধুরী বলল, 'তুমি কথা রাখবে। একটু পর আবার যোগাযোগ করব।'

'আমি যদি ব্রিজের কাছে যাই, কোন আপত্তি নেই তো? যতটুকু বুঝতে পারছি, একটা কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার দরকার হবে আমার। সেটা ব্রিজের যত কাছে হয় ততই ভাল।'

'আসো ব্রিজের কাছে, কিন্তু ব্রিজের ওপর পা দিয়ো না। আরেকটা কথা, প্রেসিডিয়ো-তে কোন প্রাইভেট কার ঢুকতে চাইলে সেটাকে যেন বাধা দেয়া হয়। আগে আমি ভায়োলেন্সের ভক্ত ছিলাম, এখন আমি ওটার ঘোর বিরোধী। একেবারে বাধ্য না হলে ভায়োলেন্সের আশ্রয় নিতে চাই না। কিন্তু যদি নিতেই হয়, আমি চাই না কোন নিরীহ লোক ভুগুক।'

'আপনি অত্যন্ত বিবেচক,' পুলিস প্রধানের গলার সুরে তিক্ততা।

মুচকি একটু হেসে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী।

লীড কোচ থেকে অদৃশ্য হয়েছে গ্যাস, কিন্তু তার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হয়নি আরোহীরা। কেউ কেউ সীট থেকে পাশের প্যাসেজে পড়ে গেছে, তবে এই পতনের ফলে আহত হয়নি কেউ। অনেকেই সীটের পিছনে হেলান দিয়ে আছে, যেন গভীর ঘুমে অচেতন কয়েকজন ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে, সামনের সীটের পিঠে ঠেকে আছে মাথা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি কারও।

প্রতিটি আরোহীর পাশে থামছে ওরা দু'জন, উদ্দেশ্য যদিও খেদমত করা নয়। দু'জনের একজন চার্লি, অপরজনের নাম নটহ্যাম। নটহ্যাম বিশ বছরের তরুণ, তার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতে লেখা আছে সে একজন কলেজ ছাত্র অথচ আসলে এক ইঞ্চিও তা নয়। কোচের প্রতিটি আরোহীকে সার্চ করেছে ওরা। বাধা দেয়ার নেই কেউ, কাজটা খুব নির্ঝঞ্ঝাটে ও নিখুঁতভাবে সারতে পারছে। মেয়ে রিপোর্টারদের দেহ তল্লাশী বাদ দেয়া হলো, কিন্তু তাদের হাত-ব্যাগগুলো যত্নের সাথে খুঁটিয়ে দেখা হলো। এই তল্লাশী চালাবার সময় চার্লি আর নটহ্যামের হাতে কয়েক হাজার ডলার পড়বে, কবীর চৌধুরী সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল। তাই নিষেধ করে দিয়েছে, একটা কানাকড়িও যেন ওদের পকেটে না ঢোকে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে একটা পয়সা নিতেও রাজি নয় কবীর চৌধুরী, কিন্তু টাকার কুমীরদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় বাগিয়ে নিতে তার কোন আপত্তি নেই।

টাকা নয়, অস্ত্র খুঁজছে ওরা। কবীর চৌধুরী ধারণা করেছিল, রিপোর্টারদের কোচে পরিচয় ভাঁড়িয়ে এফ. বি. আই. থাকবে। তার ধারণা মিথ্যে নয়, এফ. বি. আই-এর স্পেশাল কয়েকজন এজেন্ট লীড কোচে রয়েছে, যদিও প্রেসিডেন্টকে সরাসরি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আসেনি তারা। তাদের দায়িত্ব ছিল, রিপোর্টারদের ওপর নজর রাখা।

আরব তেলের মালিকরা যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন, এই খবর রটে যাবার সাথে সাথে সারা বিশ্বের স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, ফলে বিদেশী রিপোর্টাররা পিল পিল করে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ে, তাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনকে প্রেসিডেন্ট এবং তেল মালিকদের কাছে ঘেঁষার ছাড়পত্র দেয়া হয়। এই মোটর শোভাযাত্রায় সঙ্গী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে দশ জন বিদেশী রিপোর্টারকে—চারজন ইউরোপের, তিনজন গালফ স্টেটের, একজন ভারতের (কাজ করে লন্ডনের দ্য নিউজে), একজন ভেনেজুয়েলার, আরেকজন নাইজেরিয়ার।

সার্চ করে তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র পেল ওরা। আগ্নেয়াস্ত্রের তিনজন মালিকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো, তবে যেখানে ছিল সেখানেই রাখা হলো তাদেরকে। কোচ থেকে নেমে এল চার্লি আর নটহ্যাম। কাছেই ছয়জন হাতকড়া পরানো পুলিসকে পাহারা দিচ্ছে ওদের একজন সঙ্গী। আরেকজন সঙ্গী বাজুকা-সদৃশ মিসাইল ফায়ারার-এর পিছনে বসে উত্তর টাওয়ারটা পাহারা দিচ্ছে। এখানে, দক্ষিণ প্রান্তে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কবীর চৌধুরীর কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি।

চার

রিয়্যার কোচের ধাপ বেয়ে নিচে নামল কবীর চৌধুরী। তাকে দেখে খুশি বা অখুশি কিছুই মনে হলো না। তার মনের ভাব অনেকটা এইরকম—যেটা যেভাবে ঘটবে বলে আশা করেছিল, সেটা ঠিক সেভাবে ঘটেছে, এর মধ্যে খুশি বা অখুশি হবার কিছুই নেই। কোথাও যদি অন্য রকম কিছু ঘটত, অখুশি নয়, বিস্মিত হত সে।

তার সাগরেদরা প্রায়ই তার আড়ালে বলাবলি করে, নিজের ওপর মিস্টার কবীর চৌধুরীর অগাধ বিশ্বাস। এই রকম আকাশচুম্বি আত্মবিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা। সংখ্যায় ওরা আঠারো জন প্রত্যেকেই কোন না কোন কারণে একাধিকবার জেলের ঘানি টেনেছে। কিন্তু সেটা কবীর চৌধুরীর দলে নাম লেখাবার আগেকার ঘটনা। আজ ছয়-সাত মাস হলো কবীর চৌধুরীর সাথে আছে ওরা, সেই থেকে আঠারো জনের একজনও এমন কিছু করেনি যাতে পুলিস ওদেরকে খুঁজতে আসবে। দলে নাম লেখাবার পর থেকে ওদের আচরণ আর চলাফেরা কবীর চৌধুরী নিজেই নিয়ন্ত্রণ করছে, ওদের এই হঠাৎ ভাল মানুষ হয়ে ওঠার পিছনে সেটাই আসল কারণ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে কবীর চৌধুরী রাতারাতি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু আইন সে ভাঙছে না, এ-কথা ঠিক। কিন্তু তার অন্য কারণ রয়েছে।

রাশিয়ানদের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেনা রয়েছে কবীর চৌধুরীর। কিছুদিন থেকে দেনাটা শোধ করার জন্যে জোর তাগাদা দিচ্ছে মস্কো। অনেক ভেবে-চিন্তে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট নক্স লুট করার একটা প্ল্যান তৈরি করে কবীর

চৌধুরী। কিন্তু তার সেই প্ল্যানের কথা কিভাবে যেন রাশিয়ানরা জেনে ফেলে। মস্কোয় ডেকে পাঠিয়ে কবীর চৌধুরীকে বলা হয় দুটো কারণে ফোর্ট নক্স লুট করতে পারবেন না আপনি। এক, আপনার সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে, যুক্তরাষ্ট্র তা জানে। আপনি ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ করলে আমাদেরকেও দায়ী করা হবে। দুই, অগুণতি লোককে খুন না করে ফোর্ট নক্স লুট করা সম্ভব নয়। আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, তাই এই কাজে আমরা সমর্থন জানাতে বা অনুমতি দিতে পারি না। আমাদের টাকা আপনাকে শোধ করতে হবে, কিন্তু মানুষ খুন করে নয়।

শুধু যে টাকা ধার করেছে তাই নয়, রাশিয়ার সাথে আরও অনেক বাঁধনে জড়িয়ে গেছে কবীর চৌধুরী। ইচ্ছে করলেই সে-সব বাঁধন ছিঁড়ে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসতে পারে না সে। কাজেই একটা শর্ত মেনে নিতে হয়েছে তাকে। মস্কোকে কথা দিয়ে এসেছে, একান্ত বাধ্য না হলে মানুষ খুন করবে না।

ফোর্ট নক্স লুট করার প্ল্যানটা বাতিল করলেও, আরেকটা প্ল্যান তৈরি করতে বেশি সময় লাগেনি তার। এই প্ল্যানের কথা কেউ যাতে টের না পায়, সেজন্যে বিশেষ ভাবে সতর্ক ছিল সে। তার সঙ্গী-সাথীদের পুলিস যদি খোঁজে, মস্কোর চররাও সে-খবর জানতে পারবে, গন্ধ শুঁকে কবীর চৌধুরীর সন্ধান বের করে ফেলবে তারা। সেজন্যেই শিষ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে তাকে। শর্ত মেনে নিয়ে মস্কো থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে প্রকাশ্য কোথাও চেহারা দেখায়নি সে।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে এগোল কবীর চৌধুরী। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পেরট, তাকে বলল, 'লীড কোচটাকে একটু সামনে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার ড্রাইভারকে পিছু নিতে বলো।'

লীড কোচে উঠে ভালুক আকৃতির চার্লির সাহায্যে অচেতন ড্রাইভারকে তার সীট থেকে সরিয়ে হুইলের পিছনে বসল কবীর চৌধুরী। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল, গিয়ার এনগেজ করল, কোচটাকে সিধে করে নিয়ে পঞ্চাশ গজের মত এগোল সামনের দিকে। তারপর হ্যান্ড-ব্রেকের সাহায্যে থামাল সেটাকে। লীড কোচের পিছু পিছু এল প্রেসিডেনশিয়াল কোচ, মাঝখানে মাত্র কয়েক ফিট ব্যবধান রেখে সেটাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

লীড কোচ থেকে নেমে দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে ফিরে চলল কবীর চৌধুরী। ব্রিজের ঠিক মাঝখানে এসে থামল সে। ব্রিজের এখানটাতেই বিশাল সাসপেনশন কেবলগুলো সবচেয়ে বেশি নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। পিছন দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, তারপর আবার সামনের দিকে। ব্রিজের মাঝখানের পঞ্চাশ গজ সম্পূর্ণ ফাঁকা, কেবলগুলো নিচের দিকে নেমে আসায় হেলিকপ্টারের রোটরের সাথে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম। ফাঁকা জায়গাটা থেকে সরে এসে ওপর দিকে মুখ তুলল কবীর চৌধুরী, ব্রিজের ওপর একটানা ঘ্যানর ঘ্যানর করছে 'কপ্টার দুটো, হাত নেড়ে তাদেরকে নির্দেশ দিল সে। খুব সহজেই মেশিন দুটো নিয়ে নেমে এল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম গোল্ডেন গেট ব্রিজকে হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হলো।

ভাব-গম্ভীর চেহারা নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠল কবীর চৌধুরী। সাথে সাথে আরোহীরা সবাই উপলব্ধি করলেন, এই লোকই কিডন্যাপারদের নেতা। এই লোকের জন্যেই তাঁদের আজ এই ভোগান্তি। বাদশা এবং প্রিন্স, তাঁরা দু'জনেই কবীর চৌধুরীর দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকালেন। স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার, আগের চেয়েও নার্ভাস দেখাল তাঁকে, হাত আর চোখ দুটো স্থির রাখতে পারছেন না। আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার, সচরাচর তাঁকে দেখে যা মনে হয় এখনও তাই মনে হলো—ঢুলছেন। চোখ দুটো আধ-বোজা, যে-কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মেয়র মাইক সিলভার প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা বলতে হয়, সামরিক বাহিনীতে এবং সিভিল সার্ভিসে কাজ করার সময় এত বেশি মেডেল পেয়েছেন তিনি, সবগুলো তাঁর ওই প্রশস্ত বুকেও ঠাসাঠাসি হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছেন তিনি।

রাগে লাল হয়ে উঠেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টও। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো শান্ত, ঠাণ্ডা। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, তিনি সহজে অস্থির হয়ে ওঠেন না।

অনেকটা রাজনৈতিক নেতাদের ভঙ্গিতে দু'কোমরে হাত রাখল কবীর চৌধুরী। প্রথমে প্রেসিডেন্ট, তারপর এক এক করে আর সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। বাদশা আর প্রিন্সের দিকে যখন তাকাল, মনে হলো তার চেহারা একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, তবে সেটা ভুলও হতে পারে। সবশেষে প্রেসিডেন্টের ওপর ফিরে এল তার দৃষ্টি। শুরু করল সে, 'আসসালামো আলাইকুম, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি বাংলাদেশের কবীর চৌধুরী। আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি...'

'থামুন!' তীক্ষ্ণ, কড়া নির্দেশের সুরে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'দয়া করে ভদ্রতার মুখোশটা খুলে ফেলুন, আমি আপনার আসল পরিচয় জানতে চাই, স্যার!'

'আমার আসল এবং অকৃত্রিম পরিচয়, বললামই তো, কবীর চৌধুরী,' তার চেহারায় ক্ষীণ একটু কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল। 'ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলতে বলছেন, বেশ তো, তাহলে আসুন, আমরা সবাই যার যার ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলি। ভদ্রতার মুখোশ বলতে আমরা এখানে সবাই যা পরিধান করে আছি, সেগুলোকেও বোঝায়। আমি সব খুলে দিগম্বর সাজব, আর আপনারা সব পরে থেকে লজ্জা নিবারণ করবেন, সেটা উভয় পক্ষের জন্যে মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আমার বিশ্বাস মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি ঠিক এই কথাটি বলতে চাননি। সম্ভবত মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। তাতে কিছু এসে যায় না, ভুল মানুষেরই হয়, আমরা কেউই তো আর ফেরেস্তা নই। তবে, ভব্যতা হারিয়ে ফেলা আমাদের কারুরই উচিত হবে না।'

উপস্থিত সবাই দেখতে পেল, বিতর্কের শুরুতেই প্রেসিডেন্টকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।

কিন্তু পরমুহূর্তে প্রেসিডেন্টের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সবাইকে সচকিত করে তুলল। তিনি বললেন, 'ভব্যতা?' তাঁর চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল। 'শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে? তুমি (!)—একটা খুনে, একটা গুণ্ডা, একটা জালিয়াত, একটা বদমাশ, সাধারণ একটা ক্রিমিন্যাল—তোমার কাছ থেকে আমাকে ভব্যতা শিখতে হবে! এত বড় স্পর্ধা তোমার, ভব্যতা শেখাতে আসো!'

'খুনে? না। গুণ্ডা? না। জালিয়াত? তা বলতে পারেন। বদমাশ? না। সাধারণ একটা ক্রিমিন্যাল? উঁহুঁ, হলো না। আমার মত অসাধারণ ক্রিমিন্যাল গোটা পৃথিবীতে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমার দয়া আর বিবেককে ঘুম থেকে জাগাতে আপনার এই অভদ্র আচরণ কোন সাহায্যে এল না। অবশ্য, আপনি যদি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতেন, যদি সসম্মানে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিতেন, তাহলেও ওগুলোর ঘুম ভাঙতো না। অতীতে আপনার দেশ আমার সাথে যে আচরণ করেছে, আক্ষরিক অর্থেই পাষাণ হয়ে গেছি আমি।'

'আমরা কেউ আপনাকে হাত অফার করতে যাচ্ছি না, মি. চৌধুরী,' জেনারেল পীল এতই শুকনো গলায় কথা বললেন, রীতিমত কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিলে কৃতার্থ বোধ করি। আমরা কি আপনার জিম্মি? এই দেশ আপনাকে অসম্মান করেছে, এ কি তারই প্রতিশোধ?'

'প্রতিশোধ তো বটেই।'

'আমরা কি তাহলে নিজেদের প্রাণের আশা ছেড়ে দেব?' যোদ্ধা জেনারেল এই পরিস্থিতিতেও বিদ্রূপ করার সাহস পেলেন।

'রক্তে আমার আসক্তি নেই,' কবীর চৌধুরী বলল, 'আমার চাই প্রচুর টাকা।' প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল সে। 'মেহমানদের সামনে আমার দ্বারা আপনার যদি কোন অসম্মান বা ক্ষতি হয়ে থাকে, সেজন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট।'

নিজের সামনে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। সঙ্গী-সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জোকার! আমরা একটা জোকারের পাল্লায় পড়েছি!' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আজকে আপনি আমার কি ক্ষতি করেছেন কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. জোকার!'

'যে কোন নামে ভূষিত করুন আমাকে, আমি প্রতিবাদ করব না,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী। 'গর্তে পড়লে সব ব্যাঙই অমন লাফায়। তবে, ভুলটা শুধরে না দিয়ে পারছি না। জোকার হাসায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কাঁদানো।' বাদশা ও প্রিন্সের দিকে তাকাল সে। 'আপনাদেরকে আমি সম্মান করব না, অসম্মানও করব না। আপনাদের অনেক টাকা আছে। আমি জানি, সে-বোঝা বইতে আপনাদের কষ্ট হয়। সেই কষ্ট থেকে যতটা পারি আপনাদেরকে রেহাই দেবার চেষ্টা করব। আপনাদের সাথে এইটুকুই আমার সম্পর্ক। তবে আপনাদের নীতি আর আচরণ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কথাগুলো মিষ্টি হবে, সে-নিশ্চয়তা আমি দিতে পারছি না। ইচ্ছে করলে আপনারা দু'জনেই কানে আঙুল দিতে পারেন।'

বাদশা আর প্রিন্সের দু'জোড়া চোখ ধিকি ধিকি আগুনের মত জ্বলে উঠল। কেউ তাঁরা একচুল নড়লেন না।

'আপনারা তেলের দাম বাড়িয়েছেন, সেই সাথে সারা দুনিয়ায় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে,' শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'তেল ছাড়া দুনিয়া অচল, আর সেই তেলের একচেটিয়া মালিক আপনারা। তেলের ন্যায্য দাম বাড়ালে কারও কিছু

বলার নেই, কিন্তু ব্যবসা জিনিসটাকে আপনারা নোংরামি আর নষ্টামির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। ব্যবসা করতে গিয়ে আপনারা হয়ে উঠেছেন লোভী, অর্থপিশাচ। মুখে আপনারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে কত ভাবেই না বলেন, কিন্তু দুনিয়ার বেশির ভাগ মুসলমান যে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, সেদিকে আপনাদের কোন খেয়াল নেই। আপনাদের খেয়াল আছে শুধু ভোগ-বিলাসের দিকে। কিন্তু আর কতদিন? তেলের মউজুদ কি শেষ হয়ে আসছে না? তারও আগে, নতুন ধরনের জ্বালানি এসে যাবে বাজারে, আমার গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে, তখন কি অবস্থা হবে আপনাদের? আপনারা পাহাড়ের গুহায় বুনো পশুদের মত বসবাস করতেন, কিছুদিন আগেও ছেঁড়া তাঁবু ছিল আপনাদের ঘর-বাড়ি, আজ সেসব কথা ভুলে গেছেন। কিন্তু আবার সেদিন ফিরে আসছে...'

তাকে বাধা দিলেন জেনারেল পীল, 'আপনার উদ্দেশ্য যাই হোক, সেটা পূরণ করার জন্যে খুব একটা তাড়া আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'ঠিক ধরছেন। আমার কোন তাড়া নেই। বরং সময় যত বেশি কাটবে, ততই লাভবান হব আমি। আমার এই কথার অর্থ আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন।' কোচের পিছন দিকে হেঁটে এল সে। প্রকাণ্ড কমিউনিকেশন কমপ্লেক্সের পিছনে এক যুবক সৈনিক বসে রয়েছে। তার সোনালি চুলের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'নাম?'

এতক্ষণ ধরে যা ঘটল, সবই দেখেছে সৈনিকটি। চেহারা কঠিন করে তুলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'ডানকান।'

তার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'এই নম্বরের সাথে যোগাযোগ করো। এটা একটা লোকাল নম্বর।'

গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল ডানকান।

'প্লীজ,' শান্ত সুরে বলল কবীর চৌধুরী।

এরপর আর চুপ করে থাকার সাহস হলো না ডানকানের। বলল, 'আপনি নিজে যোগাযোগ করুন।'

'আমি কিন্তু অনুরোধ করেছি!' কবীর চৌধুরীর চেহারা দেখে মনে হলো, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

'গো টু হেল!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘাড় ফেরাল কবীর চৌধুরী। 'পেরট?'

'ইয়েস, চীফ?'

'বেডলারকে ডেকে পাঠাও।' ডানকানের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'টেলিকমিউনিকেশন সম্পর্কে তুমি যা শিখেছ, বেডলার তার চেয়ে বেশি ভুলে গেছে। তোমার মত একটা পুঁচকে ছোঁড়া যখন বেয়াদবি করে, আমি উত্তেজিত হই না। তবে বিরক্ত বোধ করি।' আবার পেরটের দিকে ফিরল সে। 'বেডলার এখানে এলে ডানকানকে কোচ থেকে নামাবে তুমি। ওকে নিয়ে কি করতে হবে, জানো তো?'

'ইয়েস, চীফ,' দ্রুত বলল পেরট। তার মায়াভরা চোখে নিষ্ঠুরতা বা ঘৃণার ছায়া পর্যন্ত নেই। 'ওকে ব্রিজের কিনারায় নিয়ে গিয়ে গোল্ডেন গেটে ফেলে দেব।'

'হ্যাঁ।'

'স্টপ!' প্রেসিডেন্ট ঘাবড়ে গেছেন, সেটা তাঁর চেহারায় প্রকাশও পেল। 'তোমার এত বড় স্পর্ধা...'

'স্পর্ধা?' এবার কবীর চৌধুরীর চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল। 'স্পর্ধার আপনি দেখেছেন কি! কথা না শুনলে আপনাকেও ব্রিজ থেকে ফেলে দেয়া হবে। জানি, তিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি যে সিরিয়াস, সেটা এক সময় না এক সময় বুঝতেই হবে আপনাদেরকে।'

আন্ডার সেক্রেটারি অভ স্টেট জেমস ফেয়ার নড়েচড়ে উঠলেন। এই প্রথম মুখ খুললেন তিনি, তাঁকে ক্লান্ত বলে মনে হলো। 'এই লোক যা বলছে, সব অন্তর থেকে বলছে—অন্তত আমার কানে সেভাবেই বাজল কথাগুলো। হতে পারে, লোকটা ঘুঘু, এক নম্বরের মিথ্যেবাদী, কিন্তু মিথ্যে বলার আর্টটা ভালভাবেই রপ্ত করেছে। মোট কথা, কোন ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

আন্ডার সেক্রেটারির দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, ইচ্ছে-চুপিসারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে ভদ্রলোক আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। শান্ত গলায় জেনারেল পীল বললেন, 'ডানকান, তোমাকে যা করতে বলা হচ্ছে, করো।'

'ইয়েস, স্যার।' সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাকে পালন করতে না হওয়ায় মনে মনে দারুণ স্বস্তি বোধ করল ডানকান। কবীর চৌধুরী আবার হাত বাড়াতে তার হাত থেকে কাগজটা নিল সে।

'প্রেসিডেন্টের উল্টো দিকের ওই চেয়ারের পাশে যে ফোন রয়েছে, কলটা ওটায় বদলি করতে পারবে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। ডানকান মাথা ঝাঁকাল। 'আর প্রেসিডেন্টের ফোনে?' আবার মাথা ঝাঁকাল ডানকান। ওখান থেকে সরে এসে খালি আর্মচেয়ারে বসল কবীর চৌধুরী।

প্রথমবারই যোগাযোগ করতে পারল ডানকান। বোঝা গেল, কল পাবার জন্যে অপর প্রান্তে অপেক্ষা করছিল কেউ। সতর্ক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ডিকসন।'

প্রেসিডেন্টের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে কবীর চৌধুরী। 'এদিকে আমি চৌধুরী।'

'হ্যাঁ। চৌধুরী। কবীর চৌধুরী। প্রথমেই আমার ধরতে পারা উচিত ছিল।' কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর আবার বলল পুলিস চীফ, 'আপনার সাথে দেখা করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের, মি. চৌধুরী। একা কোন মানুষ যদি বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে উৎকট পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে থাকে তো সে আপনি। আপনার মেধা এবং বুদ্ধিকে কখনোই খাটো করে দেখিনি আমি...'

'থাক, আর প্রশংসা করতে হবে না,' পুলিস চীফকে থামিয়ে দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরে কথা বলা যাবে, যদি সময় হয়। এখন কাজের কথা। আমার ধারণা, প্রেসিডেন্ট স্বাধীন একজন লোকের সাথে আলাপ করতে পারলে বর্তে যাবেন।' বলে টেলিফোনের রিসিভার আর সীট মেয়র মাইক সিলভারকে ছেড়ে দিল সে। প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পুলিস চীফের সাথে কথা বলবেন কম, এবং বাজে কথা বলবেন না।'

মেয়র সিলভার পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন পুলিস চীফকে। সবশেষে বলল, 'মি. প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলো।'

টেবিলের ওপর থেকে রিসিভার তুললেন প্রেসিডেন্ট।

'এই পরিস্থিতিতে আপনি আমাকে কি করার পরামর্শ দেন, স্যার?' জানতে চাইল পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন।

'বুদ্ধি খাটাও। আমার উপদেষ্টাদের সাথে কথা বলো।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট।

নিজের রিসিভার আবার কানে তুললেন মেয়র সিলভার। ডিকসন জিজ্ঞেস করলেন, 'চৌধুরী কি জেনারেলের সাথে আমাকে কথা বলতে দেবেন?'

'বসো, জিজ্ঞেস করে দেখি।' জিজ্ঞেস করতে সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কবীর চৌধুরী।

কোচের আরোহীরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। সবাই বুঝলেন, নিজের ওপর ভয়ঙ্কর আস্থা রয়েছে চৌধুরীর। তা তো থাকবেই। তার হাতে প্যাকেটের সবগুলো টেক্কা নয়, রয়েছে প্যাকেট ভর্তি টেক্কা।

পুলিস চীফ ডিকসন জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনারেল পীল, স্যার? ডিকসন। স্যার, সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যেই এটা একটা জাতীয় সমস্যার চেহারা পেয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব যতটুকু পুলিসের, ততটুকুই মিলিটারির। বরং একটু বেশি, ইফ আই অ্যাম এনি জাজ। উপকূলের সিনিয়র মিলিটারি অফিসারদের সাহায্য চাইব তো, স্যার?'

'আরও বড়দের ডাকো।'

'পেন্টাগন?'

'এই মুহূর্তে।'

'লোকাল অ্যাকশন, স্যার?'

'বাদ দাও। পরিস্থিতিটাকে আকৃতি পেতে দাও। আগে জেনে নিই, ঠিক কি চায় এই উন্মাদ।' জেনারেল পীলের কথা শুনে ক্ষীণ একটু হাসল কবীর চৌধুরী। 'বলছে, তার নাকি তাড়া নেই কাজেই আমাদের ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? উনি বোধহয় তোমার সাথে আবার কথা বলতে চান।'

জেনারেল পীলের কাছ থেকে রিসিভার নিয়ে আবার আর্মচেয়ারে বসল কবীর চৌধুরী। 'দু'একটা প্রশ্ন আর অনুরোধ, ডিকসন। আমার ধারণা, আমার যা পজিশন, প্রশ্নের উত্তর আর যা খুশি চাওয়ার অধিকার আমার আছে, তুমি কি বলো?'

'আমি শুনছি।'

'খবর কি ইতিমধ্যে রটে গেছে?'

'রটার আছেটা কি?' কাতর কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল পুলিস চীফ। 'সান ফ্রান্সিসকোর অর্ধেক লোক দেখতে পাচ্ছে, প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা অপয়া ব্রিজের ওপর আটকা পড়ে আছে।'

'মুখ সামলে কথা বলো!' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'আমার প্রিয় ব্রিজ সম্পর্কে আর একটাও যদি বাজে মন্তব্য করো, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে। তারপর আবার জানতে চাইল, 'খবরটা কি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে?'

'না পড়লেও পড়তে দেরি হবে না।'

'আমার হুকুম, খবরটা সবখানে ছড়িয়ে দাও, এখুনি। আমি চাই, কমিউনিকেশন মিডিয়াগুলো উৎসাহী হয়ে উঠুক। একটা হেলিকপ্টার যোগাড় করো তুমি···না একটা নয়, দুটো। ও-দুটোকে আমি ব্রিজে আসার অনুমতি দেব···না, আমি হুকুম করছি—ব্রিজে ও-দুটোকে পাঠাতেই হবে। কম করেও শ'খানেক নিউজ ক্যামেরাম্যান থাকা চাই ওগুলোয়, যারা এই ঐতিহাসিক ঘটনা রেকর্ড করতে আগ্রহী। উপকূল এলাকায় এ-ধরনের মেশিন প্রচুর পাবে তুমি—মিলিটারি বা সিভিলিয়ান।'

সাথে সাথে নয়, একটু থেমে ডিকসন জানতে চাইলেন, 'শ'খানেক ক্যামেরাম্যান? কেন, কি দরকার?'

'দরকার পাবলিসিটির জন্যে। আমি চাই আমেরিকার প্রতিটি লোকই শুধু নয়, দুনিয়ার প্রতিটি লোক, যাদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ আছে, নিজেদের চোখে দেখুক তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানরা কি দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে—এই রকম একটা চোখ-জুড়ানো দৃশ্য থেকে কাউকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না। ওরা যে ফাঁদে পড়েছে, মানো?'

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ডিকসন। 'আমি যতদূর বুঝতে পারছি, এই পাবলিসিটির সাহায্যে পাবলিক সেন্টিমেন্ট নিজের দিকে আনার চেষ্টা করবেন আপনি, তাই না, মি. চৌধুরী? তাতে করে আপনি যা চাইবেন বলে ভেবেছেন সেটা পেতে সুবিধে হবে।'

'আমি তাহলে ভুল খবর পাইনি,' বলল কবীর চৌধুরী, 'তুমি সত্যি বুদ্ধিমান।'

ভারী গলায় পুলিস চীফ জানতে চাইলেন, 'কোচ ভরা রিপোর্টার পাঠালে আপনি আপত্তি করবেন?'

'তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু রিপোর্টারের ছদ্মবেশে কোচ ভরা সশস্ত্র এফ. বি. আই. এলে রেগে যাব। না, কোচ ভরা রিপোর্টার আমাদের আছে, আর দরকার নেই।'

'দুটো হেলিকপ্টারে যদি ট্রুপার বা প্যারাট্রুপার পাঠাই, কে আমাকে বাধা দেয়?'

'তোমার কমনসেন্স। আমাদের হাতে জিম্মিরা রয়েছে, নাকি এরই মধ্যে তা ভুলে গেছ? প্রেসিডেন্টের কাছে একজন প্যারাট্রুপার পৌঁছুবার অনেক আগেই একটা বুলেট পৌঁছুতে পারবে। কি, একমত?' প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, তাকে নিয়ে দর কষাকষি তিনি মোটেও ভাল চোখে দেখছেন না।

'আপনার সে-সাহস হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না,' পুলিস চীফ বলল, 'প্রেসিডেন্টকে গুলি করলে নিজের চালেই মাত হয়ে যাবেন আপনি। আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে আপনার হাতে তখন আর কিছু থাকবে না।'

'কে বলেছে থাকবে না? একজন বাদশা, একজন প্রিন্স—এদেরকে তুমি দেখছি

মানুষ বলেই গণ্য করছ না! বলছ, আমার নাকি গুলি করার সাহসই হবে না। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখো। পাঠাও প্যারাট্রুপার।' একসেকেন্ড থেমে আবার বলল কবীর চৌধুরী, 'আসলে, অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ তুমি, ডিকসন। নাকি একজন প্রেসিডেন্ট, একজন বাদশা আর একজন প্রিন্সের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেতে চাও?'

পুলিস চীফ চুপ।

'মাথামোটা লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়। বোকার মত কেউ একটা কিছু করে বসতে পারে, এই চিন্তা আমার মাথাতেও এসেছে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধটা সেজন্যেই। এই এলাকায় সামরিক ঘাঁটি গিজ গিজ করছে। প্রেসিডিয়ো ছাড়াও রয়েছে ফোর্ট বেকার, ট্রেজার আইল্যান্ড, ফোর্টস ফান্সটন, ফোর্ট ব্যারি, ক্রংকাইট। বাই রোড এখান থেকে সবগুলোতেই সহজে পৌঁছানো যায়। যে-কোন একটা স্টেশন থেকে দুটো মোবাইল সেলফ-প্রপেল্ড র‍্যাপিড-ফায়ার অ্যান্টিএয়ার-ক্রাফট গান পাঠিয়ে দাও ব্রিজে। এক ঘণ্টার মধ্যে চাই আমি। তার আগে, আর্মিকে দিয়ে ওগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেবে।'

'আপনি…আপনি উন্মাদ!'

'হয়তো, কিন্তু সাধু প্রকৃতির উন্মাদ। আমার অনুরোধ…'

'রক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়? জেনারেল পীল?'

সীট থেকে উঠে মারমুখো যোদ্ধার চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল। ফোনের রিসিভার নিয়ে বললেন, 'এই উন্মাদ ভদ্রলোক যা বলেন শোনো। বুঝতে পারছ না উনি নিজেকে আমাদের সবার চেয়ে বড় করে দেখছেন?'

'আমাকে ভুল বুঝলেন, জেনারেল।' মুচকি হেসে রিসিভারটা নিল সে। 'কানে পানি গেছে, ডিকসন?'

'আর কি বলার আছে বলুন,' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো পুলিস চীফের গলায় কেউ ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে।

'আমার তৃতীয় অনুরোধ। আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের দুটো স্কোয়াডকে ডেকে পাঠাও। আমি চাই ব্রিজের দুই মুখে দুটো স্টীল ব্যারিয়ার তৈরি হোক। যথেষ্ট শক্ত হতে হবে, যাতে একটা ট্যাংককে ঠেকিয়ে দিতে পারে। যথেষ্ট উঁচুও হতে হবে, যাতে কেউ টপকাবার চেষ্টা না করতে পারে—আর, হ্যাঁ, মাথার দিকে থাকতে হবে কাঁটাতারের বেড়া। উত্তর ব্যারিয়ারে কোন ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। দক্ষিণ ব্যারিয়ারের মাঝখানে একটা গেট থাকবে, যাতে একটা জীপ আসা-যাওয়া করতে পারে। এই গেট শুধু এক দিক থেকে খোলা যাবে—আমাদের দিক থেকে। কিভাবে কি করতে হবে, আমার বা তোমার চেয়ে আর্মি ইঞ্জিনিয়াররাই ভাল বলতে পারবে। কাজটায় যদি কোন খুঁত পাই আবার নতুন করে তৈরি করব আমি, মনে থাকে যেন কাজটা আমি নিজে তদারক করব।'

মনে হলো পুলিস চীফ শ্বাস কষ্টে ভুগছেন। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'প্যাসিফিক থেকে কুয়াশা আসছে। এই কুয়াশা নাকি প্রায়ই গোটা ব্রিজটাকে

ঢেকে ফেলে। এবারও যদি ফেলে, গা ঢাকা দিয়ে ব্রিজে চলে আসার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তোমরা।'

'দক্ষিণ ব্যারিয়ারে গেট দরকার কেন?'

'আলোচনা করতে হলে প্রতিপক্ষ দরকার, তারা আসবে কিভাবে? ধরো, বাদশার গায়েই একটা গুলি লাগল, তখন ডাক্তার লাগবে না? তাছাড়া, গাড়ি করে শহরের সবচেয়ে ভাল খাবার-দাবারও ব্রিজে পাঠাবে তুমি...'

'জেসাস! কি আশ্চর্য নার্ভ আপনার!'

'এর মধ্যে নার্ভের কি দেখলে?' আহত হলো কবীর চৌধুরী। 'আমার সঙ্গী-সাথীরা যাতে পেটে খিদে নিয়ে কষ্ট না পায় সেটা তো আমাকেই দেখতে হবে। ব্যাপারটাকে মানবিক কোণ থেকে বিবেচনা করো, ডিকসন। বাদশা আর প্রেসিডেন্টরা খিদের জ্বালা অনুভব করতে অভ্যস্ত নয়। খেতে না পেয়ে ওরা যদি মারা যায়, ইতিহাস তোমার বিরুদ্ধে কি রায় দেবে সেটা একবার ভেবে দেখেছ?'

পুলিস চীফ চুপ করে থাকলেন।

বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার, তাদের অসুবিধে-সুবিধে যেমন দেখতে হবে, তেমনি খেয়াল রাখতে হবে তাদের মান-সম্মান-ইজ্জতের দিকে। ব্যারিয়ার তৈরি হবার আগেই এক জোড়া মোবাইল ল্যাট্রিন ভ্যান পাঠিয়ে দাও। ইকুইপমেন্টগুলো অত্যন্ত উঁচু মানের হওয়া চাই। যে-কোন একটা কিছুর ওপর বসতে অভ্যস্ত নয় ওরা। উঁচু মানের ইকুইপমেন্ট বলতে আমি কিন্তু সশস্ত্র এফ. বি. আই. দেরকে বোঝাচ্ছি না। সব লিখে নিয়েছ, ডিকসন?'

'রেকর্ড হয়ে গেছে।'

'তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজে। নাকি আবার একবার জেনারেল পীলকে ডাকতে হবে?'

'যা যা চেয়েছেন, পাবেন সব।'

'সময় মত?'

'হ্যাঁ।'

হাঁটুর ওপর রিসিভার রেখে সেটার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে এদিক ওদিক তাকাল কবীর চৌধুরী, সকৌতুকে বলল, 'আমার কপালে খারাবি আছে, শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়ে যাব—আশ্চর্য! এ-ধরনের কোন কথাই বলল না পুলিস চীফ! আবার রিসিভার তুলল সে। 'শেষ অনুরোধ, ডিকসন। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের প্রেসিডেন্ট তো এখন গুড ফর নাথিং, তাঁর কথার কোন দাম দেব না আমি—প্রশ্ন হলো, একটা নেতাহীন জাতির কার সাথে কথা বলব আমি?'

'ভাইস-প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে শিকাগোয় পৌঁছে গেছেন। এই মুহূর্তে ও'হেয়ার এয়ারপোর্টের পথে রয়েছেন তিনি।'

'চমৎকার, চমৎকার! না চাইতেই সহযোগিতা! গুড, ভেরি গুড। কিন্তু, দু'একজন সিনিয়র মন্ত্রীরও সহযোগিতা চাইব আমি, ডিকসন। জানি, চাওয়াটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু...'

'আপনার বিনয় আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, মি. চৌধুরী।' সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল পুলিস চীফ। 'যা বলবার ভণিতা না করে বলুন।

আপনি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের নাম ভেবে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দু'জনের।'

'দু'জন মন্ত্রী আর ভাইস-প্রেসিডেন্টকে যদি ব্রিজে পাঠানো হয়, আপনি তাদেরকেও জিম্মি রাখবেন, তাই না?'

'বোকা নাকি! কিডন্যাপাররা মধ্যস্থতাকারীদের জিম্মি রাখে বলে শুনেছ কখনও?' উত্তরের অপেক্ষায় দু'সেকেন্ড বিরতি নিল কবীর চৌধুরী, কিন্তু পুলিস চীফ কথা বললেন না। 'সেক্রেটারি অভ স্টেটকে দরকার হবে আমার, ডিকসন।'

'তিনি রওনা হয়েছেন।'

'এ মাইন্ড-রিডার, নো লেস! কোত্থেকে?'

'লস এঞ্জেলস।'

'ওখানে কি করতে গিয়েছিল?'

'আই. এম. এফ. মীটিং।'

'তাই? তার মানে…'

'হ্যাঁ,' তিক্ত সুরে বললেন পুলিস চীফ। 'সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীও ছিলেন সেখানে। সেক্রেটারি অভ স্টেটের সাথেই আসছেন তিনি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী। 'কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর সাথে কবীর চৌধুরীর ফিস ফিস আলাপ! ইয়া পারওয়ারদেগার, এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম!'

পাঁচ

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। চোখ মেলার সময় অনুভব করল, ভারী সীসা হয়ে আছে পাতা দুটো। মাথা ঝিম ঝিম করছে। কানেও যেন কম শুনছে একটু। তাছাড়া গ্যাসের আর কোন প্রভাব আছে বলে মনে হলো না। উঠে বসার আগে হাত দিয়ে আলতোভাবে জুলফি, ভুরু, চুল, চিবুক ইত্যাদি স্পর্শ করল ও। স্বস্তি বোধ করল, প্রদ্যুৎ মিত্রের চেহারা ঠিকই আছে।

ড্রাইভারের পায়ের কাছে বিস্ফোরণটা ঘটতে দেখেই ধরতে পেরেছিল রানা, ওটা গ্যাস বোমা। কিন্তু তারপর এত দ্রুত আক্রান্ত হলো, এক সেকেন্ড পরে কি ঘটেছে বলতে পারবে না।

চোখ থেকে ঝাপসা ভাব কেটে যেতে নড়েচড়ে বসল রানা। প্রথমেই চোখ পড়ল পাশের সীটে। ঝলমলে সোনালি চুলে ঢাকা পড়ে গেছে মেয়েটার মুখ। সীটের পিছন দিকে হেলে রয়েছে সে, চকমকে সবুজ সিল্ক দিয়ে ঢাকা বুক বেয়াড়া রকম বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। নিজের অজান্তে একটা ঢোক গিলল রানা। দু'বার চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও হেরে গেল, তিন বারের বার বাধ্য করল নিজেকে।

এদিক ওদিক তাকাল রানা। সীট থেকে অনেকেই পড়ে গেছে মাঝখানের

প্যাসেজে। কেউ কেউ এখনও সীটের ওপর রয়েছে, কিন্তু হয় সামনের দিকে ঝুঁকে, নয় কাত হয়ে রয়েছে একপাশে। পুরোপুরি জ্ঞান এখনও ফিরে পায়নি কেউই, তবে দু'একজন এক-আধটু নড়াচড়া করছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। সানফ্রান্সিসকোয় এই প্রথম আসেনি ও, কাজেই গোল্ডেন গেট ব্রিজ চিনতে অসুবিধে হলো না। হাতঘড়ি দেখল ও। গ্যাস বোমা বিস্ফোরিত হবার পর এক ঘন্টার ওপর পেরিয়ে গেছে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে।

ঘুরেফিরে আবার মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল। দশ লাখে একটা, মুনি-ঋষিদেরও ধ্যান ভাঙবে। দেখতে ছোটখাট, কাঁধে ঝোলানো ভারী সিনে ক্যামেরাটা যে কিভাবে বয়ে বেড়ায় আল্লাই মালুম। ওকে আভাসে বলেছে, বড় একটা টিভি কোম্পানীর ফ্যাশন ফটোগ্রাফার সে। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় না গিয়ে ফটোগ্রাফার হয়ে প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রায় কেন এসেছে, সেটা একটা বিরাট রহস্য। নাম বলেছে, জুলি।

জুলির কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। অমনি খপ্ করে ওর হাতটা খামচে ধরল জুলি।

'আরে, তুমি জেগে আছ!'

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল জুলি। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাল। 'ও-ওরা আ-আছে এখনও?'

'কারা?'

'যারা বোমা না কি যেন…'

'আর কি জানো তুমি?'

'আওয়াজ শুনলাম, ধোঁয়া দেখলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই।' ভয়ে ভয়ে আবার চারদিকে তাকাল জুলি। 'আসলে কি ঘটেছে?'

উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি সুস্থ বোধ করছ তো?'

'এক ফোঁটা মদ ছুঁইনি অথচ মাতাল লাগছে। প্রদ্যুৎ?'

'বলো।'

'আসলে কি ঘটেছে?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। গোল্ডেন গেট ব্রিজে আমরা আটকে আছি কেন?'

'সে কি!'

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও।'

তাকাল জুলি। তারপর হঠাৎ সীটের ওপর ঘুরে বসে রানার কাঁধ খামচে ধরল। 'আমার ভয় করছে!' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্যাসেজে পড়ে থাকা দু'জন লোকের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের…ওদের হাতে হাতকড়া কেন, প্রদ্যুৎ? এসবের মানে কি?'

'হুঁ,' গম্ভীর হলো রানা। 'তাই তো!'

'কেন?' আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জুলি।

'জানি না। এইমাত্র জাগলাম আমি। তবে জানব।'

'ওদের হাতে হাতকড়া রয়েছে, তাহলে আমাদের হাতে নেই কেন?'

'আমাদেরকে হয়তো গোণার মধ্যে ধরেনি, তাই। সেটাই ওদের কাল হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দেখল, ঠিক পিছনেই রয়েছে প্রেসিডেনশিয়াল কোচ। জুলির হাত দুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও। 'একজন সাংবাদিককে তার দায়িত্ব পালন করতে দাও। আমি যাচ্ছি।'

সীট ছেড়ে উঠতে যাবে রানা, ওর কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জুলি। 'আমিও যাব তোমার সাথে।'

'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত, জুলি।'

সরল, নিরীহ চোখ তুলে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুলি।

'একটু পরপরই যদি এভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরতে থাকো, তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না। নাকি জানো না, ভারতীয়রাও রক্ত-মাংসের মানুষ?'

চেহারা একটু লালচে হলো জুলির। 'দুঃখিত, প্রদ্যুৎ। কি জানো, ভয় পেলে আমার হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।'

'আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'চলো। লেডিস ফার্স্ট।'

সীট থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল জুলি। তার পিছু নিল রানা, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে কাছের ঘুমন্ত লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার কোটের খানিকটা সরিয়ে ভেতরে তাকাল ও। একটা হোলস্টার রয়েছে, কিন্তু খালি। সিধে হয়ে এগোল আবার। সামনের দরজার কাছে পৌছে লক্ষ করল, সীট থেকে পড়ে গেছে ড্রাইভার, এখনও ঘুমাচ্ছে। ঠিক সীটের পাশে নয়, বেশ খানিক দূরে সরে রয়েছে লোকটা। বোঝাই যায়, কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

কোচ থেকে নেমে এসে ব্রিজের ওপর জুলির পাশে দাঁড়াল রানা। ভালুক আকৃতির, নিগ্রো চার্লিকে দেখল ওরা, ওদের দিকে মেশিন-পিস্তল তাক করে আছে। একজন পুলিস কোন কারণ ছাড়াই বন্দুক তাক করবে, এটা যথেষ্ট বিস্ময়কর একটা ব্যাপার। কিন্তু তারচেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন পুলিসের হাতে মেশিনগান থাকা। অবাক হওয়ার মত আরও দৃশ্য চোখের সামনেই রয়েছে। ছয়জন পুলিসকে দেখল ওরা। তিন জোড়া হাতকড়া দিয়ে ছয়জনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রানার কব্জি খামচে ধরল জুলি। ব্যথা পেয়ে উহ্ করে উঠল রানা।

'ভয় পেয়ো না,' বলল রানা। 'এসবের নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আছে।'

'আছে বৈকি!' বলল কবীর চৌধুরী। তার মুখে সরল হাসি, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের সামনে থেকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'আপনার নাম?'

কবীর চৌধুরীকে দেখে চমকে উঠল রানা। কয়েক সেকেন্ড নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেল ও। তারপর তাড়াতাড়ি বলল, 'প্রদ্যুৎ মিত্র।'

ঘন ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে কবীর চৌধুরী জানতে চাইল, 'দেশ?'

'ভারত।'

'আচ্ছা!' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে কি বোঝাতে চাইল কবীর চৌধুরী, সে-ই জানে। 'ইন্দিরা গান্ধী গরু জবাই বন্ধ করতে বলেছে, কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি।'
'আপনি নিশ্চয়ই এর কারণ বা ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করতে পারবেন না?'
'দুঃখিত,' বলল রানা। 'দেশীয় রাজনীতি আমার বিষয় নয়।'
'নামটা আরেকবার, প্লীজ?'
'প্রদ্যুৎ মিত্র।'
'কেমন যেন খটমটে লাগে। ছোট করে নিলে আপত্তি নেই তো? প্রদ্যুৎ-এর শেষ অংশটুকু থাক? দ্যুত? বাহ্, চমৎকার! দূত! দূত মানে এক হিসেবে চর-ও। আপনি কি একজন গুপ্তচর, মি. দূত?'
জোর করে হাসল রানা। কবীর চৌধুরী কি তার সাথে ঠাট্টা করছে? ওর পরিচয় জানে, কিন্তু ভান করছে জানে না? বলল, 'কিন্তু আপনার সম্পর্কে এখনও তো কিছু জানা হলো না।'
'একসাথে যখন হয়েছি, জানবেন বৈকি। তার আগে, এই অসুবিধের জন্য, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এই মেয়ে, এই অল্প বয়সে তুমি রিপোর্টার?'
'হেলিকপ্টার!' ফিসফিস করে বলল জুলি। কবীর চৌধুরীর কথা শুনতে পায়নি সে।
তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, তাই। সবই ব্যাখ্যা করা হবে, তবে এখুনি নয়। সাংবাদিকরা সবাই ঘুম থেকে উঠে এক জায়গায় জড় হোক, তখন।' রিয়্যার কোচের দিকে এগোল সে। হাসিটি লেগেই আছে মুখে। ঘন কুয়াশার দিকে তাকাল একবার। পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে, খুবই শ্লথ গতিতে এগিয়ে আসছে। এই কুয়াশা তার মনে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকলেও চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। নাক ভাঙা পুলিস কারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধুরা কি স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরেছে, বেডলার?'
'জ্বী, স্যার। কিন্তু তারা সবাই মনমরা, স্যার।' একহারা, তীক্ষ্ণ চেহারা বেডলারের, চোখ-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, হাতে একটা ব্রিফকেস ধরিয়ে দিলেই তাকে উঠতি আইন ব্যবসায়ী মনে না করে পারা যাবে না। সে যে শুধু টেলিকমিউনিকেশন এক্সপার্ট তাই নয়, কমবিনেশন লক খুলতেও ওস্তাদ। তাছাড়া, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে লোকজনকে ভয় দেখাতেও কম পটু নয়।
'গাড়ির ভেতরেই থাকুক ওরা। বাইরে বের করে এনে হাতকড়া পরানো ঝামেলার ব্যাপার।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'পুলিস আর এফ. বি. আই. মিলে আমাদের হাতে রয়েছে ষোলো জন। লীড কোচে চারজনের কাছে রিভলভার পাওয়া গেছে, ওদেরকে এফ. বি. আই. বলে ধরে নিচ্ছি। সামনের দিকে রয়েছে ছয়জন পুলিস, এখানে রয়েছে চারজন, আর আমাদের কোচে রয়েছে দু'জন। এদের সবাইকে এক জায়গায় জড় করবে, তারপর দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি একা পারবে না, সঙ্গে আরও দু'জনকে নিয়ো। এই ষোলোজনের একজনও যদি এখানে থাকে, নিজেদের আমরা বিপদমুক্ত বলে মনে করতে পারি না। ব্রিজের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে যে ক'টা হাতকড়া পাও খুলে নেবে।'

'খুলে নেব, স্যার?'

'নিশ্চয়ই নেবে। হাতকড়া খুব কাজের জিনিস, বেডলার। আবার ওগুলো কখন দরকার লাগে কেউ বলতে পারে না। তারপর কি করবে? ওদেরকে বলবে, পায়ে হেঁটে ব্রিজ থেকে নেমে যাও। বুঝেছ?'

'জ্বী, স্যার। আপদ বিদায় করে দেব।' পশ্চিম দিকে একটা হাত তুলল বেডলার। 'ওদিকটা দেখেছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ,' চেহারা গম্ভীর হলো কবীর চৌধুরীর। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'প্রকৃতি বরাবরই আমার ওপর বিরূপ। কিন্তু এবার সুবিধে করতে পারবে না। আসছে আসুক, দেখা যাবে কি করা যায়। আমার তো মনে হয়, ব্রিজের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবে...'

'মি. চৌধুরী!' গলাটা রোজেনের, রিয়্যার কোচের সামনের দরজা থেকে ঘন ঘন হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। 'মাউন্ট টামালপাইজ। আর্জেন্ট!'

হন হন করে এগোল কবীর চৌধুরী। রিয়্যার কোচে উঠে কনসোলের সামনে বসল। তুলে নিল মাইক্রোফোন। 'চৌধুরী।'

'রজার হীল, স্যার। রাডারে আমরা একটা ব্লিপ পাচ্ছি, স্যার। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে, একটু পুব দিক ঘেঁষে। সম্ভবত হালকা কোন প্লেন, স্যার। মাইল আটেক দূরে।'

আরেকটা বোতামে চাপ দিল কবীর চৌধুরী। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পুব। তার মানে সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। 'পুলিস চীফ ডিকসনকে চাই আমি। এই মুহূর্তে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাইনে এলেন ডিকসন। 'আবার কি!'

'তোমাকে আমি আকাশ খালি রাখতে বলিনি? আমাদের রাডারে একটা ব্লিপ ধরা পড়েছে, এয়ারপোর্টের দিকে...'

ডিকসন বাধা দিলেন, 'জ্যাক কলভিন আর ডেভিড নিউসমের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন আপনি, নাকি চাননি? সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী। লস এঞ্জেলস থেকে পনেরো মিনিট আগে পৌচেছেন ওঁরা, এখন সরাসরি হেলিকপ্টারে চড়ে আসছেন...'

'কোথায় ল্যান্ড করবে?'

'প্রেসিডিয়ো-র মিলিটারি রিজার্ভেশনে। গাড়িতে দু'মিনিটের পথ।'

'ধন্যবাদ।' বোতাম টিপে মাউন্ট টামালপাইজের সাথে যোগাযোগ করল কবীর চৌধুরী। 'ওরা বন্ধু। তবে স্ক্যানারে চোখ রাখো, পরের বার বন্ধু নাও হতে পারে।'

সীট ছেড়ে কোচ থেকে নামতে যাবে কবীর চৌধুরী, চোখ পড়ল প্যাসেজে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এফ. বি. আই.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, তার পরিচয় এবং চেহারা নিয়ে রয়েছে ব্যারি রোজেন। রোজেনের দিকে ফিরল সে, বলল, 'এখন থেকে আবার তুমি নিজেকে জন কনওয়ে ভাবতে পারো। রোজেনের হাত-পা খুলে দাও।'

'স্যার কি চান ওকে আমরা ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিই?' আগ্রহের সাথে

জানতে চাইল কনওয়ে।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল কবীর চৌধুরী। এই ইতস্তত ভাবটা তার নিজের কাছেই ভাল ঠেকল না। দ্বিধা তার প্রকৃতির মধ্যে একেবারেই নেই। বুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি যার সাহায্যেই সিদ্ধান্ত নিক, সেটা তৎক্ষণাৎ নেয়। জীবনে দু'চারটে ভুল যা হয়েছে এই ইতস্তত করার জন্যে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এই নীতিতে বিশ্বাসী সে। কিন্তু মস্কোর শর্ত ভুলে থাকতে চাইলেও তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, আরও অনেক দিক বিবেচনা করার আছে। বলল, 'না, ওকে আমরা রাখব। কিভাবে এখনও তা জানি না, তবে কোন একটা কাজে লেগেও যেতে পারে লোকটা। হাজার হোক, এফ. বি. আই.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। কথা না শুনলে পরিণতি কি হবে, জানিয়ে দাও। তবে আমি নতুন করে কিছু না বললে এখানেই রাখো ওকে।'

ব্রিজে নেমে এসে লীড কোচের দিকে এগোল সে। কাছে গিয়ে দেখল, কোচের সামনে এক লাইনে অনেকগুলো লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছে চার্লি আর তার দুই সঙ্গী। সবগুলো লোকের মুখ ঝুলে পড়েছে, চেহারায় হতভম্ব ভাব। এদের সাথে চারজন হাতকড়া পরা লোককেও দেখল সে। উঁকি দিয়ে কোচের ভেতরে তাকাল, ফাঁকা। ফিরল হুয়ানের দিকে। 'এখানে যারা হাতকড়া পরে রয়েছে আর ছয়জন পুলিস, ওদেরকে বেডলারের কাছে নিয়ে যাও। ও জানে কি করতে হবে।'

পশ্চিমে ফিরে ঘন কুয়াশার দিকে তাকাল সে। দূর থাকতে মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে আসছে। এখন অনেক কাছে চলে এসেছে, এগোবার গতিও খুব দ্রুত বলে মনে হলো। তবে, ঝোঁকটা যেন নিচের দিকে নামার। ভাগ্য সহায়তা করলে ব্রিজের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবারই সম্ভাবনা। আর তা যদি নাও যায়, প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানদের কান কেটে নেয়ার হুমকি দিয়ে বিপদ থেকে পার পাবার ব্যবস্থা করা যাবে। তবু ব্রিজের দু'দিকে স্টীল ব্যারিয়ার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই কুয়াশা ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রিপোর্টারদের দিকে তাকাল সে। ওদের সাথে চারজন মেয়ে সাংবাদিকও রয়েছে। তিনজনকে তার হাফ-বুড়ি বলে মনে হলো। বাকি একজন, ভারতীয় সাংবাদিক প্রদ্যুৎ মিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কিশোরী বললেই হয়। 'আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, প্লীজ,' তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'কেউ একটা ফুলের টোকাও দেবে না আপনাদের। আমি...'

একজন রিপোর্টার ভিড় ঠেলে এক পা এগিয়ে এল, বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে...'

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'পরে। আমার বলার কথা শেষ হলে, আপনাদের সবাইকে একটা সুযোগ দেয়া হবে—যার ইচ্ছে চলে যাবেন, যার খুশি থাকবেন। যারা থাকবেন, তাদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে না।' নিঃশব্দ হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমি জানি, আপনারা বেশিরভাগই থাকার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ, এরই মধ্যে আপনারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, এ-ধরনের স্টোরি বা নিউজ হপ্তায় হপ্তায় আকাশ থেকে পড়ে না।'

কবীর চৌধুরী কথা বলছে, রিপোর্টাররা খস খস করে লিখে নিচ্ছে সব। ফটো তুলতে হঠাৎ করে সাহস পেল না কেউ, কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তুলে ক্লিক করতেই বাকি সবাই ব্যস্ত-পাগল হয়ে উঠল। ফটোগ্রাফাররা ছুটোছুটি করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে একের পর এক ছবি তুলে চলল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতি হপ্তায় কেন, সারাজীবনে একবারও এই রকম দুনিয়া কাঁপানো স্টোরি রিপোর্টারদের জোটে না কপালে। গোল্ডেন গেট ব্রিজ থেকে ওদেরকে সরাতে হলে গলা ধাক্কা দিতে হবে, স্বেচ্ছায় কেউ যাবে বলে মনে হয় না।

ব্রিজে পৌঁছে গেছে কুয়াশা, কিন্তু ঢেকে ফেলেনি। ওপরের পাতলা, হালকা ঝুঁটি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়ে, মাঝখানের ঘন শরীরটা এগোচ্ছে ব্রিজের বিশ ফিট নিচ দিয়ে। টাওয়ারগুলোর নিচের অংশ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে নদী। মনে হলো, শূন্যে ভাসছে ব্রিজ। ওজনহীন একটা অনুভূতি হলো সবার।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলল কবীর চৌধুরী। সবাই যখন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছু কিছু আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে সবাইকে রিয়্যার কোচে তিনটে টেলিফোন আছে, শহরের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। এগুলো কবীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে, তবে রিপোর্টাররাও মাত্র একবার করে কাজে লাগাতে পারবে। কি কাজে লাগাতে পারবে, তাও বলে দেয়া হলো। ফটোগ্রাফিক সার্ভিস, নিউজপেপার, ওয়্যার সার্ভিস অথবা নিউজ এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করা যাবে। যোগাযোগ করে একজন লোককে ব্রিজের দক্ষিণ মুখে আসতে বলতে হবে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সেই লোকের হাতে ডিসপ্যাচ অথবা ফটোগ্রাফ পাঠাতে পারবে। এগুলো দিনে তিনবার পাঠাবার সুযোগ দেয়া হবে, নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা হবে পরে।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের চারদিকে মার্কার বসানো হবে, অনুমতি ছাড়া সেই মার্কার টপকে কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। কবীর চৌধুরী বা তার দলের লোকদের অনুমতি ছাড়া কোন রিপোর্টার প্রেসিডেনশিয়াল কোচের কারও সাক্ষাৎকার নিতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট যদি একটা প্রেস-কনফারেন্স ডাকেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে প্রেসিডেন্টের মর্জির ওপর। কবীর চৌধুরী তাঁকে তো আর বাধ্য করতে পারেন না!

হেলিকপ্টার দুটোর চারদিকেও দাগ দেয়া হবে, সেই দাগ টপকেও ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ। কবীর চৌধুরীর কোচের কাছ থেকে বিশ গজ দক্ষিণে একটা, আর রিপোর্টাররা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বিশ গজ দূরে আরেকটা, এই মোট দুটো সাদা রেখা আঁকা হবে ব্রিজের ওপর। এই চল্লিশ গজের মধ্যে থাকতে হবে সবাইকে। রেখা দুটোর পাঁচ গজ সামনে হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে একজন করে গার্ড থাকবে। কেউ রেখা টপকালে সাবধান করবে না গার্ড, সরাসরি গুলি করবে।

সন্ধের পর রিপোর্টাররা তাদের কোচে থাকবে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এই সব নিয়ম শিথিল করা হবে শুধু যদি খবর হওয়ার যোগ্য কোন ঘটনা ঘটে, তবেই। ঘটনাটা খবর হওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করবে কবীর চৌধুরী। সবশেষে বলল

সে, 'এসব নিয়ম কেউ যদি মেনে চলতে না চায়, ব্রিজ থেকে এখুনি চলে যেতে পারে সে।'

কেউ গেল না।

'কোন প্রশ্ন?' রিপোর্টাররা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে। এই ফাঁকে পুব দিকে ফিরে কুয়াশার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। পুব দিকের আলক্যাটরাজ দ্বীপ ঢাকা পড়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ল দু'জন। দু'জনেই মাঝ বয়েসী, পরনে দামী কনজারভেটিভ স্যুট। একজনের মাথায় চকচকে টাক, আরেকজনের রয়েছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

ফ্রেঞ্চকাট বলল, 'আছে।'

'আপনাদের পরিচয়?'

'আমি বিল গাইডেন—এ. পি.। উনি রিচ লোগান—রয়টার।'

কবীর চৌধুরীর চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল। উপস্থিত রিপোর্টাররা সবাই মিলে দুনিয়ার যে ক'টা কাগজে খবর পৌঁছাতে পারবে, ওরা দু'জনেই তারচেয়ে বেশি কাগজে পাঠাতে পারবে। 'বলুন?'

'মি. চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবেননি যে বাহ্, সকালটা তো সুন্দর, আজই তাহলে প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করা যাক?'

'না, তা ভাবিনি।'

রিচ লোগান বলল, 'অপারেশনের প্রকৃতি দেখেই বোঝা যায়, প্ল্যানটা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় আর পরিশ্রম লেগেছে। প্ল্যান তৈরি করার সময় সব দিক বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছিল। কি কি ঘটতে পারে, সব আগে থাকতেই আন্দাজ করে নেয়া হয়েছিল। আপনি নিজেই কি এই প্ল্যান তৈরি করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তৈরি করতে কত দিন সময় লেগেছে?'

'তিন মাস।'

'তা সম্ভব নয়। এই মোটর শোভাযাত্রার রুট, সময় ইত্যাদি মাত্র চারদিন আগে ঠিক করা হয়েছে।'

'রুট, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ওয়াশিংটনে তিন মাস আগে।'

গাইডেন বলল, 'আমাদের সামনে যে-সব প্রমাণ রয়েছে, তাতে আপনার কথাই বিশ্বাস করতে হয়। আমার প্রশ্ন, তিন মাস আগেই যদি সব ঠিক করা হয়ে থাকে, এত দিন তা চেপে রাখা হয়েছে কেন?'

'যাতে আমার মত লোকেরা কোন সুযোগ নিতে না পারে।'

'এই তথ্য আপনি যোগাড় করলেন কিভাবে?'

'কিনেছি।'

'কিভাবে? কার কাছ থেকে?'

'দুনিয়ার আর সব শহরের মতই ওয়াশিংটনেও ত্রিশ হাজার ডলারে অনেক তথ্য কিনতে পাওয়া যায়।'

'কার কাছ থেকে কিনেছেন, নাম বলবেন কি?'

'বোকার মত কথা বললেন। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

প্রৌঢ়া একজন বলল, 'আছে। আপনার এই অপারেশনে কোন খুঁত নেই দেখে বুঝতে পারছি, আপনি এ-ধরনের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। যদি বিশ্বাস করি, আইনের বাইরে এটা আপনার প্রথম পদক্ষেপ নয়, তাহলে কি ভুল হবে?'

'আজ জানলাম, সাংবাদিকরাও অশিক্ষিত হয়,' অপমান করছে কবীর চৌধুরী, কিন্তু মিষ্টি হেসে। 'এর আগের প্রেসিডেন্টের মাকে আইফেল টাওয়ারে কে আটকেছিল? এয়ারফোর্স ওয়ান কে হাইজ্যাক করেছিল? তারপর...'

'মাই গড!' মহিলা আঁতকে উঠল। 'সেই চৌধুরী আর কবীর চৌধুরী, আপনারা তাহলে একজনই?'

'আর কিছু?'

'অবশ্যই,' বলল গাইডেন। 'আমরা সবাই যেটা জানতে চাই—কেন?'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রেস-কনফারেন্স ডাকছি, তখন বলব। সবচেয়ে বড় টিভি কোম্পানিগুলোর লোকজন থাকবে, টিভি ক্যামেরা থাকবে। সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, এদেরকেও দেখতে পাবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ডকেও আমরা আনাচ্ছি, তবে কনফারেন্সের আগে তিনি পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

এরা সবাই ঝানু রিপোর্টার, প্রত্যেকের ঝুলিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঠাসা, কিন্তু কবীর চৌধুরীর কথা শুনে তারা সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলল। অবশেষে গাইডেন সতর্কতার সাথে জিজ্ঞেস করল, 'মি. চৌধুরী, আপনার চোখে...'

'বিশেষ ধরনের চশমা,' এক চিলতে হাসি ফুটল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'এর বদৌলতে শুধু সামনে নয়, পিছনটাও দেখতে পাই আমি। এখন আপনারা আমার কোচে টেলিফোন করতে যেতে পারেন। একেকবারে তিনজন করে।'

ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। এগোল প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে। মাত্র দু'পা এগিয়েছে, চার্লির আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল সে।

'স্যার! বিপদ!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে চার্লি, কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে চোখ জোড়া, তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে।

কদাকার ভালুকের দৃষ্টি অনুসরণ করে পশ্চিম দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পরমুহূর্তে কঠিন দেখাল তাকে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে ব্রিজের ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে চলে এল সে। হাত দুটো নিজের অজান্তেই উঠে এল কোমরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। এখনও কুয়াশা রয়েছে পশ্চিম দিকে, কিন্তু আধ মাইলটাক পর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে সেটার বিস্তার। ওখান থেকে আরও প্রায় মাইলখানেক সামনে একটা জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। কুয়াশার নিচের অংশ জাহাজটার খোল আড়াল করে রাখলেও, জাহাজটা কি ধরনের বুঝতে অসুবিধে হলো না। মাথার উষ্ক খুষ্ক চুলে আঙুল চালাল কবীর চৌধুরী। যুদ্ধজাহাজ! ওরা যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে!

পাঁচ সেকেন্ড নড়ল না কবীর চৌধুরী, তারপরই তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। ছুটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠল সে। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে

প্যাসেজ ধরে দমকা বাতাসের মত এগোল। বজ্রকণ্ঠে ডানকানকে বলল, 'ডিকসন! ওকে না পেলে তার বাপকে কবর থেকে টেনে তুলতে বলো। ডাবল কুইক!' হাত বাড়িয়ে একটা টেলিফোন দেখাল। 'ওটা।'

প্রেসিডেন্ট, বাদশা এবং প্রিন্স পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। কোচের ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। সাথে সাথে লাইনে এলেন পুলিস চীফ।

'ডিকসন? তোমার জন্যে একটা খবর আছে। আমি প্রেসিডেন্টের কান কাটতে যাচ্ছি।'

'স্যার!' সম্বোধনটা পুলিস চীফের মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল। 'কি বলছেন?'

'তোমার মুণ্ডু বলছি! ওখানে ওটা কি, কাগজের নৌকো? ফিরিয়ে নাও!'

'ফর গডস সেক, কি ফিরিয়ে নেব?'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজের দিকে বড় একটা জাহাজ আসছে। ওটা আসুক আমি চাই না। যে বুদ্ধিই করে থাকো, পরিণতি শুভ হবে না। ফিরিয়ে নাও!'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু ধরুন।' লাইন চুপচাপ হয়ে গেল। এই সুযোগে হাত-ইশারায় পেরটকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী।

'ব্রিজের দিকে একটা যুদ্ধজাহাজ আসছে। বিপদ? আমি জানি না। সবাইকে আড়ালে থাকতে হবে। কাগজের লোকেরা তাদের কোচে, আমাদের লোকেরা আমাদের কোচে। সবক'টা দরজা বন্ধ। তারপর আমার কাছে ফিরে এসো।'

ড্রাইভারের সীটের পাশে লালচুলো এক যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেল্টে আটকানো রিভলভারের ওপর হাত, তার দিকে কবীর চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পেরট জানতে চাইল, 'টেডি একা সামলাতে পারবে, চীফ?'

নিজের রিভলভারটা টেনে বের করে টেলিফোনের পাশে রাখল কবীর চৌধুরী। 'এখানে আমিও রয়েছি। কুইক!'

ছুটে বেরিয়ে গেল পেরট।

আবার লাইনে এলেন ডিকসন। 'ওটা যুদ্ধজাহাজ ইউ.এস. এস. নিউ জার্সি। বছরের কয়েক মাস সান ফ্রান্সিসকো ওটার হোম বেস। ফুয়েল আর রসদ নেয়ার জন্যে এটা তার একটা ধরাবাঁধা ফেরা। ঠিক এই বিশেষ সময়টাতে তার আসার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু ভাটার সময় ব্রিজের তলা দিয়ে আসতে পারে।'

কবীর চৌধুরী ধারণা করল, ডিকসন সত্যি কথাই বলছে। ভাটা চলছে, সন্দেহ নেই। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষ একটা যুদ্ধজাহাজের সাহায্য পেতে পারে না—দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অসম্ভব। তারপর, যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে কি ফায়দা হবে বলে আশা করতে পারে ওরা? ব্রিজ উড়িয়ে দিতে পারবে না, প্রেসিডেন্ট রয়েছে। তবু, কার মনে কি আছে কিছুই বলা যায় না, সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল। বলল, 'থামাও ওটাকে। ব্রিজের নিচে কোনমতেই আসতে পারবে না। তেলী বন্ধুদের একজনকে ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দিই, এটা নিশ্চয়ই চাও না?'

'ফর গডস সেক, আপনি বদ্ধ, বদ্ধ, বদ্ধ একটা উন্মাদ!'

একটু স্বস্তি বোধ করল কবীর চৌধুরী।

রাগ নয়, পুলিস চীফের গলার সুরে কান্না আর আতঙ্কের মাঝামাঝি একটা ভাব

প্রকাশ পেতে শুনল সে। 'কাজেই তোমার সাবধান হওয়া উচিত। নয় কি?'

'দ্য নিউ জার্সির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমরা। আপনার চোদ্দ-পুরুষের দোহাই, হুট করে কিছু একটা করে বসবেন না!'

ছয়

নিজেদের পরিচয়, দায়িত্ব এবং ভূমিকা ভুলে ব্রিজের পশ্চিম পাশে ভিড় জমিয়েছে গার্ড আর রিপোর্টাররা, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সবাই যুদ্ধজাহাজের দিকে। সহজ সরল যুক্তিই বলে দেয় ব্রিজের নিচ দিয়ে যুদ্ধজাহাজ গেলেও বিপদের কোন আশঙ্কা নেই, তবু দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। যতই কাছে চলে আসছে জাহাজটা, ততই আকাশচুম্বি হয়ে উঠছে তার সুপারস্ট্রাকচার। সবাই জানে এর আগেও গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিচ দিয়ে 'দ্য নিউ জার্সি' যাওয়া-আসা করেছে, তবু জাহাজটার সুপারস্ট্রাকচারটাকে ধীরে ধীরে আরও উঁচু হয়ে উঠতে দেখে দর্শকদের মনে অকারণ একটা ভয় আসন গেড়ে বসল—মনে হচ্ছে ডগাটা ব্রিজের সাথে ধাক্কা না খেয়ে পারে না

ব্যতিক্রম একজনকে পাওয়া গেল, যাকে দেখে মনে হলো এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে অথচ সে-ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। সামনের কোচে একা রয়েছে রানা, হাতে সবুজ কর্ড আর কালো একটা সিলিন্ডার। বেশ লম্বা একটা কর্ড, কিন্তু সুতোর মতই সরু। এক ইঞ্চি ডায়ামিটারের সিলিন্ডার, আট ইঞ্চি লম্বা। সিলিন্ডারের গায়ে খানিকটা কর্ড পেঁচিয়ে ওর বুশ জ্যাকেটের পকেটে কর্ড আর সিলিন্ডারটা রেখে দিল। তারপর কোচ থেকে ব্রিজে নেমে এল ও।

জাহাজের সুপারস্ট্রাকচার আরও কাছে চলে এসেছে, সেদিকে মাত্র একবার উদাস চোখে তাকাল রানা, তারপর অলস পায়ে এদিক ওদিক খানিক হাঁটাহাঁটি করে বাঁক ঘুরে কোচের ডান দিকে চলে এল। বাঁকটা ঘোরার ঠিক-আগের মুহূর্তে দেখল, ব্রিজের দূর প্রান্তে, যেখানে দর্শকদের ভিড় জমে উঠেছে, সেদিকে হন হন করে এগোচ্ছে রস পেরট। পেরটের উদ্দেশ্য কি জানার উপায় নেই, কিন্তু সে যে জরুরী কোন কাজে যাচ্ছে সেটা বোঝা গেল। রানা আন্দাজ করল, সময় খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

সময় বাঁচাবার জন্যে ইচ্ছে হলো দৌড় দেয়, কিন্তু তাতে শুধু দৃষ্টিই আকর্ষণ করা হবে। কাছেপিঠে কাউকে দেখা গেল না, কোন ঘটনা ছাড়াই ব্রিজের পুব দিকে পৌঁছতে পারল রানা। চট করে নিজের তিন দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পকেট থেকে কর্ড পেঁচানো সিলিন্ডারটা বের করল ও। ঝুঁকে পড়ল ব্রিজের কিনারা থেকে নিচের দিকে। তারপর সিলিন্ডারটা ছেড়ে দিল। কর্ডের প্যাঁচ ছাড়াতে ছাড়াতে নিচের দিকে কয়েক শো ফিট নেমে গেল সিলিন্ডার। কর্ডটা ছিঁড়ে একটা প্রান্ত লোহার বারে বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল ও। কাঁধ দুলিয়ে, চুটকি বাজিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে একটা জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ফিরে এল কোচে। নিজের সীটে

বসে জুলির ক্যারি-অল খুলল ও। ঝুলন্ত কর্ডটা যদি কারও চোখে পড়ে যায়, এবং তারপর রিপোর্টারদের জিনিস-পত্র যদি সার্চ করা হয়, রানা চায় তখন যেন ওর নিজের জিনিস-পত্রের ভেতর সবুজ কর্ডটা না পায় ওরা। জুলির ক্যারি-অলে পাওয়া গেলে জুলির কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। নিউ জার্সিকে প্রথম দেখতে পাওয়ার সময় থেকে ব্রিজের পশ্চিম দিকে, বহু লোকের চোখের সামনে রয়েছে সে, তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকবে না। তবু যদি জুলির কোন বিপদ হয়, তখন দেখা যাবে। আপাতত নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে ওর।

'বিশ্বাস করুন,' বললেন পুলিস চীফ, 'নিউ জার্সির ক্যাপটেন ঘটনাটা সম্পর্কে কিছুই শোনেননি। শুনেও বিশ্বাস করছেন না। তাঁর ধারণা, আমরা ঠাট্টা করছি। তাঁকে দোষ দিতে পারেন না। গত চল্লিশ বছর ধরে যেমন দেখে আসছেন, আজও তেমনি গোল্ডেন গেট ব্রিজকে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন তিনি। আপনিই বলুন, কি দেখে তাঁর বিশ্বাস হবে?'

পুলিস চীফের কথায় ঝর ঝর করে আবেদনের সুর না ঝরলেও, বিশ্বাস করাবার ব্যাকুলতাটুকু স্পর্শ করল কবীর চৌধুরীকে। এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল সে, 'তাকে বিশ্বাস করাবার দায়িত্ব তোমার, আমার নয়।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে উঠে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করল পেরট। তারপর কবীর চৌধুরীর দিকে এগিয়ে এল। 'খেদিয়ে সবাইকে খাঁচায় ভরেছি, চীফ।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে জানতে চাইল, 'কেন?'

একদিকের মস্ত কাঁধ ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'কি জানি! বোধহয় ডিকসনের কথাই সত্যি, ব্যাপারটা কাকতালীয়। কিন্তু আসলে তা যদি না হয়? কি ব্যবহার করবে ওরা? শেল? না। হাই এক্সপ্লোসিভ? না। গ্যাস শেল? গ্যাস শেল।'

'সেরকম কিছু আছে কি, চীফ?'

'আছে। তাতে যদি আমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট আর তার মেহমানরাও কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারায়, ওরা মাইন্ড করবে না। তারপর গ্যাস-মাস্ক পরা পুলিস আর ট্রুপস পাঠিয়ে যুদ্ধটা জিতে নেবে। তবে কোচগুলো এয়ারকন্ডিশন করা, বাইরে থেকে বাতাস বা গ্যাস ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব।'

'আমার মনে হয় না…'

'ওয়েট!'

পুলিস চীফ আবার ফোনে কথা বলছেন, 'বিশ্বাস করাতে জান বেরিয়ে গেছে, মি. চৌধুরী। তবু ভাগ্য, বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু কোন নির্দেশ মানতে রাজি হচ্ছেন না ক্যাপটেন। বলছেন, ইতিমধ্যে ব্রিজের এত কাছে চলে এসেছে নিউ জার্সি, এখন যদি ওটাকে ঘোরাবার বা রিভার্স অ্যাকশনের সাহায্যে থামাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে ব্রিজ এবং জাহাজ দুটোরই ক্ষতি হবার ভয় আছে। বলছেন, নিউ জার্সি একটা টাওয়ারের সাথে ধাক্কা খেলেই তলিয়ে যাবে। হিসেব করে বললেন, ধাক্কাটার ওজন হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টন।'

'আল্লা আল্লা করো, কিছু যেন না ঘটে,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী। পেরটকে পিছনে নিয়ে কোচের মাঝখানে চলে এল সে। ডান দিকের

জানালা দিয়ে পুব দিকে তাকাল, নিউ জার্সির সুপারস্ট্রাকচার ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রেসিডেন্টকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত দেখাল। কিন্তু পরিচিত, জনপ্রিয় হাসিটি নেই মুখে। তবে গলার সুরে ক্ষীণ একটু হাস্যরসের আভাস পাওয়া গেল। 'ঠিক কি ঘটছে, চৌধুরী?'

'আপনি জানেন। আমাদের নিচ দিয়ে ইউ.এস.এস. নিউ জার্সি যাচ্ছে।'

'তাতে কি? কোথাও না কোথাও যাওয়াই তো কাজ ওটার। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?'

'অস্থির হচ্ছি না। ভাবছি, ওটা থেকে না আবার এদিকে কিছু ছুঁড়তে শুরু করে দেয় ক্যাপটেন।'

'এদিকে?' বিস্মিত দেখাল প্রেসিডেন্টকে। 'আমার দিকে?'

'জানি, আর্মড ফোর্সের আপনিই কমান্ডার-ইন-চীফ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, অধস্তনদের চোখের আড়ালে রয়েছেন আপনি আউট অভ সাইট, আউট অভ মাইন্ড। ওদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী কেউ নেই, জোর করে বলেন কিভাবে? পথের কাঁটা সরাবার এই মোক্ষম সুযোগ যদি সে না হারাতে চায়? এসব না হয় বাদ দিন। কিন্তু ক্যাপটেন যদি মনে করে, কারও কথায় কান না দিয়ে নিজের বুদ্ধি মত কাজ করা তার একটা কর্তব্য, তখন? দেখা যাক, একটু পরেই জানতে পারব। ওই, বেরিয়ে আসছে।'

নিউ জার্সির সুপারস্ট্রাকচার দৃষ্টিপথে চলে এল। বন্দীরা সবাই যে যার আসন ছেড়ে ডান দিকের জানালাগুলোর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের একজন এই সুযোগে কবীর চৌধুরীর বিপজ্জনক কাছে এসে পড়লেন। হঠাৎ করেই কবীর চৌধুরী তার বাঁ দিকের কিডনীতে শক্ত একটা কিছুর স্পর্শ অনুভব করল। সন্দেহ নেই, জিনিসটা ধাতব।

'আপনারই কথা—মানুষ তো আর ফেরেশতা নয়, ভুল তার হতেই পারে। কথাটা আপনার বেলায়ও সত্যি,' বললেন সাদ ফাহিম, যাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রয়েছে। একগাল হাসলেন তিনি। 'এটা আপনারই রিভলভার চৌধুরী। আপনার লোকদের বলুন, যার যার রিভলভার আর মেশিন-পিস্তল যেন ফেলে দেয়।'

'গুড ম্যান!' প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বরে উল্লাস প্রকাশ পেল।

'চৌধুরী নয়, মি. চৌধুরী,' নরম সুরে সাদ ফাহিমকে ভুল শুধরে নিতে বলল কবীর চৌধুরী।

হা হা করে খানিক হাসলেন সাদ ফাহিম।

তাঁর হাসি থামতে কবীর চৌধুরী আবার শান্ত সুরে বলল, 'রিভলভারটা সরান। আমার লোকেরা প্রফেশনাল, এটা কেন বুঝছেন না?'

কথা শেষ করে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল কবীর চৌধুরী। তার এই দুঃসাহসিক আচরণ বিস্মিত করল সাদ ফাহিমকে, এক সেকেন্ডের জন্যে পরিবেশ ভুলে কবীর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এই এক সেকেন্ড সময় পেরেটের জন্যে যথেষ্ট। গুলির আওয়াজ হলো, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন সাদ ফাহিম। হাত থেকে রিভলভার ফেলে দিয়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া কাঁধ চেপে ধরলেন তিনি।

কাছেই ছিলেন শেখ খায়ের, ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে রিভলভারটা তুলতে গেলেন তিনি। রিভলভার আর তাঁর হাতের ওপর সজোরে নেমে এল কবীর চৌধুরীর জুতো পরা গোড়ালি। মুট মুট কয়েকটা আওয়াজই বলে দিল, ভদ্রলোকের একাধিক আঙুল ভেঙে গেছে। অলস ভঙ্গিতে ঝুঁকে রিভলভারটা তুলে নিল কবীর চৌধুরী।

মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসল রস পেরট। তার মায়াভরা চোখে বেদনা। 'এছাড়া উপায় ছিল না, চীফ। আপনার প্রাণ বাঁচানো আমার ফরজ। ভদ্রলোককে আমি ওয়ার্নিং দিইনি, কারণ, আমার কথায় কান না দিয়ে উনি গুলি করতেন। কোচে বুলেট প্রুফ কাঁচ রয়েছে, বুলেট ছিটকে কার গায়ে লাগত কে জানে! উনি নিজেও নিহত হতে পারতেন।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল সে। ব্রিজ থেকে ইতোমধ্যে প্রায় আধ মাইল দূরে সরে গেছে নিউ জার্সি। আন্দাজ করা যায়, এই মুহূর্তে নিজেকে সুখী একজন মানুষ বলে ভাবতে পারছেন না ক্যাপটেন। ঘুরে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, টেডিকে বলল, 'আমাদের কোচ থেকে হুয়ানকে ডেকে আনো।' বন্দীদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনারা দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করছেন কেন! বসুন, সবাই বসুন।'

নিঃশব্দে যে যার আসনে বসলেন সবাই। প্রেসিডেন্টকে দেখে মনে হলো, ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছেন। প্রেসিডেন্টরাও আসলে সাধারণ মানুষ, ভাবল কবীর চৌধুরী। এই লাইনের চিন্তাভাবনা তার জন্যে লাভজনক নয় ভেবে ক্ষান্ত হলো সে। আর যাই হোক, রাজনীতির মত নোংরামি নিয়ে সময় নষ্ট করার মানসিকতা তার কোন দিনই হবে না।

'যা ঘটে গেল এরপর ফের আপনারা কেউ ছেলেমানুষি করবেন বলে আমি আশা করি না,' বলল সে। এগিয়ে গিয়ে কমিউনিকেশন কনসোলের সামনে দাঁড়াল। ফোন তুলে বলল, 'ডিকসন?'

'বলছি। এখন খুশি?'

'হ্যাঁ। হারবার-মাস্টারকে সাবধান করে দিয়ে বলো, ব্রিজের নিচ দিয়ে আর কোন ট্রাফিক যেতে পারবে না। না এদিক থেকে, না ওদিক থেকে।'

'ট্রাফিক যেতে পারবে না? কি বলছেন! গোটা পোর্ট যে তাহলে অচল হয়ে পড়বে! ফিশিং ফ্লিটগুলো…'

'ওগুলো বে-তে মাছ ধরুক। তাড়াতাড়ি একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একজন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও। দু'জন লোক কষ্ট পাচ্ছে এখানে। একজনের অবস্থা সিরিয়াস।'

'কারা? কিভাবে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন ডিকসন।

'দুই তেল মন্ত্রী—ফাহিম আর খায়ের। বলতে পারো, আত্মপীড়নের শিকার হয়েছে ওরা।' দেখল, কোচে উঠে তেল মন্ত্রী ফাহিমের কোটের আস্তিন কাঁচি দিয়ে কাটতে শুরু করেছে হুয়ান। 'ব্রিজে টিভি ক্যামেরা আসছে। বাধা দিয়ো না, আসতে দাও। ব্রিজে আমি কিছু চেয়ারও চাই—এই ধরো, গোটা চল্লিশেক।'

'চেয়ার?'

'কিনতে হবে না,' ধৈর্য না হারিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'কাছাকাছি কোন

একটা রেস্তোরাঁ থেকে ধার নাও।'

'চেয়ার?'

'লোকে যাতে বসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি একটা নিউজ কনফারেন্স ডাকছি। নিউজ কনফারেন্সে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে না। তাদের বসতে দিতে হয়।'

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জানতে চাইলেন পুলিস চীফ, 'আপনি নিউজ কনফারেন্স ডাকছেন, টেলিভিশনে সেটা প্রচার করবেন বলে?'

'আরে, ঠিক ধরেছ তো! হ্যাঁ, গোটা দেশকে জানাব। মানে, দেখাব।'

'আপনার···আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ভাল করার যোগ্যতা তোমার নেই। কলভিন আর নিউসম, ওরা এখন তোমার সাথেই তো?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পৌচেছেন···' কমিউনিকেশন ভ্যানের পিছন দিকে তাকালেন পুলিস চীফ। জ্যাক কলভিন, সেক্রেটারি অভ স্টেট দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোক লম্বা-চওড়া, চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চাঁদের আকৃতি পেয়েছে। স্টীল রিমের চশমা পরে আছেন তিনি। সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী ডেভিড নিউসমের মাথার চুল সব সাদা, বেশ মোটা তিনি, মুখে হাসি নেই—লোকে বলে, কেবিনেট তাঁর কাছ থেকে টাকা চাইবে এই ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকেন বলে তিনি নাকি হাসতে ভুলে গেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ব্যাংকার এবং অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর মত খ্যাতি খুব কম লোকেরই আছে।

জ্যাক কলভিন বললেন, 'বলা সহজ লোকটা পাগল, কিন্তু আসলে কি তাই সে?'

'ওটা একটা কথার কথা, স্যার,' পুলিস চীফ বললেন, 'সত্যি যদি পাগল হয়ও, আমাদের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান পাগল। একটা অসম্ভবকে কেমন সম্ভব করে তুলেছে, দেখুন না!'

'এবং হিংস্র, তাই না?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন পুলিস চীফ। 'কেন যেন, আমার তা মনে হয় না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল, কই, একজনকেও তো মেরে ফেলেনি। সিরিয়াসনেস বোঝাবার জন্যেও দু'চারজনকে মেরে ফেলতে পারত, আমরা সবাই তো সেই ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু না, মারেনি, মি. ফাহিম আর মি. খায়ের নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিলেন, হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল চৌধুরী···'

ডেভিড নিউসম বললেন, 'মনে হচ্ছে লোকটা সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন আপনি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পুলিস চীফ। 'আমেরিকার সব সিনিয়র পুলিস অফিসার চৌধুরী সম্পর্কে জানে, স্যার। এবার নিয়ে পাঁচ বার আমাদেরকে বিপদে ফেলল।'

'লোকটার বিশেষত্ব কি?'

'অসম্ভব জেদি এক বিজ্ঞানী, স্যার,' পুলিস চীফ বললেন, 'এমন অদ্ভুত বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, কোন দেশ তা অনুমোদন করতে পারে না। মানুষের পরমায়ু

তার একটা প্রিয় সাবজেক্ট। শোনা যায়, এ-বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নাকি বহু মানুষের প্রাণ নিয়েছে, ওই গবেষণার খাতিরেই।'

'তার খারাপ দিক সম্পর্কে…?'

'খারাপ দিক হলো, টাকার জন্যে করতে পারে না হেন কাজ নেই। ডাকাতি, ট্রেন লুট, প্লেন হাইজ্যাক, প্রেসিডেন্টের আপনজনকে কিডন্যাপ—এসব কাজে তাকে আমাদের বড় কুটুমও সাহায্য করে থাকে!'

'মাই গড! এর মধ্যেও রাশিয়া?'

'বেশ কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্টের এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করেছিল চৌধুরী, তার এই অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল মস্কো,' বলে চললেন পুলিস চীফ, 'আমরা চাপ সৃষ্টি করি। মস্কো থেকে তখন আশ্বাস দিয়ে বলা হয়, এরপর চৌধুরী যাতে কোন রকম ভায়োলেন্সের মধ্যে না যায় সেদিকে তারা সাধ্যমত নজর রাখবে। সেজন্যেই আমার ধারণা হচ্ছে, চৌধুরীর পক্ষে হিংস্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবে তাকে বাধ্য করা হলে আলাদা কথা।'

'কখনও ধরা পড়েনি?' কলভিন জানতে চাইলেন।

'অনেক বার। কিন্তু তাকে ধরে রাখা যায় না। কিভাবে যেন ঠিক বেরিয়ে পড়ে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লোকটার ওপর আপনার কিছু শ্রদ্ধা আছে!' বিস্মিত দেখাল সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে।

'চৌধুরীকে কয়েদ করার বিনিময়ে আমি আমার পেনশন হারাতেও রাজি আছি, স্যার। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কাউকে যদি একটা কাজ নিখুঁতভাবে করতে দেখি তার প্রশংসা না করে পারি না। আজ পর্যন্ত চৌধুরীর কাজে আমি সাধারণ কোন ত্রুটি দেখিনি। আমার জানামতে বেশ কয়েকবারই সফল হতে হতেও ব্যর্থ হয়েছে সে, তার কারণ তার অহমিকা আর আত্মবিশ্বাস। প্রায়ই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।'

কয়েক সেকেন্ড আর কেউ কিছু বললেন না মনে হলো, সবাই ধ্যান করছেন। তারপর সেক্রেটারি অভ স্টেট জানতে চাইলেন, 'প্রায় সব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যালেরই একজন করে শত্রু থাকে, যাকে ভয় পায় সে। শত্রুটি এফ.বি.আই.-এর লোক হতে পারে, হতে পারে পুলিসের লোক, কিংবা সি. আই.এ., স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ইউনাকো…'

'সেরকম একজন সত্যি সত্যিই আছে, স্যার,' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুলিস চীফের চেহারা। 'ইউনাকোর একজন এজেন্ট, নাম মাসুদ রানা। চৌধুরী তাকে ভয় পায় কিনা জানি না, তবে চৌধুরীর অনেকগুলো ব্যর্থতার জন্যে এই যুবক দায়ী।'

'ইউনাকোর সাথে এখনও তাহলে যোগাযোগ করছেন না কেন?'

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করে সরাসরি ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করলেন ডিকসন। দু'মিনিট পর আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। হাত নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করলেন। ইউনাকোর হেড অফিস বলছে, 'এই মুহূর্তে মাসুদ রানা কোথায় আছে ওরা জানে না। আভাস দিল, হঠাৎ তাকে খোঁজ করে পাওয়া সম্ভবও নয়।'

'এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ?' জানতে চাইলেন নিউসম।

'আমার তো ধারণা এ-ধরনের একটা ঘটনায় তারই সবচেয়ে বেশি অস্থির হবার কথা। কোথায় তিনি?'

'ওয়াশিংটন বলছে, তিনি কোথায় ওরা জানে না। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছে ওরা।' খানিক ইতস্তত করে পুলিস চীফ আরও বললেন, 'জেনারেল ফিদার হোপকেও হঠাৎ পাওয়া খুব মুশকিল, স্যার।'

'হ্যাঁ, নিজেকে লুকিয়ে রাখার অদ্ভুত একটা ম্যানিয়া আছে ভদ্রলোকের,' গম্ভীর দেখাল জ্যাক কলভিনকে। 'হয়তো দরজা বন্ধ করে টিভি দেখছেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার, গোটা আমেরিকায় এফ.বি.আই.-চীফ সবার শেষে খবরটা জানবেন।' এক মিনিট কি যেন ভাবলেন তিনি। 'রেডিও, টিভি, নিউজ এজেন্সী—সবগুলো ব্যবহার করতে যাচ্ছে চৌধুরী তার মানে ম্যাক্সিমাম পাবলিসিটি চাইছে সে। এর আগে এভাবে কখনও জনসাধারণের সামনে এসেছে সে?'

'না। ঠিক এভাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কলভিন স্বীকার করলেন, 'নাহ্, এ-লোকের নিজের ওপর বিশ্বাস আছে বটে।'

ডেভিড নিউসম বললেন, 'তার জায়গায় আমি হলে, আমারও ওই আত্মবিশ্বাস থাকত। তার পজিশনটা লক্ষ্য করুন। হারাবার আছেটা কি?'

'আমি কিন্তু, স্যার, আশা ছাড়িনি,' সবিনয়ে বললেন পুলিস চীফ। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন, কিন্তু সাথে সাথে ডায়াল করলেন না। 'মাসুদ রানার খোঁজ দিতে পারবে এমন একজনের কথা মনে পড়েছে, স্যার। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'প্রেসিডেন্টের বিশেষ বন্ধু।'

'তিনি কিছু কিছু সরকারী দায়িত্বও পালন করেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কেউ সে-সম্পর্কে কিছু জানেন না।' ডায়াল করলেন তিনি। কথা বললেন এক মিনিট। রিসিভার রেখে দিয়ে একটু হাসলেন। পরাজয়ের হাসি। 'অ্যাডমিরালও কিছু বলতে পারলেন না। তবু, তিনি আসছেন।'

'কি করা হবে, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে?' জানতে চাইলেন কলভিন।

'জ্বী, স্যার। আমাদের হেডকোয়ার্টারে জেনারেল গারল্যান্ড আর অ্যাডমিরাল সোরেনসন আলোচনা করছেন।'

'গারল্যান্ড। সোরেনসন। আমাদের দুই প্রতিভা।' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে ম্লান দেখাল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। 'কি অদ্ভুত, তাই না? ব্রিজের দিকে তাকান। সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অথচ কারুরই করার কিছু নেই। যে যাই বলুন, আমি কিন্তু ভয়ানক অসহায় বোধ করছি।'

'আরে, এতটা ঘাবড়িয়ো না তো?' সেক্রেটারি অভ স্টেট জোর করে হাসলেন। 'দেখাই যাক না কি হয়। একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে। জেনারেল ফিদার হোপ নিশ্চয়ই···'

'আমি ফিদার হোপের কথা ভাবছি না, ভাবছি নিজের কথা,' ডেভিড নিউসম বললেন। 'কেউ বলে না দিলেও এইটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে যে সঙ্কটের

মাঝখানে এই আমাকেই গিয়ে পড়তে হবে।'

'স্যার!' চোখ বড় বড় করে তাকালেন পুলিস চীফ।

'বুঝতে পারছেন না? চৌধুরী তার দুর্লভ সঙ্গ দেয়ার জন্যে আমাকে বেছে নিয়েছে—কেন?'

ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত, যেন গভীর চিন্তামগ্ন, ব্রিজের পুবদিক ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা। মাঝে মধ্যে থামছে ও, সামনে বিস্তৃত প্রকৃতির অপরূপ রূপসুধা পান করছে। ওর বাঁ দিকে, ফোর্ট বেকার, টিবুরন আর অ্যাঞ্জেল দ্বীপ, আরও দূরে দেখা যাচ্ছে বেলভেদার দ্বীপের ডগা, এটাই বে-র সবচেয়ে বড় দ্বীপ। ওর ডান দিকে শহর, আর নাক বরাবর আলকাটরাজ দ্বীপ, তারপর ট্রেজার অ্যাইল্যান্ড। এদের মাঝখানে দ্রুত আবছা হয়ে আসছে নিউ জার্সি, চলেছে আলামেডায় নোঙর ফেলার জন্যে। আরও কয়েকবার থামল রানা, উঁকি দিয়ে তাকাল ব্রিজের নিচে। এই রকম একবার উঁকি দেয়ার সময় সহজ ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে সবুজ কর্ডটা ধরল ও, ঝাঁকি দিয়ে অনুভব করল আগের সেই ওজন আর নেই।

'কি করছ, প্রদ্যুৎ?'

শান্তভাবে ঘুরল রানা। জুলির সবুজ চোখে কৌতূহল যদি নাও থাকে, বিস্ময়ের কোন অভাব নেই।

'তোমার পায়ে তুলো জড়ানো আছে। ভেবেছিলাম দু'চার মাইলের মধ্যে আমি একা—মানে গজের মধ্যে।'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল জুলি। তারপর খপ্ করে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল। 'কি করছিলে তুমি?'

'এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তুমি, দুটো সামনে থাকলে জানি না কোন্টা আমি বেশি পছন্দ করব। বোধহয় তোমাকে। তোমাকে বরং সুন্দরীই বলা যায়, আগে এ-কথা কেউ বলেছে?'

'অনেকেই।' হাত বাড়িয়ে সবুজ কর্ডটা দু'আঙুলে ধরে ওপর দিকে তুলতে শুরু করল জুলি। পরমুহূর্তে ব্যথায় উফ্ করে উঠে ছেড়ে দিল সেটা।

জুলির হাত ছেড়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, 'ওটার দিকে আর তাকিয়ো না।'

নিজের কব্জি ডলতে শুরু করল জুলি। চোখের সামনে কব্জি তুলে পরীক্ষা করল। 'ইস্, লাল হয়ে উঠেছে।'

'কাউকে খামচে ধরলে কেমন লাগে, বোঝো!'

আবার নিজের চারদিকে তাকাল জুলি। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি, আমাকে বলবে না?'

'মাছ ধরছি।'

'অ্যাঙলাররা খুব গপ্পোবাজ হয়, তাই না?'

'তুমি যদি বলো।'

'তাহলে আমাকে একটা গল্প শোনাও।'

'তুমি সুন্দরী, কিন্তু বিশ্বস্ত কি?'

'আমি কি সুন্দরী? তবে আমি অ্যাঙলার নই।'

'তা নও।'

'তাহলে আমি গপ্পোবাজও নই,' ফিসফিস করে বলল জুলি। 'কাজেই যা শুনব, দু'কান হবে না। তোমার গল্পটা বেশ বড় হবে তো?'

'হ্যাঁ।' জুলির একটা হাত ধরল রানা। 'প্লীজ।'

দু'জন একসাথে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ওরা।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পুলিস চীফ। সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনারা তৈরি তো, স্যার?'

জ্যাক কলভিন উঠে দাঁড়ালেন। সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকালেন ডেভিড নিউসমের দিকে। 'আমার বা প্রেসিডেন্টের মত তোমার শার্টটাও নীল হওয়া উচিত ছিল, ডেভিড। সাদা জিনিস টিভিতে যাচ্ছেতাই দেখায়।'

'ওহ্ শাট আপ!' আওয়াজ শুনে ভ্যানের পিছন দিককার দরজার দিকে ফিরলেন নিউসম। মোটরসাইকেল থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল একজন আরোহী। বাহন দাঁড় করিয়ে ধাপ বেয়ে ভ্যানে চড়ল সে। পুলিস চীফের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার জন্যে, স্যার।'

আট ইঞ্চি লম্বা, সরু সিলিন্ডারটা নিলেন ডিকসন। নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার নাম লেখা রয়েছে। কোত্থেকে আনছ?'

'নিউ জার্সি থেকে পাইলট বোট নিয়ে এসেছে, স্যার। নিউ জার্সির ক্যাপটেন বলে পাঠিয়েছেন, এটা একটা আর্জেন্ট ব্যাপার হতে পারে।'

সাত

গোল্ডেন গেট ব্রিজের মাঝখানে যেন হাট বসেছে।

কোচ তিনটেই আছে, কিন্তু পুলিস কার একটা থেকে বেড়ে দুটো, তারপর তিনটে হয়েছে। ওতে চড়ে এইমাত্র ব্রিজে পৌঁছলেন দুই সেক্রেটারি জ্যাক কলভিন আর ডেভিড নিউসম। ওঁদের সাথে পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনও আছেন। নতুন আরও দুটো বড় আকারের ভেহিকেল এসেছে, গায়ে লেখা—রেস্টরূম। আমদানী হয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স, কেন তা একমাত্র কবীর চৌধুরীই বলতে পারবে। বাকি তিনটের মধ্যে একটা ভ্যান, একটা ওয়াগন, একটা ট্রাক। ভ্যানে রয়েছে কম্বল, বালিশ, চাদর ইত্যাদি। কবীর চৌধুরীর জিম্মি এবং মেহমানরা ব্রিজেই রাত কাটাবেন, কাজেই এগুলো লাগবে। ট্রাকে রয়েছে বিশাল একটা টিভি ক্যামেরা, জেনারেটার সহ। আর ওয়াগনে রয়েছে গরম খাবারদাবার।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরও রয়েছে এক জোড়া হেলিকপ্টার, ট্রাকের ওপর বসানো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান, সশস্ত্র প্রহরী। ব্রিজের দুই মুখে ব্যস্ততার সাথে ব্যারিয়ার তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে আর্মি ইঞ্জিনিয়াররা।

জায়গামত বসানো হয়েছে ক্যামেরা। জিম্মিরাও তাদের নির্ধারিত জায়গায় আসন নিয়েছেন। সদ্য আগত তিনজনও বসেছেন। তাদের পিছনে চেয়ার পেয়েছে রিপোর্টাররা। ফটোগ্রাফাররা যার যেখানে ভাল মনে হয়েছে সেখানে পজিশন নিয়েছে, তবে কেউই সশস্ত্র প্রহরীদের কাছ থেকে কয়েক ফিটের বেশি দূর নয়। এদের সবার দিকে মুখ করে, একা বসে আছে কবীর চৌধুরী। তার কাছাকাছি অদ্ভুত আকৃতির একটা জিনিস পড়ে রয়েছে, ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। পাশেই ভারী একটা বাক্স, ঢাকনা বন্ধ।

'ভদ্রমহোদয়গণ, অযথা সময় নষ্ট করে আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না,' বলল কবীর চৌধুরী। এই মুহূর্তে সে যে গর্বিত, সেটা তার চেহারাই বলে দিল। দুনিয়ার সেরা কয়েকজন ক্ষমতাবান মানুষকে মুঠোর ভেতর পুরে নিজের দয়ার ওপর বাঁচিয়ে রেখেছে, এরচেয়ে গর্বের বিষয় আর কি হতে পারে? সে জানে, কম করেও একশো মিলিয়ন দর্শক তার উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠান দেখছে এবং শুনছে টিভিতে। তবু তাকে প্রশান্ত দেখাল। বসে থাকার ভঙ্গিটাও শিথিল। 'আমরা সবাই এখানে কেন, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন।'

'বিশেষ করে আমি এখানে কেন, সেটা বুঝতে কারও বাকি নেই,' বলল সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী ডেভিড নিউসম।

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'ঠিক।'

'কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনার মত আমি নিজেই আইন নই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নেই।'

'ঠিক কথা। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগের কাজ আগে, তাই না মি. নিউসম?'

'টাকা।'

'আলবৎ।'

'কত?' কোন রকম ভণিতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জানতে চাইলেন নিউসম।

'এক মিনিট, মি. সেক্রেটারি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। বিশ কোটি আমেরিকানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থায় হলেও, তাঁর একটা ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। 'টাকা তোমার কেন দরকার, চৌধুরী?'

'তা জেনে আপনার কোন কাজ নেই। আপনাকে অনুরোধ করা হলে, তখন মুখ খুলবেন। চুপ করে বসে থাকুন।'

একজন প্রেসিডেন্টের সাথে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, শুনেও বোধহয় বিশ্বাস করতে পারল না কেউ।

'আমাকে জানতে হবে বৈকি,' শান্ত কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, এই টাকা যদি কোথাও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে দরকার হয়, যদি কোন ক্ষতিকর কাজের জন্যে দরকার হয়, বিশেষ করে যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু করার জন্যে দরকার হয়—এখানে, এই মুহূর্তে আমি ঘোষণা করছি, তার আগে আপনাকে আমার লাশ ডিঙাতে হবে।'

প্রশংসা করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'ভাষণ-লেখকদের

সাহায্য না নিয়েও যা বললেন, চমৎকার বললেন, মি. প্রেসিডেন্ট। জানি, ভোটারদের খুশি করার জন্যে বললেন, যাতে আগামী ইলেকশনে আবার নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু ভোটারদের আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, আপনি ডাহা মিথ্যে কথা বললেন। টাকা দেয়ার বদলে আপনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন, আপনার পোষা কুকুরটিও তা বিশ্বাস করবে না। তবে, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আপনাদের কাছ থেকে যে টাকাটা বের করে নেব তার একটি পয়সাও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হবে না। কিছুটা বেরিয়ে যাবে দেনা শোধ করতে। বাকিটা আমি আমার গবেষণার কাজে লাগাব।'

প্রেসিডেন্টকে এত সহজে কোণঠাসা করা সম্ভব নয়, তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'শুনেছি বটে আপনি একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু তাদের বিবেক বলে একটা ব্যাপার থাকে। আপনার?'

'সত্যি কথা বলতে কি, জানি না,' খোলাখুলি বলল কবীর চৌধুরী। 'যেখানে টাকার প্রশ্ন—নেই। দুনিয়ায় যারা সত্যিকার ধনী লোক, তাদের মানুষ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। নৈতিকতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। বেশিরভাগই ক্রিমিন্যাল-মাইন্ডেড। মালটি-মিলিওনিয়ার, রাজনীতিক, আইনবিদ—এরা আবার ভাল মানুষ হলো কবে? কিন্তু উত্তর দেবার দরকার নেই। সম্ভবত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে আমি অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। আসলে আমার কিছু টাকার দরকার, এবং সেটা আমি আদায় করে তবে ছাড়ব।'

'মেনে নিলাম,' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বললেন, 'আপনি একজন সৎ চোর। এবার প্রসঙ্গে আসা যাক, কি বলেন?'

'আমি আমার সঙ্গত দাবি তাহলে পেশ করতে পারি?' সকৌতুকে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'ভণিতা রাখুন, চৌধুরী।'

'মি. চৌধুরী!' হঠাৎ রুদ্র মূর্তি ধারণ করল কবীর চৌধুরী।

'মি. চৌধুরী।'

তেল মালিকদের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ওদের মাঝখানে সাদ ফাহিম নেই। তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর, প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল সে। 'তেলের দাম বাড়িয়ে গরীব দেশের সব সম্পদ লুট করে নিচ্ছে ওরা। এই লুটেরাদের ছেড়ে দেব আমি, বিনিময়ে আমাকে দিতে হবে, এক কানা কড়িও কম নেব না—তিনশো মিলিয়ন ডলার। তিন সংখ্যাটা লিখে আটটা শূন্য দিতে হবে। আর, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার দাম ধরেছি আমি দুশো মিলিয়ন ডলার। মোট পাঁচশো মিলিয়ন হলো।'

কোটি কোটি টিভি দর্শক ভুল করে ধরে নিল, সাউন্ড ট্র্যান্সমিশনে নিশ্চয়ই গোলযোগ রয়েছে। কারণ, ঝাড়া এক মিনিট তারা কোন আওয়াজ পেল না। আওয়াজ না পেলেও, দর্শকরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্বদের মুখের অভিব্যক্তি ঘন ঘন বদলে যেতে দেখল। চেহারা বদল হলো এইরকম—কখনও রাগে লাল, কখনও বিস্ময়ে বিমূঢ়, কখনও হতাশায় ম্লান, কখনও অবিশ্বাসে হাঁ।

সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী অঙ্কে পারদর্শী, সবার আগে তিনিই ফিরে পেলেন

মুখের ভাষা। তাঁর মনে হলো, তিনি ভুল শুনেছেন। জানতে চাইলেন, 'অঙ্কটা আরেকবার বলবেন?'

'পাঁচ শূন্য শূন্য, কমা, শূন্য শূন্য শূন্য, কমা, শূন্য শূন্য শূন্য, দাঁড়ি। আমাকে যদি একটা ব্ল্যাকবোর্ড আর একটুকরো চক দেয়া হয়, লিখে দিতে পারি।'

'কি ভয়ঙ্কর! কল্পনার বাইরে! উদ্ভট! এই লোক উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ!' প্রেসিডেন্ট, যাঁর মুখের রঙ যথেষ্ট লাল হয়ে ওঠায় কালার টিভিতে দারুণ দেখাচ্ছে, ঘুসি মারার জন্যে এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু কাছেপিঠে কোন টেবিল দেখলেন না। 'কিডন্যাপিং ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শাস্তি কি জানেন আপনি?'

'জানি। এ-ও জানি, আমি ব্যর্থ হলে তারচেয়েও বড় শাস্তি দেবেন আমাকে—মৃত্যুদণ্ড—দরকার হলে আইন তৈরি করে হলেও। কিন্তু আমাকে টাকা না দেবার অপরাধে আপনার কি শাস্তি হবে, জানেন?' পকেট থেকে রিভলভার বের করল কবীর চৌধুরী। 'না, গুলি করব, আর আপনি মরে যাবেন, সেটা আমার কাম্য নয়। আমি আপনার হাঁটুতে গুলি করব। দশ কোটি দর্শক সেটা দেখবে। তখন, সত্যি সত্যি, আপনার ওই ছড়িটা কাজে আসবে।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর হাত দুটো মুঠো করলেন। মনে হলো, যতটুকু চুপসে গেলেন ততটুকু চেয়ারের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন না। মুখের লালিমা একটু যেন ম্লান দেখাল।

'দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সেরা নাগরিক আপনারা,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'সব কিছুকে খুব বড় করে দেখতে, খুব বড় করে চিন্তা করতে শিখেছেন। এটা ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ, মিসকিনের বা তলাহীন ঝুড়ির দেশ নয়। আপনাদের কাছে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার কি? একজোড়া পোলারিস সাবমেরিনের সমান? চাঁদে একজন লোককে পাঠাতে যে খরচ হয়, তার একটা কণা? আমেরিকার বোতল থেকে আমি যদি এক ফোঁটা মধু নিই, কেউ না খেয়ে মরবে না। কিন্তু আমাকে যদি ওই এক ফোঁটা নেয়ার অনুমতি না দেয়া হয়, আপনি এবং আপনার মেহমানরা মরবেন।

'তারপর ভাবুন, এই সামান্য টাকা না দিয়ে আর কি কি আপনারা হারাতে যাচ্ছেন। পাঁচশো মিলিয়ন ডলারকে দশ দিয়ে পূরণ করুন, একশো দিয়ে পূরণ করুন। সান রাফায়েলে আপনারা রিফাইনারি তৈরি করতে যাচ্ছেন, রিফাইন করার জন্যে আরব থেকে নাম মাত্র মূল্যে তেল পাবার আশা করছেন। সেই চুক্তিতে সই করার জন্যেই তো এসেছেন বাদশা আর প্রিন্স। কিন্তু ওঁরা যদি আমার হাতে মারা পড়েন, ভবিষ্যতে ওই চুক্তি কি আর হবে? আর, তেল বিনা আমেরিকা কি দুনিয়ার সেরা ধনী দেশ খুব বেশি দিন থাকতে পারবে?' প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার স্টিফেন বেকারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আপনি কি বলেন, মি. বেকার?'

এই প্রথম দেখা গেল স্টিফেন বেকারের হাত এবং চোখ সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে। উত্তরে তিনি এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেললেন না। তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, ডেভিড নিউসম। তিনি বললেন, 'ভবিষ্যৎ আমি আপনার দৃষ্টিতেই দেখছি!'

'ধন্যবাদ।'

বাদশা হাত তুললেন, 'আমার একটা কথা, যদি অনুমতি পাই।' প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং তা নিরঙ্কুশ করার জন্যে প্রায়ই যাঁকে নিকট আত্মীয়দের গর্দান নিতে হয়, জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং কঠিন সময় তাঁর কাছে নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়। হিংস্রতার মধ্যেই তাঁর জন্ম, হিংস্রতার মধ্যেই বেঁচে আছেন, এবং সম্ভবত হিংস্রতার শিকার হয়েই শেষ বিদায় নিতে হবে তাঁকে।

'অনুমতি দেয়া হলো।'

'শুধু অন্ধরা বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আমি অন্ধ নই। প্রেসিডেন্ট টাকা দেবেন।' এই উদার প্রস্তাব শুনে মন্তব্য করার মত কিছু পেলেন না প্রেসিডেন্ট। রাস্তার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে আছেন তিনি, যেন একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা তাঁর ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পাচ্ছেন, মক্কেলকে তা জানাতে চাইছেন না।

'ধন্যবাদ, ইওর হাইনেস।'

'অবশ্যই আপনাকে খুঁজে বের করে নির্দয় ভাবে গুলি করে মারা হবে, দুনিয়ার যেখানেই আপনি লুকান না কেন। এমন কি আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাকে খুনও করেন, আপনার মৃত্যু কালকের সূর্য ওঠার মতই নিশ্চিত হয়ে গেছে।'

'আমি বলেছি, প্রেসিডেন্টের পায়ে গুলি করব। কিন্তু আপনাকে, বাদশা মিঞা, আমার লোকেরা তাড়া করবে। একসময় আপনি কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তিন দিকের কোন দিকে আপনি যেতে পারবেন না, খোলা থাকবে শুধু ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ার পথটা। আবোলতাবোল না বকে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে থাকুন।' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আমার দাবির টাকা। দিতে রাজি তো? কারও কোন আপত্তি নেই? গুড। শুরুটা বেশ ভালই হলো।'

'শুরু?' প্রশ্নটা করলেন জেনারেল পীল। যে-কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেই তাঁর চোখে ফায়ারিং স্কোয়াড দেখতে পাবে। 'মানে?'

'শুরু মানে শুরু। যার শুরু আছে তার শেষও আছে, আমার দাবিরও শেষ আছে। আরও দুশো মিলিয়ন ডলার। এই টাকাটা চাইছি আমি গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্যে।'

এবারের নিস্তব্ধতা আগের মত দীর্ঘ হলো না। বিস্ময়ের আঘাতও কিছুটা কম লাগল। তার একটা কারণ এই যে মানুষের মনের গ্রহণ ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। রাস্তা থেকে চোখ তুলে ম্লান সুরে তিনি জানতে চাইলেন, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্যে দুশো মিলিয়ন ডলার মানে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব কম চেয়েছি। বলতে গেলে, পানির দর। এ-কথা সত্যি ব্রিজটা তৈরি করতে মাত্র চার কোটি ডলারের মত লেগেছিল। এখন বানাতে গেলে চল্লিশ কোটির কমে পারা যাবে না, অন্তত টেন্ডার ডাকলে এর কমে কোটেশন দেব না আমি। কিন্তু আমি চাইছি কত? মাত্র বিশ কোটি। একেবারে সস্তা নয়? টাকার কথা বাদ দিয়ে চিন্তা করুন, ব্রিজটাকে নতুন করে বানানো কি সাংঘাতিক ঝামেলার ব্যাপার হবে। চিন্তা করুন ধুলোর কথা, পরিবেশ দূষণের

কথা, বিকট আওয়াজের কথা। তারপর যোগাযোগ? ব্রিজ না থাকলে হাজার হাজার যানবাহন কিভাবে আসা-যাওয়া করবে? ইকনমি ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে না? ট্যুরিস্টরা সান ফ্রান্সিসকোয় কেন আসবে, গোল্ডেন গেট ব্রিজই নেই! বিখ্যাত হাসি ছাড়া মোনালিসা আর গোল্ডেন গেট ব্রিজ ছাড়া সান ফ্রান্সিসকো, একই কথা। যারা এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত, জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। লাভবান হবে শুধু ফেরী সার্ভিসগুলো, সুযোগ পেয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেবে ওরা। তাই বলছি, একদম পানির দর। আরে বাবা, আপনাদের কাছে দুশো মিলিয়ন ডলার আবার একটা টাকা নাকি! রাজি হয়ে যান।'

'আমরা যদি আপনার এই উদ্ভট প্রস্তাব মেনে না নিই,' জানতে চাইলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী, 'গোল্ডেন গেট ব্রিজ নিয়ে কি করবেন আপনি? তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বসাবেন?'

'উড়িয়ে দেব।'

'উড়িয়ে দেবেন! গোল্ডেন গেট ব্রিজ উড়িয়ে দেবেন!' মেয়র মাইক সিলভার, যিনি কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হতে জানেন না, প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। কেউ কিছু বোঝার আগেই বাঘের মত ঝাঁপ দিলেন কবীর চৌধুরীকে লক্ষ করে।

দশ কোটির ওপর টিভি দর্শক দেখল, নিজের চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল কবীর চৌধুরী। তার মাথাটা রাস্তার সাথে ঠকাস করে ঠুকে গেল। প্রচণ্ড রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন মেয়র। আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কবীর চৌধুরীর ওপর। এক পা সামনে এগিয়ে তার মাথায় মেশিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল রস পেরট। পরমুহূর্তে বন করে আধ পাক ঘুরে বসে থাকা জিম্মিদের দিকে ফিরল সে। 'খবরদার! কেউ নড়বেন না!' যদিও, নড়ছিল না কেউই।

আবার নিজের চেয়ারে উঠে বসতে বিশ সেকেন্ড সময় নিল কবীর চৌধুরী। শিষ্যরা তার নাকের রক্ত মুছিয়ে দিল। ঠাণ্ডা পানি দিল ফুলে ওঠা মাথায়। ডাক্তার মেয়রকে নিয়ে ব্যস্ত। কবীর চৌধুরী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম বুঝছেন, ডাক্তার?'

আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখ তুলল, 'ঠিক হয়ে যাবেন। মাথার পিছনটা ফুলে গেছে, তবে খুলির চামড়া ছেঁড়েনি।' পেরটের দিকে একবার তাকাল। 'আপনার সাগরেদ মেপে মেরেছে, আশ্চর্য হাতের আন্দাজ।'

'প্র্যাকটিস,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল কবীর চৌধুরী। 'মেয়র তাঁর নিজের শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।'

'ভদ্রলোককে নিয়ে কি করব আমি, চীফ?'

'ওকে আর বিরক্ত কোরো না। এটা তাঁর শহর, তাঁর ব্রিজ। আমারই দোষ—তাঁর অহংকারে পা দিয়ে ফেলেছি।' মেয়রের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। 'অন সেকেন্ড থট ভদ্রলোককে বরং হাত কড়া পরিয়ে দাও। আমি চাই না পরের বার আমার ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করুক।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল পীল। তাঁর দিকে মেশিন-পিস্তল

ডাক করল পেরট, কিন্তু সেদিক তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কবীর চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি চীফ অভ স্টাফ হতে পারি, কিন্তু আমি একজন আর্মি ইঞ্জিনিয়ার। তার মানে, বিস্ফোরক সম্পর্কে জানি। গোল্ডেন গেট ব্রিজ বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ওই টাওয়ারগুলো ফেলতে এক ওয়াগন বিস্ফোরক লাগবে। এখানে তা নেই।'

'নেই, দরকারও নেই।' হাত বাড়িয়ে মোটা ক্যানভাস স্ট্র্যাপ দেখাল কবীর চৌধুরী, যেটার ভেতর থেকে মোচা আকৃতির কি যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। 'দেখলেই চিনতে পারবেন। আপনি যখন এক্সপার্ট।'

স্ট্র্যাপের দিকে তাকালেন জেনারেল পীল। মুখ তুলে কবীর চৌধুরীকে দেখলেন। তারপর তাকালেন বসে থাকা বন্ধু-বান্ধবদের দিকে। সবশেষে আবার ফিরলেন স্ট্র্যাপটার দিকে।

কবীর চৌধুরী বলল, 'কেন জানি না, আমার মুখ ব্যথা করছে। আপনিই ওদেরকে বলুন।'

একটা বিশাল টাওয়ারের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল পীল, সেটা থেকে ঝুলে পড়া কেব্‌লগুলোও দেখলেন। তারপর কবীর চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছেন?' মাথা ঝাঁকাল পাগল বৈজ্ঞানিক। 'নিশ্চয়ই সাফল্যের সাথে—তা না হলে এখানে আপনাকে দেখা যেত না।' আবার মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী।

ধীরে ধীরে বন্ধু আর রিপোর্টারদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল পীল। 'আমারই ভুল হয়েছিল। এখন বিশ্বাস করি, মি. চৌধুরী ব্রিজটাকে ধ্বংস করতে পারবেন। ক্যানভাস স্ট্র্যাপের ভেতর মোচার যে আকৃতিগুলো দেখছেন, ওগুলোর ভেতর টি-এন-টি অ্যামাটল আছে। মোচাগুলোকে বলা হয় বি-হাইভস। এক হন্দর বিস্ফোরকসহ একটা স্ট্র্যাপ সাসপেনশন কেব্‌লে বেঁধে দেয়া হবে, সম্ভবত টাওয়ারের মাথার কাছাকাছি।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। 'আমার ধারণা, এগুলো আপনার কাছে চারটে আছে।' মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। 'এবং চারটে একসাথে ফায়ার করার ব্যবস্থা করেছেন?' বন্ধুদের দিকে ফিরলেন আবার। 'হ্যাঁ, গোল্ডেন গেট ব্রিজ ধ্বংস করা মি. চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব।' আবার কবীর চৌধুরীর দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ওগুলো একসাথে ফাটবে কিভাবে?'

'রেডিও ওয়েভ একটা সেলকে অ্যাকটিভেট করবে। মার্কারি ফালমিনেট ডিটোনেটরের অয়্যারকে ওই সেল পোড়াবে। একটা বিস্ফোরণই যথেষ্ট, বাকিগুলো বিস্ফোরিত হবে সিমপ্যাথেটিক ডিটোনেশনের সাহায্যে।'

ভারী গলায় সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী জানতে চাইলেন, 'আশা করি এটাই আপনার শেষ দাবি ছিল?'

'শেষ? দুঃখিত, না।' মাথা ঝাঁকিয়ে মাফ চাওয়ার একটা ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরী। 'আর মাত্র দুটো দাবি আছে আমার।'

'আরও দুটো!' ট্রেজারী সেক্রেটারি আঁতকে উঠলেন।

'এর আগে কয়েকটা কাজে আমি ব্যর্থ হয়েছি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যর্থতার খেসারতও আমাকে দিতে হয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার

ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। ওই টাকাটা আমি ফেরত চাই। সুদ সহ। সুদ ধরছি, শতকরা একশো ভাগ। অর্থাৎ একশো মিলিয়ন ডলার দিতে হবে আমাকে। এটা আমার সবচেয়ে ন্যায্য দাবি। টাকাটা আপনাদের নয়, আমার। সেটা আপনারা এতদিন খাটিয়েছেন। খাটিয়ে লাভ করেছেন মেলা, তবু লাভের সবটুকু আমি চাইছি না। মোট একশো মিলিয়ন দিলেই আমি খুশি।'

সবাই চুপ।

'আমার পাঁচ নম্বর এবং শেষ দাবি। এটা একটা সামান্য ব্যাপার। বলতে পারেন, আপনাদের হাতের ময়লা মাত্র—পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।'

'এটা কি বাবদে?' ট্রেজারী সেক্রেটারির দুইপাটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস হিস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

'আমার খরচপাতি বাবদ,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আপনার যা স্ট্যান্ডার্ড, খুব কমই চেয়েছেন!' বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি হাসব না কাঁদব, কিছুই বুঝতে পারছি না!' ট্রেজারী সেক্রেটারি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—দু'বার।

'এখন যদি দয়া করে আপনারা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, আমি বাধিত হব। টাকা আমি পাচ্ছি তো?'

সবাই চুপ।

'নিউ ইয়র্কে আমার এক বন্ধু আছে, তার সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে আমাকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'নির্দিষ্ট কয়েকটা ইউরোপিয়ান ব্যাংকে তার কিছু লোক আছে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'এখন দুপুর, তার মানে সেন্ট্রাল ইউরোপে আট কি নয়টা বাজে— কিন্তু ওখানে সন্ধে ছ'টার মধ্যে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই কাল সকাল সাতটার মধ্যেই আপনারা যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন আমাকে, বাধিত হব।'

'কিসের সিদ্ধান্ত?' সাবধানে জানতে চাইলেন সেক্রেটরি অভ ট্রেজারী।

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে কিনা অর্থাৎ টাকাটা আমি পাব কিনা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সোয়া আটশো মিলিয়ন ডলার, খুব কম টাকা বলতে পারি না। সেটার ধরন, আকৃতি, আকার ইত্যাদি কি রকম হবে, জানাবেন না? বাজারে চলে এই রকম যে কোন কারেন্সি হলেই চলবে। টাকায় চিহ্ন দেয়া থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর কবীর চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'আপনারা সবাই যদি এই রকম শোকে কাতর হয়ে পড়েন তাহলে চলবে কি করে! একেবারে যেন পাথর হয়ে গেছেন! হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মত চিৎকার জুড়ুন তা বলছি না, কিন্তু তীক্ষ্ণ দু'একটা প্রশ্নও তো করতে পারেন!'

সবাই তাকিয়ে থাকল শুধু। কেউ এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। অগ্নিদৃষ্টির যদি কোন তাপ থাকত, এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেত কবীর চৌধুরী।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এল পাগল বৈজ্ঞানিক, 'আমার নিউ ইয়র্কের বন্ধু আমাদেরকে যখন জানাবে যে হ্যাঁ, টাকাগুলো তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে

পৌঁচেছে—পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়, তার মানে ওই দিনই দুপুরে পৌঁছে যাবে—শুধু তখনই আমরা বিদায় নেব। জিম্মিরা অবশ্য আমাদের সাথেই যাবেন।'

'আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন?' জানতে চাইলেন জেনারেল পীল।

'আপনি খুব বিপজ্জনক মানুষ, কাজেই আপনাকে আমরা কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না। প্রেসিডেন্ট আর তাঁর তিন মেহমান, ব্যস, বেশি ভিড় বাড়াতে চাই না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, ক্যারিবিয়ানে আমার এক বন্ধু আছে—একটা স্বাধীন দ্বীপের আজীবন প্রেসিডেন্ট তিনি। দ্বীপটা স্বাধীন একটা দেশ, কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করে না ওরা। ওই দেশের প্রেসিডেন্ট আমাদের খাতির যত্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রতি রাতের জন্যে দশ লাখ ডলার করে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরী থামতে এবারও কেউ কোন মন্তব্য করল না।

'একটা কথা বলা হয়নি,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'পরশু দিন থেকে শুরু হবে ফাইন ধরা। এই জরিমানা হবে ঘণ্টা হিসেবে। প্রতি ঘণ্টায় দুই মিলিয়ন ডলার।'

'সারা দুনিয়ায় আপনার সময়ই বোধহয় সবচেয়ে বেশি দামী?' দাঁতে দাঁত চেপে, চাপা গলায় জানতে চাইলেন ট্রেজারী সেক্রেটারি।

'যার সময়, দামটা তাকেই ঠিক করতে হয়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনাদের কাছ থেকে টাকাটা আমি পেলে প্রমাণ হয়ে যাবে, আমার সময় সত্যি ওরকম দামী কিনা। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

'আছে,' বললেন জেনারেল পীল। 'ওই দ্বীপে কিভাবে আপনি যেতে চান?'

'কিভাবে আবার, প্লেনে করে যাব। হেলিকপ্টারে চড়ে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যেতে লাগবে দশ মিনিট, ওখানে পৌঁছে প্লেনে চড়ব।'

'সব ব্যবস্থা তাহলে করা আছে? আপনাদের প্লেন অপেক্ষা করছে ওখানে?'

'প্লেন অবশ্যই অপেক্ষা করছে। তবে, প্লেনটা সে-কথা জানে না।'

'কি প্লেন?'

'এয়ারফোর্স ওয়ান। আপনাদের মহামান্য প্রেসিডেন্টের বাহন।'

জেনারেল পীলের মত অটল ব্যক্তিত্বও থতমত খেয়ে গেলেন। 'আপনি বলতে চাইছেন, প্রেসিডেনশিয়াল বোয়িং হাইজ্যাক করবেন?'

'আপনি কি আশা করেছিলেন প্রেসিডেন্টকে আমি ডিসি-থ্রীতে করে নিয়ে যাব? উনি আমার মেহমান হয়ে যাবেন, ওনার আরাম-আয়েশের দিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে না? তারপর ওনাকে নিয়ে আমরা যখন আবার এই দেশের মাটিতে ফিরে আসব…'

'আমরা মানে?'

'প্রেসিডেন্ট, আমি এবং আমার দলবল।'

'আবার আপনারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা ফেলার স্পর্ধা দেখাবেন?'

'অবশ্যই।'

'সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? আইনের ভয় নেই?' জানতে চাইলেন সেক্রেটারি

অভ স্টেট।

'আপনি আমাকে নিরাশ করলেন,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সুপ্রীম কোর্ট আর অ্যাটর্নি জেনারেলই শুধু আইন আর শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জানে, এটা আমি আশা করিনি।' এদিক ওদিক তাকাল সে, যেন কারও কাছ থেকে এক-আধটা মন্তব্য আশা করছে। কিন্তু সবাই মুখে তালা এঁটে বসে আছেন। অগত্যা তাকেই আবার বলতে হলো, 'এই দেশের আইন বলে, একবার যদি কারও ওপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে তাকে ক্ষমা করা হয়, পরে আবার তাকে ওই একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না বা ক্ষমা প্রত্যাহার করা যাবে না।'

কথাগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে দশ সেকেন্ডের ওপর লেগে গেল। তারপর বিস্ফোরিত হলেন জেনারেল পীল। 'হোয়াট!'

দেশের জন্যে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবেন ঘোষণা করে যে ক'জন ভোটারকে দলে টেনেছিলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর এবারের আচরণে তাদের অর্ধেককে হারালেন তিনি।

'ব্যাটা বদমাশ!' প্রচণ্ড রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'ইতর! নিঃশর্ত ক্ষমা চায়! উজবুক কাঁহিকা। ভেবেছিস...'

ডাক্তারকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'হার্ট অ্যাটাক হলে, চিকিৎসা করার যন্ত্রপাতি সব রেডি তো? কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট?'

ডাক্তারকে গম্ভীর দেখাল। 'এ নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

প্রেসিডেন্ট ঘেমে উঠেছেন। 'শয়তানের চেলা! মড়াখেকো শকুন! যদি ভেবে থাকিস...'

তাড়াতাড়ি প্রেসিডেন্টের পাশে চলে এসে তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে পড়লেন জেনারেল পীল, বিড়বিড় করে বললেন, 'স্যার, আপনি টিভিতে রয়েছেন!'

মাঝপথে থেমে গিয়ে বোবা দৃষ্টিতে জেনারেলের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড ধ্যান করে নিয়ে নতুন সুরে শুরু করলেন, 'আমি, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার চীফ একজিকিউটিভ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই হীন ব্ল্যাকমেইল, এই জঘন্য অন্যায় আবদার আমি কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে রাজি নই। আমেরিকার জনগণ এটা মেনে নেবে না। গণতন্ত্র এটা মেনে নেবে না। পরিণতি যাই হোক না কেন, আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাব...'

'কিভাবে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

উত্তর দেবার জন্যে দু'সেকেন্ড চিন্তা করলেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু মাথায় কোন উত্তর গজাল না। তবু বললেন, 'ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সীগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে, সশস্ত্র বাহিনী তার সবটুকু ওজন নিয়ে, আমাদের জনগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মহান চেতনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে...'

'কোথায়? কার ওপর?'

'তার আগে আমার কেবিনেটের সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসব আমি...'

'ওসব ধানাইপানাই বাদ দিন। গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করার অনুমতি আপনাকে দেয়া হবে না। নিঃশর্ত ক্ষমা। তা না হলে ওই দ্বীপে আপনার নির্বাসন

প্রলম্বিত হবে। বলে রাখা ভাল, এটা কিন্তু সশ্রম নির্বাসন। ওখানে আপনাকে খেতে কাজ করে নিজের খাবার যোগাড় করতে হবে। বসে বসে খাবেন, সেটি হবে না।' বাদশার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'বাদশা মিঞার বয়স হয়েছে, কিন্তু আমি দুঃখিত, তাঁকেও খেটে খেতে হবে। জঙ্গলে গিয়ে রোজ গাছ কাটতে হবে তাঁকে।'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আপাতত।' কবীর চৌধুরী ইশারা করে ক্যামেরাম্যানকে জানাল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

'আমি কি বাদশা, প্রিন্স, আমার কলিগ আর পুলিস চীফের সাথে দুটো কথা বলতে পারি?'

'তাতে যদি সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে বলে মনে করেন, পারেন।'

'গোপনে?'

'বেশ।'

'আমার কোচে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা ছাড়া কেউ সেখানে থাকবে না।'

'বাইরে গার্ড থাকবে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কোচটা তো সাউন্ডপ্রুফ।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর লোকজন নিয়ে কোচে গিয়ে উঠলেন। এক সেকেন্ড পর হাত-ইশারায় বেডলারকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী। জানতে চাইল, 'প্রেসিডেনশিয়াল কোচে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করেছ তো?'

'জী।'

'ওরা গোপন আলোচনায় বসছে। তোমার একটু বিশ্রাম দরকার না? যাও না, আমাদের কোচে গিয়ে একটু জিরিয়ে নাও।'

'এই যাচ্ছি, স্যার।' হন হন করে এগোল বেডলার। কবীর চৌধুরীর কোচে উঠে ড্রাইভারের সীটে বসল সে। কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিয়ে কানে তুলল এয়ার-ফোন। প্রতিটি আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, সন্তুষ্ট হয়ে আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। চালু হয়ে গেল টেপ রেকর্ডার।

'এই বীরপুরুষ সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল জুলি।

'কবীর চৌধুরী সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে আমি বীরপুরুষ বলি না।'

'কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রলোকের বুকের পাটা আছে...'

'দেখতে পাচ্ছ না, আমি চিন্তা করছি? সকালে কি বলেছিলাম, মনে নেই? আমাকে খামচাবে না, আর কথা একটু কম বলবে।'

জুলি গুম হয়ে গেল।

খানিক পর রানা বলল, 'হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' সবুজ চোখ তুলে তাকাল জুলি।

'চিন্তা করে ঠিক করে ফেলেছি, কি করব।'

রানার হাতটা খামচে ধরেই ছেড়ে দিল জুলি। 'আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি

না!'

'তাহলে জিজ্ঞেস করি, কখনও অসুস্থ হয়েছ তুমি?'

'কেন হব না। মাঝেমধ্যে সবাই হয়।'

'গুরুতর অসুস্থ? হাসপাতালে যেতে হয়েছিল?'

'না। তা যেতে হয়নি।'

'খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অবশ্য এখনও যদি সাহায্য করার ইচ্ছে তোমার থাকে, তবেই।'

'তুমি যদি বলো, যাব। বলেছি তো, যে-কোন ঝুঁকি নেব আমি। শর্ত একটাই, আমার সমস্ত ভয় তুমি ভেঙে দেবে।'

'আমার সাথে একা কোথাও যাবার ভয়, সেটাও? আমার সাথে আমার অ্যাপার্টমেন্টে, ডিনারের পর, মানে···সেটাও কি?'

'তুমি একটা স্বার্থপর!'

'কাজের কথা। জানো তো, তুমি যদি ধরা পড়ে যাও, কবীর চৌধুরী তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করবে। কথা বলাবার অনেক উপায় জানা আছে তার। খুব কষ্ট পাবে তুমি।'

'যদি সব কথা গড় গড় করে বলে দিই?'

'আমি তাহলে ফেঁসে যাব।'

'তাতে আমার কি!' চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল জুলির, অন্তত তাই মনে হলো রানার। তারপর ভাবল, চোখের ভুল।

'ভেবে দেখো।'

'কিন্তু ধরা আমি পড়ব কেন?' জানতে চাইল জুলি। 'কি করতে গিয়ে ধরা পড়ব?'

'আমার একটা চিঠি ডেলিভারি দিতে গিয়ে,' বলল রানা। 'কয়েক মিনিট আমাকে একটু একা থাকতে দেবে, প্লীজ।'

ক্যামেরা রেডি করে কিছু স্টীল শট নিল রানা। কোচ, হেলিকপ্টার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান এবং প্রহরী, কিছুই বাদ দিল না। বেশিরভাগ ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ার আর সান ফ্রান্সিসকোর আকাশ রেখা ধরে রাখার চেষ্টা করল ও। তারপর ক্যামেরা ফেরাল অ্যাম্বুলেন্স আর ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর বলে মনে হলেও, আসলে যে রসিক সেটা তার কথা শুনে বোঝা গেল। রানাকে বলল সে, 'ও, বুঝেছি, আমাকে বিখ্যাত করার মতলব।'

হেসে ফেলল রানা। 'ষড়যন্ত্র বলেননি, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'আমি কবীর চৌধুরী নই,' বলল ডাক্তার। 'লোকটা দারুণ সন্দেহপ্রবণ। আমাকে দু'বার শাসিয়ে গেছে। বলেছে, তার বিরুদ্ধে কেউ কোন ষড়যন্ত্র করলে ব্রিজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

ছবি তোলা শেষ করে রানা জানতে চাইল, 'গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কোন মন্তব্য আছে?'

'কোন্ কাগজে ছাপা হবে?'

'লন্ডনের দ্য নিউজে।'

'আমার একটাই মন্তব্য—সুযোগ পেলে এই শয়তানের হাত থেকে প্রেসিডেন্টকে অন্তত বাঁচাব আমি।'

'শুধু প্রেসিডেন্টকে?'

হেসে ফেলল ডাক্তার। 'আসলে ওটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, অক্ষম আশা। জানি, কাউকে বাঁচাবার সুযোগ পেলেও সেটা ব্যবহার করার মত বুদ্ধি বা সাহস আমার নেই।'

'আমি জানতে চাইছিলাম…'

'প্রেসিডেন্টের কথা বললাম এই জন্যে যে আমরা একই রাজ্যে জন্মেছি. ভোটও দিয়েছি তাঁকে।'

'আপনি তাহলে তাঁকে সাহায্য করতে চান?' নোটবুকে খস খস করে উত্তর লিখছে রানা। 'সুযোগ পেলে করবেন?'

'বললাম তো, অত সাহস আমার নেই।'

'হয়তো আছে, জানেন না। কিংবা সুযোগ এলে তখন সাহসও হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'কি জানি!'

'যদি বলি, প্রেসিডেন্ট নয়, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমি প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করব, তাহলে?'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার। 'কি বললেন?'

'যদি একই পথের পথিক হতে চান, তাহলে আরও আলোচনা হতে পারে।'

'আপনার পরিচয়? যোগ্যতা?'

'ইউনাকোর নাম শুনেছেন?'

'না।'

'আমি একজন এজেন্ট,' বলল রানা। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনের সাথে জড়িত।'

'পরিচয়পত্র আছে?'

'বোকার মত হয়ে গেল না প্রশ্নটা? সিক্রেট এজেন্টরা সাথে কার্ড রাখে না।'

'আপনি এশিয়ান?'

'বাংলাদেশী।'

আরও একশো একটা প্রশ্ন করল ডাক্তার। বিরক্ত না হয়ে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল রানা।

'ধরে নিন,' সবশেষে বলল ডাক্তার, 'আছি আপনার সাথে। কিন্তু কি করতে চান শুনি?'

'একজন মহিলা ফটোগ্রাফার আছেন, জুলি…'

'আর বলতে হবে না, সবুজ চোখ তো? যাকে দেখলেই বুকে চোট লাগে…'

'আমি চাই,' বলল রানা, 'আমার একটা মেসেজ নিয়ে শহরে যাবে ও। দু'ঘণ্টার মধ্যে উত্তর নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে ওকে। মেসেজটা কোড করা হবে, সেটার ছবি তোলা হবে, তারপর স্পুলটা দেয়া হবে আপনাকে। একটা সিগারেটের অর্ধেক, আপনার কোন একটা টিউব বা কার্টুনে লুকিয়ে রাখতে কোন

অসুবিধে হবে না। শহরে যাবার সময় ওই কার্টুন বা টিউবটাও সাথে রাখবেন আপনি। আপনি একজন ডাক্তার, সহজে কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না।'

'শুনতে খুব সহজই লাগছে...'

'আসলেও তাই, যদি সাহস থাকে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুই সেক্রেটারি আর পুলিস চীফ ব্রিজ থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। ইতিমধ্যে, আমি আশা করছি, এফ.বি.আই.চীফ আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর সাহায্য আমার একান্ত দরকার হবে।'

চারদিকে তাকাল ডাক্তার। ওদেরকে বিশেষ ভাবে কেউ লক্ষ্য করছে না।

'মেডিকেল কিট, হার্ট ইউনিট, অক্সিজেন কিট ছাড়া আরও সফিসটিকেটেড কিছু আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

'তার মানে রেডিয়োলজিকাল গিয়ার কিংবা ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেটিভ ইকুইপমেন্ট নেই, এবং বোধহয় অপারেশন করার সুযোগেরও অভাব রয়েছে। কাজেই, মিস জুলি অসুস্থ হয়ে পড়লেই আপনি ডাক্তার হিসেবে পরামর্শ দিয়ে বলবেন, এই মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। রোগটা কি হবে, আপনি জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।'

'কিন্তু রোগের লক্ষণ থাকতে হবে না? চৌধুরীকে খবর দেবার আগে অন্তত পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় চাই আমি। সুন্দরীকে একটা ইঞ্জেকশন দেব।'

একটু চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'ওর সব কিছুতেই বড় ভয়। ব্যথা পাবে শুনলে যদি বেঁকে বসে তবেই হয়েছে। দেখি।'

জুলির কাছে ফিরে এল ও। ডাক্তার সাহায্য করতে রাজি হয়েছে শুনে জুলির প্রথম প্রশ্ন হলো, 'কার জন্যে রাজি হলো? তোমার, না আমার জন্যে?'

'মানে?'

'পুরুষমানুষের চোখ দেখলেই বলে দিতে পারি কি চায়,' ফিসফিস করে বলল জুলি। 'আমাকে দেখে এমন বেহায়ার মত তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক...'

'উনি একজন ডাক্তার, নিখুঁত একটা শরীর দেখলে তাকিয়ে তো থাকবেনই। তুমি সুন্দরী, সেটা তাঁর দোষ নয়।'

'কথার রাজা, সন্দেহ নেই। এই, তোমার জন্যে আমি কি একটা মিনি ট্র্যানসিভার রেডিও আনব?'

'এই তো, বুদ্ধি খুলছে। কিন্তু না, ওটা আমার ক্যামেরার তলার দিকে লুকানো আছে। কিন্তু ভিলেনের কোচের মাথায় ওই চাকতিটা ঘুরতে দেখেছ? জানো ওটা কি? অটোমেটিক রেডিও-ওয়েভ স্ক্যানার। আমার সেট চালু হবার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে টের পেয়ে যাবে ওরা। এবার, মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে।'

রানার বলা শেষ হতে জুলি মাথা দুলিয়ে বলল, 'বুঝলাম। সব ঠিকই আছে, পারব। কিন্তু ইঞ্জেকশনটা কি না নিলেই নয়?'

'বেয়নেট বা পেরেক নয় সামান্য একটা সূঁচ, খুব লাগবে না।'

'ডাক্তারের বদলে ইঞ্জেকশনটা তুমি আমাকে পুশ করতে পারো না?'

'সেটা অন্যায় হবে। যার কাজ তাকেই করতে দেয়া উচিত। তাছাড়া, ব্যথা

পাও এমন কিছু তোমার শরীরে আমি ঢোকাতে পারব না। ওটি আমাকে মাফ করতে হবে।'

রানার কথার গভীর কোন অর্থ আছে কিনা বোঝার জন্যে চোখ কুঁচকে উঠল জুলির। কিন্তু সুযোগটা না দিয়ে ওখান থেকে সরে এল রানা।

অলস পায়ে প্রেস কোচের দিকে এগোল ও। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ভেতর বিতর্কের ঝড় উঠেছে, বোঝা গেল কাঁচের ওদিকে কর্মকর্তাদের হাত আর মুখ নাড়ার বহর দেখে। তাঁরা যে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না, সেটাও পরিষ্কার। রিয়্যার কোচে রয়েছে বেডলার আর কবীর চৌধুরী। দেখে মনে হলো, দু'জনেই ঢুলছে। সদ্য আঁকা রেখা দুটোর ভেতর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র প্রহরীরা। নিউজ মিডিয়ার লোকজন ভিড় করে আছে এখানে সেখানে। প্রেস কোচে উঠে পড়ল রানা। খালি, কেউ নেই। নিজের সীটে বসে ক্যামেরা নামিয়ে রাখল ও। ব্যাগ থেকে প্যাড আর ফেল্ট পেন বের করে লেখার কাজ শুরু করল। কোড-বুক নেই, কিন্তু তাতে ওর কোন অসুবিধে হলো না। সব মুখস্থ আছে। এই কোডের পাঠোদ্ধার করা যুক্তরাষ্ট্রে শুধু দু'জনের পক্ষে সম্ভব। একজন এফ.বি.আই.চীফ। অপরজন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

আট

এফ.বি.আই.চীফ জেনারেল ফিদার হোপ ছোটখাট মানুষ, বয়স ষাটের ওপর। তিনি কথা বলেন কম, চিন্তা করেন বেশি। ঘটনাটার প্রাথমিক রিপোর্ট পাবার পর সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। এফ.বি.আই. প্রেসিডেন্ট এবং সম্মানীয় মেহমানদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, কথাটা তিনি অকপটে স্বীকার করলেন। এবং সেই সাথে প্রস্তাব দিলেন পদত্যাগের। টেলিফোনে প্রস্তাবটা পৌঁছে গেল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ডের কাছে। ল্যাংফোর্ড এক কথায় পদত্যাগ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অগত্যা জরুরী মীটিঙে যোগ দিতে হয়েছে জেনারেল ফিদার হোপকে। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন তিনি, আলোচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করছেন না।

জরুরী বৈঠকে আরও একজন ব্যক্তিত্ব অংশ নিচ্ছেন। তিনি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বৃদ্ধ হয়েছেন ভদ্রলোক, কিন্তু শরীরটাকে এখনও ভেঙে পড়তে দেননি। দেখতে ঠিক যেন দুর্ধর্ষ এক কাউবয়, কাপড়চোপড়ও পরেন রঙচঙে। তারুণ্য যেন এখনও তাঁকে ত্যাগ করে যায়নি।

অ্যাডমিরাল সোরেনসন আর জেনারেল গারল্যান্ড, দু'জনই তাঁর বন্ধু মানুষ। তাঁরা দু'জনেই লম্বা, কিন্তু একজন মোটা, অপরজন রোগা। জেনারেল গারল্যান্ড মোটা হবার কারণ, খাওয়াদাওয়ার প্রতি তাঁর অতিশয় দুর্বলতা।

প্রস্তাবগুলো শুনে মুখ বাঁকা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, বললেন, 'এসবে কাজ হবে না। তোমরাও তা জানো।'

'এই পরিস্থিতিতে আমরা অসহায়, জর্জ,' অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'আমি বা জেনারেল, আমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের লোক, যা এখানে কাজে লাগবে না। তোমার কোন প্রস্তাব থাকলে বলো শুনি।'

'আমি তো এইমাত্র এলাম। এই মুহূর্তে কিছু করবার কথা ভাবছ তোমরা?'

জেনারেল গারল্যান্ডকে অসহায় দেখাল। মুহূর্তের জন্যে বাদাম চিবানো বন্ধ করে তিনি বললেন, 'না। আমরা ভাইস-প্রেসিডেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর জন্যেও।'

'ওরা যদি ছাড়া পায়।'

'জেনারেল ফিদার হোপের ধারণা কবীর চৌধুরী ওকে ছেড়ে দেবে,' বললেন গারল্যান্ড। যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে পাঠানো রানার মেসেজটা তুলে নিলেন তিনি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'দেখো তো, এই মেসেজটার ওপর কতটুকু ভরসা রাখা যায়?'

মেসেজটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন হ্যামিলটন।

'প্লীজ, অপেক্ষা করুন। কোন রকম সরাসরি অ্যাকশন নেবেন না। কোন রকম ভায়োলেন্স নয়, আই রিপিট, কোন রকম ভায়োলেন্স নয়। পরিস্থিতিটা আমাকে বুঝতে দিন। ট্র্যানসিভার ব্যবহার করতে পারছি না। আজ বিকেলে আবার যোগাযোগ করব। মাসুদ রানা।'

'মাই গড!' আনন্দে একরকম লাফিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রানা ওখানে!'

'কে এই মাসুদ রানা, জর্জ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।

'অদ্ভুত এক যুবক,' পাইপে আগুন ধরিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'স্বাধীনচেতা, তীক্ষ্ণধী, সুবিবেচক, সতর্ক, অ্যাকটিভ, মেজাজী, নিষ্ঠুর, কর্তৃত্ব মানতে চায় না—বলতে পারো আমারই নবীন সংস্করণ।'

'খুব একটা উৎসাহ বোধ করার মত নয়, কি বলো? মাথা গরম একটা ছোকরা এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারবে? দরকার ঠাণ্ডা মাথার…'

জেনারেল গারল্যান্ডকে থামিয়ে দিয়ে হ্যামিলটন বললেন, 'রানা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তেজী বটে, কিন্তু ওর মত ঠাণ্ডা হওয়াও আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে ভুলে গেছি, ও একটা সত্যিকার প্রতিভা। সবচেয়ে বড় যে গুণ, কোন কাজকে অসম্ভব বলে মনে করে না।'

'কবীর চৌধুরীকে সামলাতে পারবে, সে-যোগ্যতা কি তার আছে?' অবশেষে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।

'এর আগে প্রতিবার তো রানাই ওকে কোণঠাসা করেছে।'

'কিন্তু আজ বিকেলে যোগাযোগ করবে কিভাবে?'

'জানি না,' বললেন হ্যামিলটন। 'পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একবার তো পেরেছে, তাই না?'

প্রেসিডেনশিয়াল আর রিয়্যার কোচের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে

পায়চারি করছে কবীর চৌধুরী। উত্তেজিত বা অস্থির নয়, সম্পূর্ণ শান্ত সে। পায়চারি থামিয়ে হাতঘড়ি দেখল একবার। তারপর এগোল প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজার দিকে।

দরজা খুলে কোচে উঠল সে। তাকে দেখে বন্দীরা সবাই চুপ হয়ে গেলেন।

'সিদ্ধান্ত হলো?' জানতে চাইল সে। কেউ কথা বললেন না। 'তার মানে কি আপনারা সবাই স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে চাইছেন?'

জিন আর মার্টিনি ভরা লম্বা গ্লাসটা ধীরে ধীরে সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'সিদ্ধান্ত নিতে আরও সময় লাগবে আমাদের।'

'যত খুশি সময় নিন,' সহাস্যে বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু জরিমানার কথাটা আবার ভুলে যাবেন না। ঘণ্টায় বিশ লাখ ডলার।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'শুনতে আপত্তি নেই।'

'জিম্মি হিসেবে আমি থাকলাম, বাদশা আর প্রিন্সকে ছেড়ে দেয়া হোক...'

হাত তুলে বাধা দিল কবীর চৌধুরী। 'থাক, থাক, আর শুনতে চাই না।' দুই সেক্রেটারির দিকে ফিরল সে। তারপর তাকাল পুলিস চীফের দিকে। 'আপনারা বিদায় হোন।' বলে কোচ থেকে নেমে এল সে।

কবীর চৌধুরীর পিছু পিছু বাকি তিনজনও নেমে এলেন। তাঁদের চলে যাওয়াটা প্রেসিডেন্ট চাক্ষুষ করলেন না, পানীয় ভরা গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন দেখছেন তিনি।

কোচ থেকে নেমে এসে পেরটের সাথে কথা বলল কবীর চৌধুরী। 'টিভি ভ্যান আর ক্রুদের আবার এদিকে নিয়ে এসো। টিভি কোম্পানিগুলোকেও খবর দাও।'

'ঠিক আছে, চীফ,' বলল পেরট। 'আপনি...?'

'এদেরকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।'

'আপনি কেন যাবেন, চীফ? আরও তো লোক আছে।'

'তা নয়। ব্যারিয়ার তৈরির কাজ কতটুকু এগোল দেখে আসতে চাই। হাঁটা থেকে রেহাই পাব, এই আর কি।'

পুলিস কারে উঠল ওরা।

প্রেস কোচে এখনও একা রয়েছে রানা। পুলিস কার নিয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল ও, তারপর আবার মনোযোগ দিল হাঁটুর ওপর পড়ে থাকা তিন প্রস্থ নোটপেপারের দিকে। পোস্টকার্ডের চেয়ে আকারে একটু ছোট হবে কাগজগুলো, তিনটেই ঝরঝরে লেখায় ভরাট, অক্ষরগুলো খুদে, ভাষাটা দুর্বোধ্য। ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে প্রতিটি কাগজের তিনটে করে ছবি তুলল ও। তারপর এক এক করে তিনটে কাগজই পুড়িয়ে ফেলল। ছাইদানীতে ফেলে আঙুল দিয়ে একটু নাড়তেই গুঁড়িয়ে গেল কালো ছাই। এবার ক্যামেরা থেকে স্পুল বের করে ওটাকে সীল করল রানা, খুব পাতলা লীড ফয়েল দিয়ে মুড়ল। ডাক্তারকে যেমন বলেছে, আকারে আধখানা সিগারেটের চেয়ে বড় হলো না।

ক্যামেরা রিলোড করে বাইরে বেরিয়ে এল ও। কি হয় না হয় এই রকম একটা

ভাব চারদিকে। একজন রিপোর্টারকে কাছে ডেকে ব্যাপারটা কি জানতে চাইল ও।

'মি. চৌধুরী এইমাত্র আবার টেলিভিশন ভ্যান আনতে লোক পাঠিয়েছেন।'

'কেন জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিপোর্টার। 'কি করে বলব!'

এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে এক ডজন ছবি তুলল রানা। এক সময় দেখা গেল অ্যাম্বুলেন্সের কাছে চলে এসেছে ও। অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার। নিজের পকেট হাতড়াল রানা, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, ডাক্তার, আপনার কাছে সিগারেট হবে নাকি?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রানাকে দিল ডাক্তার।

'আগুন?'

পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল ডাক্তার, মুখে সিগারেট নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। সিগারেটে আগুন ধরাবার সময় স্পুলটা হাতবদল হয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার,' অলস দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল রানা। ওদের কথা শুনতে পাবে এত কাছে নেই কেউ। 'লুকিয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এক মিনিট। কোথায়, ঠিক করে ফেলেছি।'

'দু'মিনিটের মধ্যে রোগিনী পেয়ে যাবেন।'

ডাক্তার তার অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর গিয়ে ঢুকল, রানাও ধীর পায়ে হেঁটে চলে এল জুলির কাছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, একা দাঁড়িয়ে ছিল জুলি···এধরনের একটা পরিবেশ অর্জন করা খুবই কঠিন তার জন্যে। রানার দিকে তাকাল সে, ঠোঁট ভেজাল, চেষ্টা করল হাসতে। চেষ্টাটা যে খুব একটা ফলবতী হলো তা নয়।

'ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, উনি কে?' জানতে চাইল রানা। 'চেহারা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে না, কোন মেয়ে বিপদে পড়লে উনি সাহায্য করবেন, অথচ অন্যায় কোন সুযোগ নেবেন না?'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল জুলি। বলল, 'উনি বিল গাইডেন—এ. পি.। চমৎকার ভদ্রলোক।'

'যাও, ওর গায়ে গিয়ে ঢলে পড়ো। সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত। গোটা ব্যাপারটাই অভিনয়, কিন্তু খুঁত থাকলে চলবে না। রসো, আগে আমাকে ব্রিজের ওই ওদিকে সরে যেতে দাও। তুমি অসুস্থ হবার সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাই আমি।'

রাস্তা পেরিয়ে ব্রিজের আরেক দিকে চলে এসে ঘুরল রানা। এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে হাঁটা শুরু করেছে জুলি। তার পা ফেলার ভঙ্গি একটু যেন আড়ষ্ট লাগল। ব্যাপারটা অভিনয়েরই অংশ নাকি ভয় পাওয়ার ফল, ঠিক ধরতে পারল না রানা। তবে অভিনয় হবার সম্ভাবনাই বেশি—চালু মেয়ে।

জুলি পনেরো ফিট দূরে থাকতে তাকে প্রথম দেখতে পেল বিল গাইডেন। চোখ পড়ল, সে-চোখ আর ফেরাতে পারল না। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, একটা হাত তুলে নেড়েও দিল একবার। লক্ষ্য করল, সুন্দরীর হাঁটাটা

যেন কেমন। প্রথমে কৌতূহল বোধ করল সে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল মুখের হাসি। দু'পা সামনে বাড়ল, হাত বাড়িয়ে জুলির কাঁধ দুটো ধরে ফেলল। চেহারা দেখে মনে হলো, কাউকে ধরার সুযোগ পেয়ে জুলি যেন বেঁচে গেছে। বিল গাইডেন অনুভব করল, জুলির একটা হাত তার কাঁধ খামচে ধরল। 'এই মেয়ে, কি ব্যাপার?' জুলির চেহারা ব্যথায় কুঁচকে উঠতে দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে।

'ব্যথা!' তারপরই গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল জুলির গলা থেকে। 'আমি··· বোধহয়···হার্ট অ্যাটাক···যাচ্ছি···মারা যাচ্ছি···' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জুলি।

'হার্ট অ্যাটাক? কি করে জানলে?' একটু হেসে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল গাইডেন। 'তাছাড়া, খামচে ধরেছ ডান দিকটা, তোমার হার্টটা কি ওদিকে? প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝো না।' জুলিকে ধরে পা বাড়াল সে। 'এসো। কাছেই ডাক্তার আছে।'

দূর থেকে ওদেরকে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। যতদূর বুঝতে পারল, জুলির অভিনয় ও শুধু একাই দেখল।

দক্ষিণ ব্যারিয়ার অর্ধেক তৈরি হয়ে গেছে। কাজ যেভাবে এগোচ্ছে, দেখে খুশিই হলো কবীর চৌধুরী। পায়ে হেঁটে ফিরে এল সে। রিয়্যার কোচে চড়ে বেডলারের পাশের সীটে বসল।

'ওদের আলোচনা থেকে আর কিছু জানা গেল?'

'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বারবার বলে, স্যার,' রিপোর্ট করল বেডলার। 'একঘেয়ে ব্যাপার। টেপ শোনেন, কিন্তু কিছু পাবেন না।'

'তারচেয়ে তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

'পেমেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও তর্ক করছে ওরা।'

'দেবে তো?'

'দেবে না মানে! কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এখনই দেবে, নাকি এটা সেটা নানা অজুহাত দেখিয়ে সময় নেবে। ভোটও হয়েছে। চারজন এখুনি পেমেন্ট দেয়ার পক্ষে, দু'জন বিপক্ষে, দু'জন কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি। বাদশা, প্রিন্স আর তেল মন্ত্রী শেখ খায়ের, এরা তিনজন প্রথম থেকেই বলে আসছে, টাকা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপদমুক্ত হওয়া দরকার। এদের দলে মেয়রও রয়েছে।'

'মেয়রও তাই চাইবেন, জানা কথা। যত টাকাই লাগুক, তার কাছে ব্রিজের নিরাপত্তা আগে।'

'প্রেসিডেন্ট আর স্টিফেন বেকার টাকা দেয়ার ঘোর বিরোধী,' বলল বেডলার। 'আন্ডার সেক্রেটারি জেমস ফেয়ার আর জেনারেল পীল কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। তবে জেনারেল সংগ্রাম করে মরে যাওয়াটাকেই ভাল বলে মনে করছে।'

'প্রেসিডেন্টের দেরি করতে চাওয়ার কারণটা বুঝি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওয়েট অ্যান্ড সী, রাজনীতিক হিসেবে লোকটা এই নীতির অনুসারী। ভাবছে, দেরি করলে একটা হয়তো মিরাকল ঘটবে। সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার, এত টাকা

তার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেলে ভোটাররা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। বেকারের ব্যাপারটাও বোঝা যায়। এই লোক জীবনে কখনও স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। প্রেসিডেন্টের দেখাদেখি বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ঠিক আছে, ওদের মাথাব্যথা ওরাই সারাক।' হুয়ানকে কোচে উঠতে দেখে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'

'তেমন কিছু না, স্যার। মনে হলো ডাক্তার সাহেব এক রোগীকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন তিনি।'

অ্যাম্বুলেন্সে উঠে কবীর চৌধুরী দেখল, সবুজ নয়না জুলি ঝুলন্ত একটা সাইড বেডে শুয়ে আছে, তার বুক আর পেটের মাঝখানটা, ইঞ্চি ছয়েক, খোলা।

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে দেখাল জুলিকে। কবীর চৌধুরী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। অসুস্থদের মাঝখানে অস্বস্তি বোধ করে সে। জুলি যে অসুস্থ, তা সে দেখেই বুঝতে পারল।

'কি হয়েছে ওর?'

'সাংঘাতিক অসুস্থ, মি. চৌধুরী!' উদ্বিগ্ন দেখাল ডাক্তারকে। 'এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছি, কি হয়েছে?'

'দেখুন না, ওর মুখ দেখুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জুলির দিকে আরেকবার তাকাল কবীর চৌধুরী। দেখল, মুখের রঙ ছাই ছাই। কিন্তু জানল না, গন্ধহীন পাউডার মাখিয়ে এই ধূসর রঙ তৈরি করা হয়েছে।

'এবার, ওর চোখ দুটো দেখুন।'

জুলির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা।

'এবার, পালস দেখুন।'

অলস হাতে জুলির কব্জি ধরল কবীর চৌধুরী। ধরেই ছেড়ে দিল। 'বাপরে! সাংঘাতিক লাফাচ্ছে!'

সত্যি তাই। আসলে, এই একটি ক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ডাক্তার। জুলি যখন অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকল, তখনই লাফাচ্ছিল তার পালস। ইঞ্জেকশনটা না দিলেও চলত।

'এবার, মি. চৌধুরী, দয়া করে ওর তলপেটের ডান দিকে একটা হাত রাখুন, প্লীজ।'

'না, কোথাও হাত-টাত দিতে পারব না।'

'পেইনকিলার দিয়েছি, তাই চেঁচাচ্ছে না,' বলল ডাক্তার। 'অ্যাপেনডিক্সটা হয়তো ফুলে ঢোল হয়ে আছে, যে-কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। হতে পারে পেরিটনাইটিস। লক্ষণ বলতে গেলে সবগুলোই উপস্থিত। হাসপাতাল…'

'কেন, হাসপাতালে কেন? এখানে চিকিৎসা করতে অসুবিধে কোথায়?'

'কিসের চিকিৎসা করব, মি. চৌধুরী? রোগটাই তো ধরতে পারছি না। ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট নেই। এক্সরে ফ্যাসিলিটি নেই। যদি অ্যাবডোমিন্যাল

সার্জারীর দরকার হয়. অপারেশন থিয়েটার কোথায়? তাছাড়া. অ্যানেসথেটিস্ট কোথায় পাব?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'হাসপাতাল ছাড়া উপায় নেই. মি. চৌধুরী।'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল জুলি. হঠাৎ তার চোখের ঘোলাটে ভাব খানিকটা কমে এল। হাত তুলে সামনেটা হাতড়াল সে. নাগালের মধ্যে পেয়ে খামচে ধরল ডাক্তারের কনুই। তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বিছানার ওপর। 'না! মরে গেলেও হাসপাতালে যাব না আমি! মি. চৌধুরী. আমাকে আপনি এই ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচান! হাসপাতাল. মাগো! ওরা আমাকে কাটাছেঁড়া করবে! মরি এখানে মরব. হাসপাতালে আমি মরতে যাব না।'

জুলির কাঁধ ধরে জোর খাটাল ডাক্তার. শুইয়ে দিল আবার।

'তাছাড়া. ব্যাপারটা যদি সত্যি সিরিয়াস কিছু না হয়? এটা যদি শুধু মাসল পেইন হয়? মি. চৌধুরী আমাকে আর ব্রিজে ফিরে আসতে দেবেন না। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খবরের. আসল অংশটাই মিস করব আমি। এ ধরনের ঘটনার মাঝখানে জীবনে কখনও পড়ব আর? না. মরে গেলেও হাসপাতালে যাচ্ছি না।'

'তোমার ওটা মাসল পেইন নয়,' গম্ভীর মুখে বলল ডাক্তার। 'তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝো?'

'সিরিয়াস কিছু না হলে আবার তুমি ফিরে আসতে পারবে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু আমি আর ডাক্তার যা বলব তা যদি শোনো।' ইঙ্গিতে দরজাটা ডাক্তারকে দেখিয়ে ধাপ বেয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এল সে।

ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামতেই প্রশ্নের মুখে পড়ল। 'ব্যাপারটা আসলে কি, ডাক্তার?'

চেহারা দেখে মনে হলো ডাক্তারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে যাচ্ছে। 'আমি সোজা সরল লোক, খোলামেলা কথা বলতে পছন্দ করি। যদি ভাবেন আমি উপদেশ দিচ্ছি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'উপদেশ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বক্তৃতা একেবারেই অসহ্য!' বোঝা গেল কবীর চৌধুরী রেগে যাচ্ছে।

'সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার, তাই না? ওই টাকা নিয়ে যদি নিরাপদে কেটে পড়তে পারেন, বিশ্বাস করুন, আমেরিকার লোক, সারা দুনিয়ার লোক, আপনাকে রূপকথার নায়ক ভেবে চুপি চুপি পুজো করবে। জী, স্যার, মানুষের নেচারের মধ্যেই এই জিনিসটা রয়েছে। কিন্তু, আপনার জেদ বা গাফিলতির জন্যে এই সুন্দরী মেয়েটি যদি প্রাণ হারায়, সব ভেস্তে যাবে। যাদের কাছে আপনি রূপকথার নায়ক হতে পারতেন তারাই আপনাকে ঘৃণা করবে। তারা আপনাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না।'

একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এসব কথা শুনবে বলে আশা করেনি কবীর চৌধুরী। কিছুটা অবাক হলো সে। বলল, 'আমাকে থ্রেট করার দরকার নেই, ডাক্তার। আপনার রোগিনী হাসপাতালে যাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি জানতে চাইছিলাম, ওর আসলে হয়েছেটা কি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, সঠিক আমিও জানি না,' বলল ডাক্তার। 'অসুস্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অসুস্থতা তো আর এক রকমের নয়। অ্যাপেনডিসাইটিস? পেরিটনাইটিস? বোধহয় না। ব্যথা হচ্ছিল, সেটা মানসিক ব্যাধিরও উপসর্গ হতে পারে। এমন একটা পেশায় রয়েছে, সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে সাইকোসোমাটিক ডিজঅর্ডার দেখা দিয়েছে, তাও হতে পারে। মুশকিল হলো, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই। তবে হাসপাতালে ওকে পাঠাতেই হবে। দেরি করাও চলবে না।'

'দেরি তো একটু হবেই,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করার কথা ভাবছি আমি।'

হতভম্ব দেখাল ডাক্তারকে। 'কিন্তু কেন? কি আছে আমার অ্যাম্বুলেন্সে? নারকোটিকস আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে, থাকবেও। নাকি ভেবেছেন, প্রেসিডেন্টকে লুকিয়ে রেখেছি, নিয়ে পালাব? আচ্ছা, আপনিই বলুন, সাথে করে আনিনি অথচ নিয়ে যাচ্ছি এমন কি জিনিস আছে আপনার ব্রিজে? আমি একজন ডাক্তার, মি. চৌধুরী, এফ.বি.আই. এজেন্ট নই।'

'ঠিক আছে, সার্চের কথা ভুলে যান। কিন্তু আমি চাই আপনাদের সাথে একজন গার্ড যাবে। চোখে চোখে রাখার জন্যে।'

'একজন কেন, ছয়জন পাঠান। তবে চোখে চোখে যে কতক্ষণ রাখবে সে আমার জানা আছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে, প্রফেসর কারচিভাল, আমাদের চীফ অভ সার্জারী, তাঁর ইউনিটটাকে সদ্যজাত শিশুর মত যত্ন করেন। প্রেসিডেন্ট বা আপনার মত লোককেও তিনি পরোয়া করেন না। আপনার লোক যদি ইমার্জেন্সী রিসেপশনে ঢুকতে চায়, পিস্তল হাতে তাড়া করবেন তিনি। এই রকম একবার তাড়া করতে দেখেছি আমি তাঁকে।'

'গার্ড পাঠাবার আসলে কোন দরকারও দেখছি না...'

'কিন্তু একটা জিনিস এখুনি দরকার,' বলল ডাক্তার। 'কাউকে দিয়ে হাসপাতালে একটা ফোন করান। ওদেরকে বলতে হবে, ইমার্জেন্সী অপারেটিং থিয়েটার যেন রেডি করে রাখে। ড. ম্যাকলিনও যেন হাজির থাকেন।'

'ড. ম্যাকলিন?'

'সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'আপনি জানেন,' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে, 'প্রেসিডেন্ট কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবেন তা ঠিক করার সময় খেয়াল রাখা হয়, রাস্তার ধারে কাছে যেন একটা হাসপাতাল থাকে? বিপদের কথা তো বলা যায় না। আমাদের জন্যে সুবিধেই হলো, কি বলেন?'

'খুবই,' ডাক্তার ড্রাইভারের দিকে ফিরল। 'ওহে, সাইরেন বাজাও।'

নয়

অ্যাম্বুলেন্স গেল দক্ষিণ দিকে, সেদিক থেকে এল টিভি ভ্যান আর জেনারেটার ট্রাক। আগে যেখানে আসন নিয়েছিল সেদিকে দল বেঁধে এগোল ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানরা। সবাই ধরে নিয়েছে, কবীর চৌধুরী আগের মতই আরেকটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। কয়েকজন ক্যামেরাম্যান এতই মেতে উঠল, জেনারেটার বয়ে নিয়ে এল যে ট্রাকটা, সেটারও ছবি তুলতে শুরু করে দিল তারা।

রানা চলল উল্টোদিকে। প্রেস কোচে উঠে নিজের সীটে বসল ও। ক্যামেরার নিচের অংশ খুলে মিনি ট্র্যানসিভারটা বের করল। নেড়েচেড়ে একবার দেখে ভরে রাখল পকেটে। ক্যারিয়ার ব্যাগ খুলল, ক্যামেরার তলায় স্পেয়ার ফিল্ম ভরল। ক্যামেরার নিচের অংশ ক্লিপ দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে, এই সময় মনে হলো কেউ লক্ষ্য করছে ওকে। ব্যস্ত হলো না, ধীরে ধীরে মুখ তুলল ও।

কুমড়ো আকৃতির মাথা। মায়াভরা দুটো চোখ। সেই চোখে নির্বোধ দৃষ্টি। হাসিটাও বোকা বোকা।

'প্রদ্যুৎ মিত্র, তাই না?'

'হ্যাঁ। রস পেরট, ঠিক না?'

'হ্যাঁ। সবাই বাইরে, আপনি একা ভেতরে কেন? এই ঐতিহাসিক ঘটনা ধরে রাখার কোন আগ্রহ নেই কেন আপনার মধ্যে?'

'অনেক কারণ আছে। শোনার ধৈর্য হবে না তোমার।'

'আমার কোন কাজ নেই,' বলল পেরট। 'সবগুলো কারণ শুনতে পারি।'

'এক, এখনও অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। দুই, টিভি ক্যামেরার জোরাল চোখ রেকর্ড করার কাজটা আমার এই ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ ভাল করবে। তিন, ক্যামেরায় ফিল্ম আমি ছায়ায় বসে লোড করতে পছন্দ করি। আর দরকার আছে?'

'আপনার ক্যামেরা দেখতে অমন অদ্ভুত কেন?'

'অদ্ভুত বলেই অদ্ভুত,' বলল রানা। 'এটা হাতে তৈরি। সুইডিস। দুর্লভ জিনিস। এটাই দুনিয়ার একমাত্র ক্যামেরা যেটা দিয়ে একাধারে রঙিন স্টীল ছবি তোলা যায়, সাদা-কালো স্টীল তোলা যায়, সেই সাথে সিনে ক্যামেরা হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি।'

'একবার দেখতে পারি? ভাল ক্যামেরার ওপর আমারও ঝোঁক আছে।'

'দেখো, দেখো না!' হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল রানা। চিটচিটে ঘাম অনুভব করল। অথচ এয়ারকন্ডিশন অচল হয়ে পড়েনি।

গভীর মনোযোগের সাথে ক্যামেরাটা পরীক্ষা করছে পেরট। নিচের দিকে স্প্রিং ক্লিপ রয়েছে। যেন নিজের অজান্তেই সেটায় তার হাত পড়ল। রানার পাশের সীটে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল কয়েকটা ক্যাসেট আর স্পুল।

'দুঃখিত, ভারি দুঃখিত। এখন মনে হচ্ছে, ক্যামেরা নাড়াচাড়ায় এখনও হাত

পাকেনি আমার।' ক্যামেরাটা উল্টো করে ধরল পেরট। চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকাল ফাঁকা ঘরের ভেতর। 'বাহ্, চমৎকার! চোরা কুঠরি, তাই না?'

বসে রয়েছে রানা, একটু উঁচু হয়ে রয়েছে সাইড পকেট। সেদিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না ও।

ক্যাসেট আর স্পুলগুলো ক্যামেরার পিছনের অংশে ভরে রাখল পেরট। ফ্ল্যাপ বন্ধ করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্যামেরা। 'আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো?'

'না। কি আর মনে করব।'

মুখে নির্বোধ হাসি নিয়ে কোচ থেকে নেমে গেল পেরট।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। ভাবল, ক্যামেরার পিছনে যে দুটো খুদে স্প্রিং ক্লিপ আছে পেরট কি ওগুলো দেখেছে? বোধহয় দেখেছে। কিন্তু ওগুলো কেন, তা কি বুঝেছে সে? না বোধহয়। একটা ক্যামেরায় এটা সেটা অনেক কিছুই আটকাবার দরকার হয়, ক্লিপগুলো সে-ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় বলে মনে করাই স্বাভাবিক।

সীটে একটু ঘুরে বসল রানা। নিজেদের কোচ থেকে জিম্মিরা নামছেন। সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন দেখাল প্রেসিডেন্টকে। পেরটকেও দেখতে পেল ও। জিম্মিদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

কোচ থেকে নামল রানা ড্রাইভারের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে। এদিকে একজনও দর্শক বা প্রহরী নেই। ব্রিজের কিনারায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের ওপর হাত রাখল ও। হাত থেকে ছেড়ে দিল ট্র্যানসিভার রেডিওটা। নিঃশব্দে কোচে ফিরে এল ও। দরজা বন্ধ করল। তারপর উল্টোদিকের দরজা দিয়ে আবার নেমে এল ব্রিজে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেরট, একটা চোখ টিপে হাসল। তারপর আবার মনোযোগ দিল জিম্মিদের দিকে।

কবীর চৌধুরী আগের মতই আয়োজন করেছে। এবারের আয়োজনেও কোন খুঁত নেই। জিম্মিরা তাঁদের নির্ধারিত জায়গায় বসেছেন। তাঁদের পিছনে বসেছে রিপোর্টাররা। ক্যামেরাম্যানরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটা বড় পার্থক্য হলো, কবীর চৌধুরী এবার দুটো টিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছে। তার নির্দেশে টিভি ক্যামেরা প্রথমে জিম্মিদেরকে সামনে রাখল। দর্শকরা তাদেরকে দেখছে বটে, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পাচ্ছে কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে জিম্মিদের সবাইকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে। ব্যাপারটা শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, হাস্যকর পুনরাবৃত্তি। এ যেন মাকে মামার বাড়ির গল্প শোনানো। সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর দর্শকদের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরল সে। বলল, 'বেশি কথার মানুষ নই আমি। আমার পরিচয়, আমি কবীর চৌধুরী, বাঙালী এক বিজ্ঞান-সাধক। জীবনে আমার একটাই কাজ, বিজ্ঞানের খেদমত করা। কিন্তু গবেষণা করতে হলে প্রচুর টাকা লাগে, অথচ চাইলে কেউ দেয় না। তাই আমি কেড়ে নিই। এর জন্যে জনতার আদালতে আমাকে যদি অপরাধী বলে রায় দেয়া হয়, সে রায় আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু একটা কথা আছে। রায় যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, সেটা মেনে নিতেও আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু রায়টা কার্যকরী

করার আগে আমাকে বছর কয়েক সময় দিতে হবে। এই ক'বছর গবেষণা চালাব আমি। তারপর আবার একদিন এই কবীর চৌধুরী আপনাদের দরবারে এসে হাজির হবে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড বরণ করার জন্যে।'

এমন কি জিম্মিরা পর্যন্ত বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। কারও বুঝতে অসুবিধে হলো না ছোট্ট ভাষণটা দিয়ে বেশিরভাগ মার্কিন জনগণের সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছে কবীর চৌধুরী।

'এবার কাজের কথা,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'আমাদের আজকের বিকেলের অনুষ্ঠানে আমরা দুটো টিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছি। একটার সাহায্যে আপনারা আমাদেরকে দেখছেন, আমরা যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। অপর ক্যামেরাটা মুখ করে রয়েছে দক্ষিণ, অর্থাৎ সান ফ্রান্সিসকোর তীরের দিকে। এটা একটা টেলিফোটোজুম লেন্সসহ ট্র্যাকিং ক্যামেরা। আধ মাইল দূরের জিনিস দেখবেন কিন্তু মনে হবে দশ ফিট দূর থেকে দেখছেন। আজ বিকেলে কুয়াশা নেই, কাজেই এই ক্যামেরা ভালই কাজ দেখাতে পারবে। এবার ওটার কাজ দেখুন।'

চৌকো বাক্সের ওপর থেকে ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে ফেলল কবীর চৌধুরী। তারপর হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে এগিয়ে এল প্রেসিডেন্টের দিকে। প্রেসিডেন্টের পাশেই বিশেষ ভাবে খালি রাখা হয়েছে একটা চেয়ার, এগিয়ে এসে সেটায় বসল কবীর চৌধুরী। আবরণমুক্ত জিনিসটার দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

'আমাদের সম্মানীয় মেহমানদের জন্যে যোগাড় করা হয়েছে এটা,' বলল সে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, একটা কালার টিভি। মেড ইন আমেরিকা, অফকোর্স।'

খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তিনি জানেন, সভ্য জগতের বেশিরভাগ লোকের দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর। বেশ জোর গলায় বললেন তিনি, সবাই যাতে শুনতে পায়, 'এই টিভি আপনি নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে কিনে আনেননি, মি. চৌধুরী!' সম্বোধন, ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক সাবধান তিনি।

'এধরনের ছোটখাট ব্যাপারে যে লোক মাথা ঘামায় সে একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হয় কিভাবে, আমি বুঝতে অক্ষম!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল কবীর চৌধুরী। 'টিভিটা আপনাদের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে কোটি কোটি দর্শকদের সাথে আপনারাও দেখতে পান প্রথম বিস্ফোরক কোথায় কিভাবে ফিট করা হবে। দক্ষিণ টাওয়ারের কাছে একটা সাসপেনশন কেব্‌ল্‌-এ ফিট করা হবে ওই চার্জ। এখান থেকে দূরত্ব, দু'হাজার ফিট। উঁচু পাঁচশো ফিটেরও বেশি। এই টিভি না আনা হলে অনুষ্ঠানটা চাক্ষুষ করার সুযোগ থেকে আপনারা বঞ্চিত হতেন।' আপনমনে হাসল কবীর চৌধুরী। 'এবার, প্লীজ, রিয়্যার কোচ থেকে যে ভেহিকেলটা নেমে আসছে, ওটার দিকে মনোযোগ দিন।'

সবাই তাকাল। ওরা খালি চোখে যা দেখছে, টিভিতেও তাই দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা অনেকটা ছাল ছাড়ানো, গলফ-কার্টের খুদে সংস্করণের মত। কাঠের ঢালু গা বেয়ে নেমে এল নিঃশব্দে, বোঝা গেল ইলেকট্রিসিটিতে চলে। গাড়িটা চালিয়ে আনল হুয়ান, পিছন দিকের ছোট একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, তার ঠিক

পাশে এবং নিচে ব্যাটারি কেস। তার সামনেও রয়েছে ইস্পাতের সমতল একটা প্ল্যাটফর্ম। ওখানে দেখা গেল অস্বাভাবিক মোটা রশি, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। আরও দেখা গেল ছোট একটা উইঞ্চ।

রিয়্যার কোচ থেকে নেমেই গাড়িটা দাঁড় করাল হুয়ান। কোচ থেকে এরপর নেমে এল চারজন লোক। দু'জন বয়ে আনল অত্যন্ত ভারী একটা ক্যানভাস স্ট্র্যাপ, ভেতরে এক্সপ্লোসিভ। গাড়ির প্ল্যাটফর্মে, রশির পাশে রাখা হলো সেটা। বাকি দু'জন আরও দুটো জিনিস বয়ে নিয়ে এল। দুটোই আট ফিট লম্বা। প্রথমটা একটা বুটহুক। অপরটা এইচ-সেকশনড স্টীল বীম, এক প্রান্তে রয়েছে বাটারফ্লাই স্ক্রু ক্ল্যাম্প, আরেক ধারে পুলি।

'এক্সপ্লোসিভের যে স্ট্র্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, ওটা দশ ফিট লম্বা,' মুখ খুলল কবীর চৌধুরী। 'সাথে রয়েছে ত্রিশটা মোচা আকৃতির হাই এক্সপ্লোসিভ। প্রতিটির ওজন পাঁচ পাউন্ড। আর রশির যে স্তূপ দেখতে পাচ্ছেন, লম্বা করলে ওটা সিকি মাইল পর্যন্ত যাবে। সাধারণ কোন রশি নয়, আটশো পাউন্ড ভার ধরে রাখতে পারবে।' ইঙ্গিত দিল সে, সাথে সাথে অদ্ভুতদর্শন গাড়ি ছেড়ে দিল হুয়ান।

টিভি লেন্সের দিকে সরাসরি তাকাল কবীর চৌধুরী। 'আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে ব্রিজের টাওয়ারগুলোর কাঠামো আসলে সলিড বা নিরেট নয়।' তার সামনের এবং দুনিয়ার কোটি কোটি টিভি পর্দায় দক্ষিণ টাওয়ার স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'স্টীল ফ্রেমওয়র্ক বক্স, ওগুলোকে বলা হয় সেল। এই সেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে টাওয়ারগুলো। সেলগুলো ফোন বুদ আকারের, তবে দ্বিগুণ লম্বা। চিরে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে ওগুলোকে, যোগাযোগের জন্যে রাখা হয়েছে ম্যানহোল। প্রতিটা টাওয়ারে এধরনের পাঁচ হাজারের বেশি সেল আছে। সিঁড়ি পাবেন, পাবেন এলিভেটর। এই দুটোর নাগালের মধ্যে রয়েছে মোট তেইশ মাইল।'

সীটের তলা থেকে একটা ম্যানুয়াল বের করল সে।

'যে-কোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে এই পাতালপুরীতে হারিয়ে যাওয়া পানির মত সহজ। একবার, এই ব্রিজ যখন তৈরি হচ্ছিল, দু'জন লোক উত্তর টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সারাটা রাত ধরে চেষ্টা করে। ব্রিজের ডিজাইনার এবং বিল্ডার, যোসেফ স্ট্র্যাস, এই টাওয়ারের ভেতর সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে পারতেন, কেউ তাঁকে খুঁজে বের করতে পারত না। তিনি নিজেই ছাব্বিশ পাতার একটা ম্যানুয়াল রচনা করেন, যাতে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার পথ-নির্দেশ দেয়া ছিল। আমার হাতের এটা সেই ম্যানুয়ালেরই আধুনিক সংস্করণ।

'এই মুহূর্তে আমার দু'জন লোক টাওয়ারে উঠছে। বে-র দিকে মুখ করে রয়েছে যেটা, ওটায়। ওদের দু'জনের কাছেই একটা করে ম্যানুয়াল আছে, অবশ্য ব্যবহার করার দরকার হবে না—এলিভেটরে করে উঠছে ওরা। পনেরো পাউন্ডের একটা বোঝা ছাড়া ওদের সাথে আর কিছু নেই। ওই বোঝা কি কাজে লাগবে, একটু পরই আপনারা জানতে পারবেন। আসুন, এবার আমাদের ইলেকট্রিক ট্রাকের দিকে একটু খেয়াল দেয়া যাক।'

টেলিফোটো টিভি ক্যামেরা টাওয়ার থেকে হুয়ানের ওপর নেমে এল। দক্ষিণ

টাওয়ারের বিশাল চারটে আড়াআড়ি অবলম্বনের মধ্যে সবচেয়ে যেটা নিচু, সেটার প্রায় সরাসরি তলায় থামল ট্রাকটা।

'এলিভেশন, প্লীজ,' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

টেলিফোটো ক্যামেরা বে-সাইড টাওয়ারের স্যাডল-এর ওপর স্থির হলো আবার। স্যাডল হলো বাঁকানো স্টীল হাউজিং, যার ওপর দিয়ে কেব্‌ল্ এগিয়ে গেছে। স্যাডলের পাশে দু'জন লোক হাজির হলো—ব্রিজের মাঝখান থেকে যারা দেখছে তাদের চোখে খুদে দুটো মূর্তির মত লাগল, কিন্তু টিভির পর্দায় ক্লোজ আপ ছবি।

'ওই টাওয়ারের মাথায় আমাকে যদি দাঁড়াতে বলেন, মাফ করবেন, আমি পারব না,' শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'একবার যদি পা ফসকে যায়, সাড়ে সাতশো ফিট নিচে গোল্ডেন গেটের ঠাণ্ডা-বরফ পানি। মাত্র সাত সেকেন্ডের একটা পতন, কিন্তু ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল গতিতে পানিতে পড়া আর কংক্রিটের মেঝেতে পড়া, বোধহয় একই। তবে ওরা দু'জন ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ওদের আমি নাম দিয়েছি, স্পাইডারম্যান।'

ক্যামেরা আবার হুয়ানের ওপর নেমে এল। একটা পিস্তল বের করল সে। অস্বাভাবিক লম্বা তার ব্যারেল, অস্বাভাবিক চওড়া তার মাজল। ওপর দিকে তাক করে লক্ষ্য স্থির করল সে, তারপর ফায়ার করল। যে মিসাইলটা বেরিয়ে গেল, ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। ক্যামেরা শুধু দেখাল, ঠিক চার সেকেন্ড পর, স্যাডলের পাশে দাঁড়ানো নটহ্যামের হাতে একটা সবুজ কর্ড পৌঁছে গেছে। কর্ডটা তাড়াহুড়ো করে টেনে নিল সে। কর্ডের শেষ প্রান্তে একটা লেদার-হ্যাণ্ড পুলি রয়েছে, পুলিটা সংযুক্ত হয়েছে রশির একটা প্রান্তের সাথে। রশিটা নটহ্যামের হাতে আসতে আড়াই মিনিট সময় নিল।

রশি ধরে থাকল নটহ্যাম, তার সঙ্গী টেলর কর্ড আর পুলি দুটোই খুলে নিল। রশিটা আরও বারো ফিট টেনে নিল নটহ্যাম, এই অংশটা ছুরি দিয়ে কেটে ধরিয়ে দিল টেলরের হাতে। টেলর সেটার এক প্রান্ত বাঁধল একটা অবলম্বনের সাথে আরেক প্রান্ত বাঁধল পুলির স্ট্র্যাপের সাথে। পুলির মাথায় একটা ফুটো আছে, রশিটা এবার সেই ফুটো দিয়ে গলিয়ে নিয়ে আসা হলো সীসার একটা ভারী টুকরোর কাছে। সীসাটা নাশপাতি আকৃতির, সাথে করে নিয়ে এসেছে ওরা। এরপর নাশপাতি আর রশি, দুটোকেই ছেড়ে দেয়া হলো। ব্রিজ লেভেলে নেমে এল ওগুলো।

হুয়ান, টেলর আর নটহ্যামকে আরও প্রায় দশ মিনিট দেখানো হলো টিভিতে। নানা কৌশল আর বুদ্ধি খাটিয়ে এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ওরা, যার সাহায্যে বিস্ফোরকগুলো নিরাপদে টাওয়ারে তোলা সম্ভব হলো।

'আমাদের প্ল্যান একটু বদলেছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, উত্তর এবং দক্ষিণ, দুটো টাওয়ারকেই আমরা ফেলে দেব। তা নয়, এখন আমরা মাত্র একটা টাওয়ারের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। চারটে এক্সপ্লোসিভ স্ট্র্যাপই দক্ষিণ টাওয়ারে থাকবে—প্রতিটি কেব্‌ল্-এ এক জোড়া করে । দক্ষিণ টাওয়ার যদি ভেঙে পড়ে, আমাদের ধারণা, ব্রিজের উত্তর অংশটাও তাকে অনুসরণ

করবে। উত্তর টাওয়ার ভাঙতে পারে, নাও পারে। না ভাঙলেও কিছু আসে যায় না, কারণ ব্রিজের বেশিরভাগই বিলীন হয়ে যাবে নদীগর্ভে।'

ঝট করে মেশিন-পিস্তল তুলল পেরট। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মেয়র, আবার তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেল।

টাওয়ারের মাথায় এখন শুধু নটহ্যামের কাঁধ দেখা যাচ্ছে। জেনারেল পীল জানতে চাইলেন, 'কি করছে ওরা?'

'স্ট্র্যাপে ডিটোনেটর লাগাচ্ছে,' সহাস্যে জবাব দিল কবীর চৌধুরী। 'আপনারা টাকা না দিলে জিম্মিদের নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ব আমরা এবং তারপরই বুম!'

প্রেসিডেন্ট মৃদু গলায় জানতে চাইলেন, 'তারমানে কি ট্রিগারিং ডিভাইস দুটো হেলিকপ্টারের একটায় আছে?'

'প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের আই.কিউ. টেস্ট করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। হেলিকপ্টারে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? ওই কাছেরটায়।' বিড়বিড় করে আরও কি যেন বলল কবীর চৌধুরী, হাঁদারাম বা ওই ধরনের একটা শব্দ, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেল না কেউ।

দশ

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ল্যাংফোর্ড চাবি ঘুরিয়ে টিভি সেট বন্ধ করে দিলেন। একাধারে চিন্তিত, বিমূঢ় ও উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। 'লোকটা ভিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান ভিলেন,' বললেন তিনি। 'আমি ভেবেছিলাম কোন পাগলের কাজ। কিন্তু যে লোক ছোট বড় সবকিছুই একটা নিখুঁত প্ল্যান ক'রে.করে, তাকে আমি পাগল-ছাগল বলতে রাজি নই। আমার বিশ্বাস এই লোক একজন জাঁদরেল জেনারেল হতে পারত, হতে পারত আমার চেয়েও বড় একটা কিছু। অন্তত টিভিতে তাকে একটুখানি দেখে সেই ধারণাই হলো আমার। আপনারা কেউ আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন?'

বিশালদেহী পুরুষ ল্যাংফোর্ড। তাঁর ধারণা, জীবনের সব কিছুতেই কৌতুকের খোরাক আছে, শুধু আহরণ করতে জানতে হবে। ক্ষমতার প্রতি তাঁর লোভ নেই, আকর্ষণ আছে। দুর্বল স্বাস্থ্যের লোকজন তাঁর সাথে হাস্য-কৌতুকে যোগ দেয় না, কারণ ওই সময় অন্য লোকের পিঠে চাপড় মারা তাঁর একটা অভ্যেস। কথা শেষ করে একে একে তিনি এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ, জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন এবং সবশেষে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন। তিনি একা দখল করে আছেন একটা টেবিল, বাকি তিনজন আরেকটা টেবিলে বসেছেন। পাশের টেবিলে রয়েছেন পুলিস চীফ আর দুই সেক্রেটারি। হেডকোয়ার্টারের এই কনফারেন্স রুমে ছোট্ট আরও একটা টেবিল রয়েছে, সেটাকে সামনে নিয়ে বসে রয়েছে রানার নতুন ডাক্তার বন্ধু। জুলি রয়েছে কোণের একটা চেয়ারে।

কেউ কোন কথা বলল না দেখে বোঝা গেল ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে সবাই তারা একমত। বৃদ্ধ এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপের দিকে একবার তাকালেন তিনি। ভদ্রলোককে ম্রিয়মাণ এবং কাতর দেখাল। ল্যাংফোর্ড তাঁকে আর বিরক্ত করলেন না। ফিরলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে। উপস্থিতদের মধ্যে তাঁর ওপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখেন তিনি। 'জর্জ? কি করতে চাও?'

'আগে রানার মেসেজটার কোড ভাঙা হোক, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

'কোড! কোড! ছোকরাকে আমার যেন ইঁচড়ে পাকা বলে মনে হচ্ছে,' ভাইস-প্রেসিডেন্টের বলার ভঙ্গিতে একটু যেন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেল। 'মেসেজটা কোড করে জটিলতা না বাড়ালে কি তার চলত না? পরিস্থিতি কি এমনিতেই যথেষ্ট জটিল নয়?'

'রানা খুব সিকিউরিটি-কনশাস। মিস জুলি কি বললেন, শুনলেন তো? কবীর চৌধুরী অ্যাম্বুলেন্স তল্লাশী চালাতে চেয়েছিল। মাইক্রোফিল্মটা তার হাতে পড়তে পারত। কিন্তু তবু সেটার পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।' নীল রঙের স্যুট পরা এক যুবকের হাত থেকে কোড ভাঙা মেসেজের দুটো কপি নিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। কামরা থেকে তখুনি আবার বেরিয়ে গেল যুবক।

সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রানার মেসেজ পড়তে শুরু করলেন হ্যামিলটন। 'পড়ছি।—"আমার যা যা দরকার, সেগুলোর ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে আপনাদের, তাই তালিকাটাই আগে দিচ্ছি…" '

খুক্ করে কাশলেন অ্যাডমিরাল সোরেনসন। 'নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখেনি। স্যার বা ওই ধরনের কোন সম্বোধনও নেই।'

'রানা তো আর আমার বা আপনার চাকরি করে না। তাছাড়া, এই মেসেজ কার হাতে গিয়ে পড়বে, ওর জানা ছিল না। "নীল কিংবা সবুজ রঙের চারশো গজ সরু কর্ড লাগবে আমার। আর লাগবে রিটেন মেসেজের জন্যে নল আকৃতির ওয়াটারফ্রুফ কনটেইনার, একটা হুড পরানো মোর্স-টর্চ। একটা অ্যারোসল আর দুটো কলম দরকার আমার, একটা সাদা, একটা লাল। সি.এ.পি. এয়ার পিস্তল একটা। এগুলোর জন্য এই মুহূর্তে অর্ডার দিন, প্লীজ। এগুলো ছাড়া কিছুই করতে পারব না আমি"।'

জেনারেল গারল্যান্ড মাথার পিছনটা চুলকালেন। 'কোড ভাঙার পরও এই অবস্থা? ওগুলোর অর্থ কি, জর্জ?'

'তোমাকে জানানো উচিত হবে কিনা পরে সিদ্ধান্ত নেব,' বলে জেনারেল ফিদার হোপের দিকে তাকালেন হ্যামিলটন। 'জেনারেল হোপ এসবের অর্থ জানেন। এখানে সিভিলিয়নরা রয়েছেন, কাজেই অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারি না আমরা।'

একটু হেসে, মৃদু গলায় ডাক্তার বলল, 'আমি একজন ডাক্তার, ডাক্তাররা তথ্য চেপে রাখতে অভ্যস্ত। তাছাড়া, আমি কি একজন সিক্রেট এজেন্টও নই? হতে পারি নবিশ, কিন্তু মি. প্রদ্যুৎ মিত্র ওরফে মি. রানা কি আমাকে বিশ্বাস করেননি?'

হ্যামিলটনের চেহারা দেখে বোঝা গেল ডাক্তারের যুক্তি তিনি মেনে নিলেন। তাকালেন জুলির দিকে, 'তুমি কিছু বলবে, ইয়ং লেডি?'

'আলু পিঁয়াজ কাটার ছুরি দেখান, গড়গড় করে সব বলে দেব আমি,' বলল জুলি। 'ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে না, দেখালেই আমি নেই। তাছাড়া, শুধু ধমক, হুমকি বা ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কেউ কথা আদায় করতে পারবে না।'

অ্যাডমিরাল সোরেনসন জানতে চাইলেন, 'মেয়ে এবং ছুরি, এই দুটো জিনিসকে চৌধুরী কি চোখে দেখে, জর্জ?'

'ভয়ের কিছু নেই। ক্রিমিন্যাল বটে, কিন্তু আর সব ক্রিমিন্যালদের মত নারী নির্যাতনকারী নয় সে। তার এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রানার ধারণা হয়েছে, চৌধুরীকে দেখে যতটা অমানুষ বা ভাবাবেগহীন বলে মনে হয়, আসলে হয়তো তা নয় সে—তারও মনের কোন এক কোণে নিশ্চয়ই নরম একটু জায়গা আছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জুলির, 'কিন্তু প্রদ্যুৎ, মানে রানা আমাকে বলল যে কবীর চৌধুরী...'

'ও তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।' হ্যামিলটন ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। 'আসলে নক-আউট নার্ভ গ্যাস চেয়েছে রানা। এই গ্যাসই ব্যবহার করেছে চৌধুরী। এর প্রভাব বেশিক্ষণ থাকে না, ইয়ং লেডির উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। কলমগুলো সাধারণ ফেল্ট পেনের মতই দেখতে, মিসাইল হিসেবে ছুঁড়ে দেয় সরু সুচ। কারও গায়ে বিঁধলে সাথে সাথে অজ্ঞান।'

'সাদা আর লাল, দু'রঙের কেন?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল সোরেনসন।

'লাল কলমের সুচ বিঁধলে অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরবে না।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি অনেকক্ষণ আর চিরকালের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু এখানে?'

'ক্ষেত্রবিশেষে কোন পার্থক্যই নেই। এয়ার পিস্তল—হ্যাঁ, এটার কাজ চিরকালের জন্যে বিদায় জানানো।'

'সি.এ.পি. কথাটার মানে কি?'

'এর মানে হলো, বুলেটের মাথায় কিছু আছে।'

'কিছু আছে! কি আছে?'

পাইপে আগুন ধরালেন হ্যামিলটন। সবাই তাঁর দিকে ঝুঁকে আছেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সায়ানাইড।'

কয়েক সেকেন্ডের দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তোমার এই মাসুদ রানা অ্যাটিলা দ্য হুনের বংশধর নয় তো?'

'মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মাসুদ রানাকে আমি একজন যোগ্য অপারেটর হিসেবে জানি...।'

'যে এই রকম একটা মারণাস্ত্র ভাণ্ডারের অর্ডার দিতে পারে, আমিও তাকে যোগ্য না বলে পারছি না। জর্জ, লোকটা মানুষ মেরেছে?'

'হাজার হাজার পুলিস অফিসার মানুষ মারে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বিরক্ত বোধ করছেন হ্যামিলটন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করছেন না। 'এক্সকিউজ মি।' প্যাড টেনে নিয়ে তাতে খস খস করে লিখতে শুরু করলেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেলেন, দরজা খুলে এক লোকের হাতে ধরিয়ে দিলেন কাগজটা।

'এই জিনিসগুলো আনাও, এক ঘন্টার মধ্যে।' ফিরে এসে মেসেজটা আবার তুলে নিলেন তিনি।

'রানা বলছে, "আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং বা অন্য যে কোন দিক থেকে বিচার করলে কবীর চৌধুরীকে একটা প্রতিভা বলে স্বীকার করতে হবে। যে-কোন একটা কাজকে যুদ্ধ বলে মনে করে সে, রণ-কৌশল ঠিক করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটার ওপর। তবে, নির্ভুল হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মাত্রা ছাড়ানো আত্মবিশ্বাসই তার কাল, অন্তত অতীতে সেটা কয়েকবারই প্রমাণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে তার অহমিকা। এই অহমিকার জন্যেই রিপোর্টারদের ব্রিজে থাকতে দিয়েছে সে। তার জায়গায় আমি হলে, সব ক'টার ঘাড় ধরে ব্রিজ থেকে সরিয়ে দিতাম। লোকজন তাকে ঘিরে আছে, অবাক চোখে দেখছে এব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছে সে। অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার এবং মিস জুলিকে সার্চ করা উচিত ছিল তার, উচিত ছিল অ্যাম্বুলেন্সের প্রতিটি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট গোল্ডেন গেটের পানিতে ফেলে দেয়া। আমি বলতে চাইছি, নিরাপত্তার ব্যাপারে অতটা সচেতন নয় সে।

' "তার এই দুর্বলতার সুযোগটাই নিতে হবে আমাকে। কিভাবে, এখনও জানি না। অনেক বুদ্ধিই আছে, কিন্তু কোনটাই প্র্যাকটিক্যাল নয়। ওদের মধ্যে সতেরোজন সশস্ত্র, কিন্তু সতেরোজনের মধ্যে আমি ধরি মাত্র দু'জনকে। বাকি পনেরোজন নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু বর্ণ লীডার শুধু চৌধুরী আর পেরট। এদের দু'জনকে মেরে ফেলা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়"।'

'মানুষ মারবে!' জুলির সবুজ চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। 'মাসুদ রানা তুমি একটা মনস্টার!'

'হলেও,' এই প্রথম কথা বললেন এফ.বি.আই. চীফ জেনারেল ফিদার হোপ, 'সে একটা রিয়্যালিস্টিক মনস্টার।'

' "কিন্তু সম্ভব হলেও কাজটা বোকামি হয়ে যাবে। নেতারা খুন হলে শিষ্যরা উন্মাদ হয়ে উঠে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে—দেবে। ওই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বা তাঁর মেহমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না। দ্বিতীয় শেষ উপায় হিসেবে হাতে থাকল এটা।

' "একটা সাবমেরিন পাঠানো সম্ভব? রাতের বেলা ব্রিজের নিচে অপেক্ষা করবে, কোনিং টাওয়ারের শুধু ডগাটা দেখা যাবে। তাহলে আমি মেসেজও পাঠাতে পারব, কিছু দরকার হলে তা ডেলিভারিও নিতে পারব। আর কি ডেলিভারি নিতে চাইব, জানি না। রশির মই? কিন্তু মই বেয়ে দু'শো ফিট নেমে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, এটা আমার কল্পনায় আসছে না। দশ ফিট নামার পরই মই ছেড়ে দিয়ে শূন্যে লাফ দেবেন তিনি।

' "কবীর চৌধুরীর লোকেরা এক্সপ্লোসিভ ফিট করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শেষ করতে আরও অনেকক্ষণ লাগবে। কাজটা শেষ হবার আগে কি কেব্‌লগুলোয় দুই হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক ধাক্কা দেয়া সম্ভব? জানি, তাতে করে গোটা ব্রিজ ইলেকট্রিফায়েড হয়ে যাবে, কিন্তু যারা রাস্তায় বা কোচের ভেতর থাকবে তাদের কোন বিপদ হবে না"।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'দু'হাজার ভোল্ট কেন?'
'ইলেকট্রিক চেয়ারে দু'হাজার ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।'
'আর কোন সন্দেহ নেই, অ্যাটিলা দ্য হুনেরই বংশধর।'
'জ্বী। ''কিন্তু এর একটা অসুবিধে আছে। কেউ যদি, ধরুন প্রেসিডেন্টই ব্রিজের রেলিঙে হাত দিলেন বা ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে বসে পড়লেন? তাহলে নতুন প্রেসিডেনশিয়াল-ইলেকশন না দিয়ে উপায় থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দরকার আমার। কিংবা এক্সপ্লোসিভ ফিট করা হয়ে গেলে, লেজার বীম তাক করা সম্ভব? লেজার বীম ক্যানভাসের আবরণ পুড়িয়ে ফেলবে সন্দেহ নেই, চার্জগুলো যদি ব্রিজে পড়ে, নির্ঘাত নিজে থেকেই বিস্ফোরিত হবে, কিন্তু বিস্ফোরণের বেশিরভাগ ধাক্কাই লাগবে বাতাসে, রাস্তার ক্ষতি খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। তবে ব্রিজটা যে ভেঙে নদীতে পড়বে না, জোর দিয়ে বলতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হলো, লেজার বীম নিজেই চার্জগুলোকে ডিটোনেট করে দিতে পারে। দয়া করে ভালমত ভেবে দেখুন।
' ''প্রয়োজনীয় আড়াল তৈরি করে টাওয়ারে লোক তোলা সম্ভব? সবচেয়ে ভাল হয় অকৃত্রিম কুয়াশার সাহায্য পাওয়া গেলে। বাতাস অনুকূল দিকে থাকলে পানিতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে কি হয়? সাগরে এই রকম আগুন প্রায়ই তো লাগে। টাওয়ারে ওঠার পর লিফট নিচে পাঠিয়ে দিতে হবে, তারপর সব ক'টা এলিভেটর অকেজো করার জন্যে কেটে দিতে হবে পাওয়ার লাইন। তারপর কেউ যদি সিঁড়ি বেয়ে পাঁচশো ফিট ওঠে উঠুক, ওঠার পর তার আর কিছু করার মত শক্তি থাকবে না।
' ''খাবারের সাথে ড্রাগ মেশানো সম্ভব? খুব দ্রুত কাজ করে সেরকম ড্রাগ হলে চলবে না। আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখতে পারলেও যথেষ্ট। তবে, খাবার মুখে দেয়ার সাথে সাথে কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে পড়ে, ভেবে দেখুন কবীর চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া কি হবে। খাবারের ট্রে-তে মার্ক থাকা দরকার, যাতে সতেরোটা ট্রে সতেরোজন ভিলেনের কাছে যায়''।'
ডাক্তারের দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। 'এ-ধরনের ড্রাগ আছে?'
'আছে বৈকি,' জবাব দিল ডাক্তার। 'না থাকলে ওই ভদ্রলোক চাইতেন না।'
'তা ঠিক। ''প্লীজ পরামর্শ দিন। এই মুহূর্তে করার কাজ একটাই দেখতে পাচ্ছি আমি। চার্জ বিস্ফোরিত করাবার জন্যে যে রেডিও ট্রিগারটা আছে, সেটাকে অকেজো করার চেষ্টা করতে পারি। ওটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে, ওদেরকে বুঝতে দেয়া চলবে না। কাজটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ওটার কাছে পৌঁছানো সাংঘাতিক কঠিন। ট্রিগারটা আছে হেলিকপ্টারে। রাত দিন সব সময়ের জন্যে আলোর ব্যবস্থা আছে ওদিকে। গার্ড তো আছেই। তবু চেষ্টা করব। শেষ''।'
'দ্বিতীয় শেষ উপায়ের কথা বলা হলো, শেষ উপায়টা তাহলে কি?' জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড।
অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হ্যামিলটন। 'তুমি যেখানে আমিও সেখানে। শেষ একটা উপায় যদি রানার হাতে থাকে, সেটা চেপে গেছে ও। মেসেজের একটা করে কপি সবাইকে দেয়া হবে,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ফটোস্ট্যাট

করিয়ে আনি।' কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। নীল কোট পরা যুবককে ইশারায় কাছে ডেকে তার হাতে মেসেজটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দশ কপি।' মেসেজের শেষ প্যারাগ্রাফে আঙুল রেখে নির্দেশ দিলেন, 'এই অংশটা কপি হবে না। অরিজিন্যালটা শুধু আমাকে ফেরত দেবে।' কামরায় ফিরে এলেন তিনি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কপিগুলো হাতে পেলেন হ্যামিলটন। ছয়টা তিনি বিলি করলেন, অরিজিন্যালটার সাথে বাকি চারটে রাখলেন নিজের কাছে।

যে যার কপি চোখের সামনে তুলে পড়তে শুরু করলেন।

জেনারেল গারল্যান্ড অভিযোগের সুরে বললেন, 'আমি যে কিছু অবদান রাখব, এই ছোকরা তার কোন অবকাশই রাখেনি। বুঝতে পারছি, আজ আমার কৃতিত্ব দেখাবার দিন নয়।'

'আমার কথাটা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে,' অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'জর্জ, তোমার এই মাসুদ রানা, সত্যি, কাজের ছেলে।'

'মাসুদ রানা আমার নয়।'

'তোমার সাথে পরিচয় আছে, সেটাও কম কথা নয়। এই রকম একটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় থাকলে রাতে আরও একটু ভাল ঘুম হত, জীবন হত আরও একটু নিরাপদ।'

'কিন্তু যত ভালই হোক রানা, নড়াচড়ার জন্যে ওরও জায়গা দরকার। আমি বলতে চাইছি, সুযোগ সুবিধে থাকা দরকার। তা ওর নেই।'

সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী নিউসম তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বললেন, 'এসব ব্যাপারে আমার ভাল ধারণা নেই। তবে মনে হচ্ছে, সমাধানের চাবি রয়েছে হেলিকপ্টারগুলোয়। ওগুলো ধ্বংস করার কি কোন উপায় আছে?'

জেনারেল গারল্যান্ড বললেন, 'উপায় অনেকগুলোই আছে। প্লেন, কামান, রকেট, ওয়ায়্যার-গাইডেড অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল। কেন?'

'ওই হেলিকপ্টারে করেই কবীর চৌধুরী আর তার দলবল পালাবে। পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ব্রিজে থাকতে বাধ্য হবে ওরা। আর ব্রিজে থাকলে সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তখন কি ঘটবে?'

জেনারেল গারল্যান্ড ট্রেজারী সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কিন্তু তাঁর চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটল না। বললেন, সম্ভাব্য তিনটে ব্যাপার ঘটতে পারে। এক, মি. প্রেসিডেন্টের কান কাটার হুমকি দিয়ে একটা ক্রেন চাইবে চৌধুরী। ক্রেনের সাহায্যে বিধ্বস্ত 'কপ্টার দুটো গোল্ডেন গেটে ফেলে দিয়ে আবার কান কাটার হুমকি দিয়ে নতুন এক জোড়া 'কপ্টার চাইবে। দুই, শেল, রকেট বা মিসাইল যাই ছোঁড়া হোক, নিরীহ লোক মারা পড়ার আশঙ্কা প্রচুর। তিন, ভেবে দেখেছেন 'কপ্টার বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে ট্রিগারিং ডিভাইসটাও বিস্ফোরিত হবে? তখন যদি ট্রিগারিঙের কাজটাও বাকি না থাকে? ব্রিজ নদীতে পড়ে গেলে কবীর চৌধুরী আর তার দলবল সবাই মারা পড়বে, ঠিক। কিন্তু সেটা জেনে আমাদের আনন্দ প্রকাশের সময় হবে না। কারণ, সেই সাথে মি. প্রেসিডেন্ট এবং মেহমানরাও পড়বেন পানিতে।'

'তারচেয়ে আমি বরং আমার টাকা গোণার কাজেই লেগে থাকি,' সেক্রেটারি

অভ ট্রেজারী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'আগেই তো বলেছি, এসব ব্যাপারে আমার ভাল ধারণা নেই।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আমার পরামর্শ, আসুন সবাই পাঁচ মিনিট ধ্যান করি। দেখা যাক কেউ আমরা কোন দৈববাণী পাই কিনা।'

তিনি মৌখিক সায় পেলেন না, কিন্তু দেখা গেল সবাই চোখ বুজে রয়েছেন।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন হ্যামিলটন। তারপর জানতে চাইলেন, 'ফলাফল?'

কামরার ভেতর জমাট বেঁধে থাকল নিস্তব্ধতা।

'সেক্ষেত্রে,' হ্যামিলটন বললেন, 'আসুন, রানার কথা মতই কাজ করি আমরা।'

স্পর্ধা-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৫

এক

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্ট আর তাঁর বিদেশী মেহমানদেরকে সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ব্রিজে আটকে রেখেছে কবীর চৌধুরী। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার দাবি করেছে সে। হ্যাঁ না একটা উত্তর পাবার অপেক্ষায় আছে, তারপরই জিম্মিদেরকে নিয়ে চলে যাবে ক্যারিবিয়ানের ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্রে। মার্কিন সরকার কবীর চৌধুরীর লোকের হাতে ওই টাকাটা পৌঁছে দিলে দ্বীপ থেকে মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে, তা না হলে তাঁরা ওখানে কয়েদীর জীবন যাপন করবেন। প্রেসিডেন্টকে খেতে কাজ করে পেট চালাতে হবে, আর পেট্রো ডলারের মালিক প্রৌঢ় বাদশা দুঃখ-সাগর পাড়ি দেবেন বনের কাঠ কেটে।

ইতোমধ্যে সারা দুনিয়ার টিভি দর্শকদের সামনে সবাইকে নিয়ে দু'বার উপস্থিত হয়েছে কবীর চৌধুরী। তার দলের লোকজন এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও পত্রিকার সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারায় কেউ কারও চেয়ে কম পুলকিত হয়নি। খবর-শিকারী রিপোর্টাররা প্রায় সবাই ধনুকের টান টান ছিলার মত সতর্ক হয়ে আছে। হঠাৎ যদি বাতাসের গতি একটু বাড়ে বা কাউকে যদি দ্রুত হাঁটতে দেখা যায়, সাথে সাথে সন্দিহান ও চঞ্চল হয়ে উঠছে তারা। তাই সন্ধে ছ'টায় ব্রিজে অ্যাম্বুলেন্সের ফিরে আসাটা বেশ আগ্রহ আর আলোড়নের সৃষ্টি করল।

ফ্যাশন ফটোগ্রাফার জুলির হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়া কম নাটকীয় ছিল না, তবে তার অভিনয়টা হয়েছিল নিখুঁত। অভিনয়ে কোন ত্রুটি ছিল না ডাক্তারেরও। দু'জনেই জানত, ধরা পড়ে গেলে কবীর চৌধুরীর রোষানলে পড়তে হবে, পরিণতি নির্ঘাত মৃত্যু। কবীর চৌধুরীর মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহের ছোঁয়া লাগলেও, সেটা বাড়েনি। এই ষড়যন্ত্রের হোতা প্রদ্যুৎ মিত্র ওরফে মাসুদ রানা একটা কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিল, কবীর চৌধুরী জুলিকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজি যদি হয়ও, তাকে হয়তো আবার ব্রিজে ফিরে আসতে দিতে চাইবে না। তা না চাইলে রানার আসল উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যেত, কারণ জুলিকে একটা মেসেজ দিয়ে পাঠাচ্ছিল ও, যার উত্তরও পেতে হবে ওকে। ভাগ্য ভাল, সেরকম কিছু ঘটেনি। কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে আবার ব্রিজে ফিরে আসার অনুমতি কৌশলে আদায় করে নিয়েছিল জুলি।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্রথমে নামল ডাক্তার। জুলিকে নামতে সাহায্য করার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু জুলি সেটা প্রত্যাখ্যান করল। এখনও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, আগের চেয়েও যেন নিস্তেজ। সবার আগে কবীর চৌধুরীই তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'বোকা লাগছে নিজেকে।' আস্তিন গুটিয়ে বাহু উন্মুক্ত করল জুলি, খুদে একটা বিন্দু দেখাল কবীর চৌধুরীকে। ইঞ্জেকশনটা তাকে ব্রিজে থাকতেই দিয়েছিল ডাক্তার। 'এই একটাই মাত্র সুঁই দিল, অমনি বৃষ্টির একটা ফোঁটার মত হালকা আর ঝরঝরে হয়ে গেলাম।' দুর্বল একটু হাসল সে, সামান্য একটু মাথা নত করে বাউ করল কবীর চৌধুরীকে, তারপর ধীর, এলোমেলো পায়ে এগোল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর মাঝখান দিয়ে। তিন গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এক সেকেন্ড টলমল করল, শ্বাস নিল বুক ভরে, তারপর প্রায় ধপাস করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। এইটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু দুর্বল হাসিটুকু এখনও লেগে আছে মুখে। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা ভিড় করল তার চারপাশে।

একটু গম্ভীর দেখাল কবীর চৌধুরীকে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থেকে তার চেহারায় কি যেন খুঁজল সে। তারপর বলল, 'কি রকম চিকিৎসা হলো, ডাক্তার? ওকে তো আমার এখনও অসুস্থ লাগছে।'

'যদি বলেন জুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' জবাব দিল ডাক্তার। 'লক্ষণগুলো সব একই আছে, তবে কারণটা ভিন্ন।'

'কারণটা ভিন্ন মানে?'

'ব্রিজ থেকে ওকে যখন নিয়ে যাই, আপনি ওকে তুঙ্গে দেখেছেন, আর এখন দেখছেন উল্টোটা—নিস্তেজ অবস্থায়।'

'ঠিক কি হয়েছিল ওর?'

'হাসপাতালে নিয়ে জানলাম, আমার ধারণাই ঠিক ছিল—কিছু না, উত্তেজনা আর উদ্বেগের ফলে মানসিক ভাবে হয়রান হয়ে পড়েছিল। গুরুতর কিছু না, বলাই বাহুল্য।'

'তা, কি চিকিৎসা হলো?' মনে হতে পারে প্রশ্নগুলো কবীর চৌধুরীর দরদী মনের পরিচয়—চেহারায় কোনরকম সন্দেহের ছায়া নেই। আসলে প্রশ্ন করে নিজের মনে ক্ষীণ সন্দেহের যে রেশটুকু এখনও আছে সে-সম্পর্কে জানতে চাইছে সে।

'কড়া ওষুধ দিয়ে দু'ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওকে,' বলল ডাক্তার। 'ডাক্তার ম্যাকলিন, সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক, ওকে ছাড়তে চাননি, কিন্তু এমন কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে বাধ্য হলাম ফিরিয়ে আনতে।'

'কান্নাকাটি কেন?'

'ওর কথা হলো, এই রকম একটা খবর সংগ্রহের সুযোগ জীবনে একবারই আসে, সেটা সে হারাতে চায় না। ফিরে এসেছে, সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। প্রচুর ঘুমের ওষুধ নিয়ে এসেছি, আমাদের সবাইকে দিন কয়েক ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

'প্রার্থনা করুন, আমাদের সবার স্বার্থে, তার অর্ধেকও যেন আপনার দরকার না হয়।'

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। জুলিকে যারা ঘিরে রয়েছে, নড়ার

নামটি নেই কারও। তারপর কে যেন এসে খবর দিল, কবীর চৌধুরীর বিকেলের অনুষ্ঠানটা আবার নতুন করে প্রচার করছে টিভি। পড়িমরি করে ছুটল সবাই। পুরানো অনুষ্ঠান দেখার এই আগ্রহ লক্ষ্য করে অবাক হলো রানা, আরও অবাক হলো কবীর চৌধুরীর মধ্যে সবার চেয়ে বেশি উৎসাহ দেখে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কারও হাতেই করার মত কোন কাজ নেই। মাত্র একজনকেই টিভির মোহমুক্ত এবং দায়িত্ব সচেতন দেখল রানা, সে হলো বেডলার। খানিক পরপরই তাকে রিয়্যার কোচে উঠতে দেখা গেল। ব্যাপারটা কি?

প্রথম সুযোগেই জুলির পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল জুলি। কিন্তু কথা বলল না।

'তোমার হয়েছে কি?' জানতে চাইল রানা। 'বলতে হবে না, বুঝেছি। নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু লাগিয়েছে।'

'মিথ্যেবাদী লোক আমার দু'চোখের বিষ,' তীব্র ঝাঁঝের সাথে বলল জুলি। 'আর খুনী···খুনীকে আমি ঘৃণা করি। সবচেয়ে ঘৃণা করি তাদের, যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার প্ল্যান করে।' চোখ জোড়া দু'টুকরো সবুজ আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে।

'এসব কি বলছ, কেন বলছ!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা।

'সায়ানাইড গান কার দরকার? কার দরকার খুনে কলম?' গলা বুজে এল জুলির। 'নিজের নামটাও তুমি আমার কাছে গোপন করে গেছ। এমন জানলে···'

'ভালবাসতে না, এই তো?' মুচকি হাসল রানা।

'কি মিষ্টি-মিষ্টি কথা!' আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল জুলি। 'শুনে মনে হয় মৌমাছির গুঞ্জন। কিন্তু তুমি যে কি জঘন্য চরিত্রের মানুষ, সে আমার চেনা হয়ে গেছে।' আকাশের দিকে তাকাল সে। 'আর এই লোককেই কিনা আমার ভয় ভাঙাবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। যীশুকে ধন্যবাদ, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।'

হাসি চাপার জন্যে খুক্ খুক্ করে কাশল রানা। 'আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ, তাও কি আমি পাব না?'

মুখ ফিরিয়ে নিল জুলি। 'একজন নিষ্ঠুর লোকের কথা আমি শুনতে চাই না।'

'তবু আমাকে বলতে হবে। দুটো কথা। এক, অস্ত্রগুলো শুধু ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ব্যবহার করা হবে—খারাপ লোক ভাল লোককে মেরে ফেলছে দেখলে। দুই, তুমি আড়ি পেতেছ।'

'না। ওরা আমাকে কনফারেন্স রূমে বসিয়েছিল।'

'মস্ত একটা ভুল। লোক চিনতে ভুল করেছে তারা।' ঘাড় ফিরিয়ে জুলি দেখল, রানার চেহারা থেকে সরল, হাসিখুশি ভাবটুকু অদৃশ্য হয়েছে। 'আমার হাতে একটা কাজ পড়েছে, কাজটা কিভাবে করতে হবে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, কাজেই যত পারো কম কথা বলবে। যা আনতে বলেছিলাম এনেছ? কোথায়?'

'জানি না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো। আমাকে বলেনি।'

'কেন বলেনি, জানো? মেয়েমানুষ দুর্বল, চেপে ধরে জেরা করলে গড় গড় করে সব বলে দেবে, তাই। ডাক্তারের বুদ্ধি আছে। সব আনা হয়েছে তো?'

'সম্ভবত।' ঘাড় আর কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে জুলির, গলায় কঠিন সুর।

'ডাক্তার তোমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি, সেজন্যে দুঃখ পাবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'আর, ভুলো না, আমাদের সাথে তুমিও গলা অবধি ডুবে আছ। এফ.বি.আই. চীফ আমাকে কোন মেসেজ দিয়েছেন?'

'তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন।'

'মানে?'

'কথা বলেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বলে এক ভদ্রলোক।'

'আচ্ছা! উনি তাহলে সান ফ্রান্সিসকোয় চলে এসেছেন। গুড! কি বললেন তিনি?'

'অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু আমাকে নয়। বলেছেন তোমার ওই ডাক্তারকে।' জুলির গলার স্বরে তিক্ততা। 'তোমার ভাষায়, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও বোকা নন, তাই না?'

'এসব ব্যাপার এত সিরিয়াসলি নিতে নেই,' জুলির হাত চাপড়ে দিল রানা। এতক্ষণে আবার মুচকি হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'চমৎকার কাজ করেছ তুমি। ধন্যবাদ।'

ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল জুলি। 'নিষ্ঠুর হলেও, এক-আধটু ভদ্রতাবোধ তাহলে আছে দেখছি! ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'প্রদ্যুৎ।' আবার মুচকি একটু হাসল রানা, চেয়ার ছাড়ল, সরে এল ওখান থেকে। কঠিন সুরে আরও কড়া কিছু কথা বলার ইচ্ছে ছিল জুলিকে, কিন্তু কবীর চৌধুরীর কারণে তা আর সম্ভব হলো না। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে টিভি অনুষ্ঠানের দিকে উৎসাহ ছিল না তার, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার রানা আর জুলির দিকে তাকাচ্ছিল। তার মানে ওদেরকে তার সন্দেহ হয়েছে বা ওদেরকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ভাবছে, এমন না-ও হতে পারে। ঘাড় ফিরিয়ে সবার দিকেই গভীর দৃষ্টিতে তাকানো কবীর চৌধুরীর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে খুব একটা দূরে বসল না রানা। অনুষ্ঠানের শেষ বিশ মিনিট দেখল ও। ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ারে বিস্ফোরক ফিট করার ঘটনাটা নতুন করে উপভোগ করল কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুচকি মুচকি হাসল সে। অনুষ্ঠান শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে রানার দিকে এগোল।

মনে মনে তৈরি হলো রানা। কবীর চৌধুরী যে ভূমিকাই নিক, তার সামনে নরম হওয়া চলবে না। ওর পাশে থামল সে। 'কি যেন নামটা? প্রদ্যুৎ মিত্র, তাই না? ভেঙেচুরে আমি করেছিলাম···।'

'বলুন।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'সব দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার, বলুন তো?'

'দেখিয়াও না হয় প্রত্যয়,' বাংলায় বলল রানা। ভাবল, অন্য কিছু নয়, নিজের প্রশংসা শুনতে চাইছে লোকটা। নিজে একটা প্রতিভা জানে, তবু কারও মুখ থেকে শুনতে আপত্তি নেই। 'অবিশ্বাস্য, অবাস্তব—এই রকম একটা অনুভূতি। এরকম

একটা ঘটনা ঘটতে পারে না।'

'অথচ ঘটছে, তাই না? শুরুটা অত্যন্ত চমকপ্রদ, নয় কি?'

'আপনার এই কথাটা কোট করতে পারব তো?'

'অবশ্যই। আচ্ছা, ঘটনাটা যেভাবে এগোচ্ছে, তা থেকে ঠিক কি মনে হচ্ছে আপনার?'

'মনে হচ্ছে, আপনি যা চেয়েছেন ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছে। আপনাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দুর্ভাগ্যজনকই বলব, সম্পূর্ণ আপনার দয়ার ওপর বেঁচে আছেন ওঁরা।'

'দুর্ভাগ্যজনক?'

'নয় তো কি! হতে পারে আপনি একটা প্রতিভা, হতে পারে আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, হয়তো এরই মধ্যে টিভি দর্শকরা আপনাকে হিরো বলে ভাবতে শুরু করেছে—তবু, আপনার বিরুদ্ধেই লিখতে হবে আমাকে।'

'তাই?' কবীর চৌধুরীর ঠোঁট থেকে ক্ষীণ হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে।

'যতই নিজের ঢাক পেটান, আমার কাছে আপনি একজন কিডন্যাপার বৈ কিছু না,' বলল রানা।

'আপনার দুঃসাহসের তারিফ করি,' বলল কবীর চৌধুরী, কিন্তু চেহারা হয়ে উঠেছে থমথমে। 'আপনার হাতে ওটা একটা ক্যামেরা। বড় অদ্ভুত ক্যামেরা তো!'

'দেখতে একটু অন্য রকম, হ্যাঁ। তবে এই রকম আরও ক্যামেরা আছে।'

'একটু দেখতে পারি?'

'যদি ইচ্ছে করেন। তবে চার ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?'

'বোঝাতে চাইছি,' বলল রানা, 'আপনার সুযোগ্য দক্ষিণ হস্ত রস পেরটের মনে নোংরা সন্দেহটা চার ঘণ্টা আগে জেগেছিল। ক্যামেরাটা ভাল করে পরীক্ষা করেছে সে।'

'কোন রেডিও পায়নি? কিংবা কোন অস্ত্র, তাও না?'

'নিজেই দেখুন।'

'এখন তার আর দরকার নেই।'

'একটা প্রশ্ন। আমি আপনার মিথ্যে অহমে আঘাত করতে চাই না...'

রানাকে বাধা দিয়ে কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী, 'ঝুঁকি একটু বেশি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'না,' মুচকি হাসল রানা। 'আপনার তরফ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করছি না। কারণ, আমি জানি, রাঘব-বোয়াল ছেড়ে চুনোপুঁটি মারায় আপনার সুখ নেই। তাছাড়া, যে-কোন কারণেই হোক, আমার বিশ্বাস, ভায়োলেন্সের সাহায্য আপনি নেবেন না।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল কবীর চৌধুরী। 'প্রশ্নটা কি?'

'এসবের কি দরকার ছিল?' জানতে চাইল রানা। 'আপনার যা বুদ্ধি, যে-কোন ব্যবসায় ভাল করতে পারতেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন, অসৎ ব্যবসায় ভাল করতে পারতাম? তা সে যে

ব্যবসাই হোক, মোটা টাকা আয় করতে হলে, টাকাটা অসৎ পথে না এসে পারে না।'

'তাতে অন্তত এ ধরনের ঝুঁকি নেই।'

'নীরস লাগে। তারচেয়ে বড় অসুবিধে, সময় অনেক বেশি লাগে। আমার অনেক টাকা একসাথে দরকার, এবং খুব তাড়াতাড়ি দরকার।' একটা সেকেন্ড থেমে পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু এই পেশায় আপনি কেন? ক্যামেরাম্যান বলে মনে হয় না আপনাকে, মানায়ও না।'

'চোখের ভুল। ক্যামেরা চালাতে জানলেই যথেষ্ট, ক্যামেরাম্যানের আলাদা কোন চেহারা দরকার হয় না। রোজ সকালে দাড়ি কামাবার সময় নিজের চেহারা দেখেন আপনি। সেখানে একজন ক্রিমিন্যালকে দেখতে পান কি? আমি তো মানবসেবায় নিয়োজিত প্রতিভাবান এক বৈজ্ঞানিককে দেখছি।'

'খেপিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করতেও জানেন দেখছি। আপনি যেন কোন্ পত্রিকার?'

'দ্য নিউজের।'

'পত্রিকাটা লন্ডন থেকে বেরোয়, কিন্তু আপনি একজন ভারতীয়।'

'হ্যাঁ। পশ্চিম বাংলা।'

'প্রদ্যুৎ মিত্র,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কই, এর আগে নামটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'আমি ছদ্মনামে লিখি।'

'সেটা...?'

'বলা যাবে না, সম্পাদকের নিষেধ আছে।'

'আমার পরিচিত এক ছোকরার সাথে আপনার চেহারার কোন মিল না থাকলেও, কেন যেন আপনাকে দেখে তার কথাই বার বার মনে পড়ছে আমার।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী। 'মাসুদ রানা নামে কাউকে আপনি চেনেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'প্রদ্যুৎ...দূত...মানে, চর...'

হেসে উঠল রানা, বলল, 'এর আগেও আপনি আমাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছেন।'

'না-না, তা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল কবীর চৌধুরী। 'তা, প্রেসিডেন্টের সাথে কি মনে করে?'

'বাদশা আর প্রিন্সের সাথে তেল আলোচনায় প্রেসিডেন্ট কত দূর এগোলেন তার রিপোর্ট লিখতে।'

'তারপর?'

'ইচ্ছে ছিল, এই নিউজটা কাভার করে পিকিং যাব।'

'কবে?'

'কাল।'

'কাল? তার মানে আজ রাতেই আপনি ব্রিজ থেকে চলে যেতে চাইবেন। আগেই অবশ্য বলেছি, যে-কেউ ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে, কোন বাধা

নেই।'

'বাধা নেই, কিন্তু এই মজা ছেড়ে চলে যাব—অতটা পাগল হইনি।'

'পিকিং অপেক্ষা করতে পারে তাহলে?'

'পারে। অবশ্য আপনার যদি চীনের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার কোন প্ল্যান থাকে, দড়ি ছিঁড়ে ছুট দেব চীনের পথে।'

হাসি মুখে বিদায় নিল কবীর চৌধুরী, কিন্তু হাসিটুকু তার চোখ স্পর্শ করল না।

রিয়্যার কোচের খোলা দরজার পাশে ক্যামেরা রেডি করে দাঁড়াল রানা। জানতে চাইল, 'কোন আপত্তি নেই তো?'

ঘুরে দাঁড়াল বেডলার। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চেহারায়, তারপর হাসল। 'আমাকে এই সম্মান দেখাবার কারণ কি?'

'রুই-কাতলাদের ছবি কত আর তোলা যায়? মি. চৌধুরীর ছবিও তো কম তুললাম না। ঠিক করেছি, তার চেলা-চামুণ্ডাদের এক সেট ছবি তুলব। রাজি তো? আপনি বেডলার, তাই না? টেলি-কমিউনিকেশন এক্সপার্ট?'

'সবাই তাই বলে আর কি।'

বেডলারের দু'তিনটে ছবি তুলল রানা, ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল ওখান থেকে। লোক দেখানোর জন্যে কবীর চৌধুরীর আরও কিছু লোকের ছবি তুলল ও। লক্ষ্য করল, কবীর চৌধুরীর আকাশচুম্বি আত্মবিশ্বাস আর হাসি-খুশি ভাব এদেরকেও ছুঁয়ে আছে। রানার অনুরোধ একজনও ফেলল না, সবাই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পোজ দিল। শেষ লোকটার ছবি তুলে ব্রিজের পশ্চিম পাশে চলে এল ও, ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে বসল।

কয়েক মিনিট পর ডাক্তারকে দেখা গেল, অলস পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। হাত দুটো সাদা কোটের পকেটে ঢোকানো। কয়েকশো ছবি আর কয়েক হাজার রিপোর্ট এরই মধ্যে দক্ষিণ টাওয়ার থেকে ডিসপ্যাচ করা হয়েছে, এই মুহূর্তে কম করেও বিশ-বাইশজন ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারের হাতে কোন কাজ নেই—ব্রিজের এখানে সেখানে ভবঘুরের মত টহল দিয়ে বেড়ানো ছাড়া কিইবা তারা করতে পারে। ডাক্তারের দিকে মাত্র একবার তাকাল রানা, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। এগিয়ে এসে ওর পাশে বসল ডাক্তার।

'দেখলাম জুলির সাথে আপনি কথা বলছিলেন। মনে হলো, খুব রেগে ছিল। সুন্দরী মেয়েরা অবশ্য একটু মেজাজীই হয়ে থাকে।'

'যা যা বলেছিলাম সব এনেছেন?'

'অস্ত্র এবং নির্দেশ, দুটোই।'

'সব আড়াল করা আছে তো?'

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'কলম দুটো সবার চোখের সামনে রেখেছি, আমার মেডিকেল ক্লিপবোর্ডে ঝুলছে।'

'গান?'

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটে। ওটা সীল করা, ইউনিট বের করতে হলে সীল

ভাঙতে হবে। ইউনিটটাও সীল করা। ওটা খুললেও কেউ কিছু দেখতে পাবে না, কারণ গানটা রাখা হয়েছে একটা ফলস বটমে। ফলস বটম কিভাবে খুলতে হয়, জানতে হবে। আমি জানি।'

'নবিশ হিসেবে কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন বলে মনে হচ্ছে?'

'এতদিন খারাপ ভাল সব ধরনের মানুষকে বাঁচাবার কাজে সাহায্য করেছি,' নিঃশব্দে হাসল ডাক্তার। 'এখন দেখছি, সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করার চাইতে শুধু ভাল লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করার মধ্যে অনেক বেশি যুক্তি আছে। উত্তেজনার খোরাকও এতে বেশি।'

'কিন্তু এই রকম অদ্ভুত একটা ইউনিট আপনাদের হাসপাতালে এল কোত্থেকে?'

'ছিল না, আজই নতুন আমদানী হলো। কৃতিত্বটা জর্জ হ্যামিলটন নামে এক অ্যাডমিরালের। তাঁর নির্দেশে একদল এক্সপার্ট সমস্ত আয়োজন করেছে। যতদূর বুঝতে পারলাম, এক্সপার্টরা সবাই সি.আই.এ-র লোক।'

'তারমানে, ওদের গোপন তালিকায় আপনার নাম লেখা হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'ভবিষ্যতে আপনার উপযুক্ত কোন কাজ হাতে এলে, আপনাকে ওরা ডাকবে।' ও দেখল, ডাক্তারের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমার কর্ড আর কনটেইনার?'

'চারটে কনটেইনার। খালি। গায়ে লেবেল সাঁটা আছে, লেবেলে ছাপা রয়েছে—ল্যাব স্যাম্পল্। দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারে? কাঠের একটা চৌকো ফ্রেমওয়র্কের গায়ে জড়ানো হয়েছে কর্ড, এক দিকে দুটো হুক আর দুটো টোপ।'

'ব্রিজে দাঁড়িয়ে গোল্ডেন গেটের মাছ ধরতে চান আপনি?'

হাসি চাপল ডাক্তার। 'ধরবেন আপনি, কিন্তু আমি ভাগ নেব।'

'নার্ভ গ্যাসের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস না করলেও চলে, কি বলেন?'

'নার্ভ গ্যাসের কথা জানি না, তবে অ্যারোসল ক্যান-এর কথা জানি। আমার নোট-ডেস্কের ঠিক ওপরেই ঝুলছে। ওখানে যে যাবে সে-ই দেখতে পাবে। দেশের বিখ্যাত এক কোম্পানির তৈরি। সাত আউন্সের একটা ক্যান। এফেকটিভ রেঞ্জ দশ ফিট।'

'বিখ্যাত কোম্পানি এসব জানে?'

আবার হাসি চাপল ডাক্তার। 'কিভাবে! সি.আই.এ. কি আর তাদের অনুমতি নিয়ে এসব যোগ করেছে! ক্যানের পিছনে লেখা আছে, "সুগন্ধি এবং ঝাঁঝাল"। তার নিচে লেখা, "বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে রাখুন"। ক্যানের সামনে আছে, "চন্দন"। আমি ভাবছি, কিছু একটা সন্দেহ করে কবীর চৌধুরী কিংবা তার কোন লোক যদি গন্ধটা শুঁকতে চায়, তখন কি হবে?'

'চাইবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'আজ রাতে কোন এক সময় কলম দুটো নিয়ে আসব আমি। এবার বলুন, অ্যাডমিরাল কি বলেছেন?'

'কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অ্যাডমিরালের মুখ থেকে সেটা পেয়েছি আমি,' বলল ডাক্তার। 'ওখানে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ফিদার হোপ, জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং

সেক্রেটারি অব ট্রেজারী ও সেক্রেটারি অভ স্টেট ছিলেন।'

'আরও দু'জন ছিলেন,' বলল রানা। 'আপনি আর জুলি।'

'আমরা নগণ্যরা জানি আমাদের কি ভূমিকা। কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে আমরা মুখ খুলিনি। গোল্ডেন গেট ব্রিজে বিদ্যুৎ চালানোর পরামর্শটা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সম্ভব নয়। কারণ, আমরা যেখানে বসে আছি এখানে প্রেসিডেন্ট বা বাদশা বসে থাকতে পারেন। তাছাড়া ভোল্টেজ প্রডিউস করা সম্ভব হলেও, ওয়াটেজ সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, হাজার হাজার টন ইস্পাত রয়েছে এখানে। আরেকটা কথা, ঠিক ওই সময় শত্রুদের সাথে মাটির যোগাযোগ থাকতে হবে। একটা হাই-টেনশন তারে একটা পাখি নিরাপদে বসে থাকতে পারে, তাই না?'

'বলে যান।'

'আপনি লেজার বীম সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছিলেন। এক্সপ্লোসিভ বেল্টের আবরণ লেজার বীম ছিঁড়তে পারবে কিনা। এক্সপার্টরা বলেছেন, পারবে। কিন্তু মুশকিল হলো, একটা লেজার বীম যখন নিরেট একটা জিনিসে আঘাত হানে তা থেকে ভয়ঙ্কর উত্তাপ বেরিয়ে আসে, সেই তাপে ডিটোনেটরের ভেতরের তারে আগুন ধরে যাবে।'

'তারমানে, বুম?'

'ঠিক আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন,' বলল ডাক্তার। 'তবে চারটে ব্যাপারে আপনার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন ওরা।'

'যেমন?'

'সাবমেরিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তবে পানির তলা দিয়ে জায়গামত পৌঁছানো অত্যন্ত জটিল একটা ব্যাপার বলে ভাবছেন ওঁরা, তারপর ওখানে পৌঁছে বোটটাকে পজিশনে রাখাও বেশ কঠিন। ঢেউ ছাড়াও পানির স্তর ভেদে কয়েক ধরনের বেয়াদব স্রোত রয়েছে গোল্ডেন গেটে। আশার কথা, অ্যাডমিরালের জানাশোনা যোগ্য এক লোক আছে, এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু সে-ই সামলাতে পারবে।'

'গুড।'

'এ-ব্যাপারে আর কোন পরামর্শ আপনার কাছ থেকে না পেলে, ফ্রন্ট কোচ অর্থাৎ প্রেস কোচের সামনে পজিশন নেবে বোট।'

'ঠিক আছে,' বলে এদিক ওদিক তাকাল রানা। কেউ ওদের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছে না, একমাত্র জেনারেল পীল ছাড়া। ভদ্রলোক নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে আপস করতে রাজি নন, ব্রিজের মাঝখানে হাঁটাচলা করে ব্যায়ামের অভাবটুকু পূরণ করে নিচ্ছেন। মাঝে মধ্যেই মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছেন ওদের দিকে। এই দৃষ্টির বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। সামনে কাউকে দেখলেই ওভাবে তাকান তিনি। স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার, জেনারেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও শরীরের অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করছেন। তবে কারও দিকে তাকাচ্ছেন না তিনি, তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে জুতোর ডগার ওপর। পাশাপাশি হাঁটছেন, কিন্তু জেনারেলের সাথে কথা বলছেন না। দু'জনের প্রকৃতি এবং চরিত্রের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, দু'জন যেন দুই মেরুর বাসিন্দা।

'আপনার এই পরামর্শটা ওঁদের খুব মনে ধরেছে,' বলে চলেছে ডাক্তার। 'দক্ষিণ টাওয়ারটাকে দখল করা যেতে পারে। আপনি বলেননি পুব নাকি পশ্চিম দিকটা, তাই একটু দ্বিধায় পড়ে গেছেন ওঁরা। মিটিওরলজিক্যাল ফোরকাস্ট অবশ্য ভালই। সকাল হবার আগেই ভারী, ঘন কুয়াশা আশা করা হচ্ছে। দশটা পর্যন্ত থাকবে। কাল বাতাস বইবে পশ্চিম দিকে, কাজেই তেল-পোড়া ধোঁয়া দিয়ে আড়াল তৈরি করা যাবে না। কিন্তু ওই যে বললাম, ওঁরা এখনও জানেন না টাওয়ারের কোন্ অংশটা দখল করতে হবে।'

'একটা জিনিসের কথা বলতে ভুল করেছি। হুড লাগানো ফ্ল্যাশলাইট, শাটার সহ...'

'এনেছি।'

'কবীর চৌধুরী বা তার কোন লোক যদি দেখে?'

'মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। নাক-কান-চোখ ইত্যাদি পরীক্ষা করতে লাগে। ওটা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি মোর্স সিগন্যাল পাঠাবেন...?'

মৃদু কণ্ঠে রানা বলল, 'রাত জেগে বই পড়ার অভ্যেস কিনা, তাই দরকার ওটা।'

চেহারা দেখে মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি ডাক্তার, বলল, 'ব্রিজের পুব থেকে কমবেশি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী ডান দিকে তাক করতে হবে। ওদিকে ওদের দু'জন লোক থাকবে সঙ্কেত পাবার জন্যে, সারারাত ওরা আপনাকে পাল্টা সঙ্কেত পাঠাতে পারবে না, তবে আপনার সঙ্কেত পেয়েছে এটা বোঝাবার জন্যে চায়নাটাউন থেকে আকাশে একটা রকেট ছুঁড়বে ওরা।'

'একটা?'

'হ্যাঁ, একটা রকেট দেখলে কবীর চৌধুরী সন্দেহ করবে, তাই ঠিক হয়েছে রকেটের সাথে আরও কিছু আতসবাজি ছাড়া হবে। এই শহরে বোমা, পটকা, তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি জ্বালানো নিষেধ। কিন্তু চায়নাটাউনে ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখে পুলিস। চীনারা এসবের খুব ভক্ত কিনা, বেশি কড়াকড়ি করলে দাঙ্গা বেধে যাবার ভয় আছে। চীনাদের নিউ ইয়ারে কি কাণ্ড যে হয় তা যদি দেখতেন...'

'তারপর?'

মাথা চুলকাল ডাক্তার। 'এখনও আপনি জানেন না দক্ষিণ টাওয়ারের কোন্ অংশটা...'

'জানব।'

'আমাকে কাজে লাগাতে চান?'

'জুলিই তো রয়েছে। এরপর কোন্ কেব্‌লে্ কখন এক্সপ্লোসিভ ফিট করা হবে, একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারবে সে। তারপর?'

'খাবারে বিষ,' বলল ডাক্তার। 'আপনার এই পরামর্শটাও ওদের খুব পছন্দ হয়েছে।' গলা আরও খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল সে, 'আজ সন্ধের খাবারে। ডা. ইসহাক, আমাদের হাসপাতালের নারকোটিক জাদুকর, সতেরোটা অপ্রীতিকর বিস্ময় তৈরি করছেন।'

'কিন্তু বিস্ময়গুলো চেনার উপায় কি?' একটু যেন উদ্বিগ্ন হলো রানা।

'ওটা কোন সমস্যাই নয়। এয়ারলাইন প্লাস্টিক ট্রে-তে করে খাবার পাঠানো হবে। ওগুলোর নিচে খুদে পায়া থাকে। খারাপ ট্রেগুলোর পায়ার তলায় খাঁজ কাটা থাকবে। সূক্ষ্ম, কিন্তু আঙুলের ডগায় অনুভব করা যাবে।'

'মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা, ডাক্তার,' বলল রানা। 'কোন্ দিক থেকে বিপদ আসবে, কিছুই আগে থেকে বলা যায় না। সব দিক থেকে সাবধান থাকব আমরা, তারপরও যদি বিপদ আসে, আসুক, অবস্থা বুঝে সামাল দেয়া যাবে। প্রথম কাজ, কবীর চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে আমি হব হেড ওয়েটার। দুই, খাবার নিয়ে ওয়াগন এসে পৌঁছলেই জুলিকে পরীক্ষা করার অজুহাতে ওকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে যাবেন আপনি, খাবার পরিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন আপনারা।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, আপনাদের দু'জনকেই সন্দেহ করা হবে—ব্রিজ থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন আপনারা। তিন, খবরটা প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পৌঁছে দেব আমি।'

'কিভাবে?'

'উপায় একটা বের করে ফেলব।'

'আর প্রেস কোচে ওরা যারা রয়েছে?'

'ওদেরকেও সাবধান করতে পারব, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভিলেনদের দু'একজন যদি বিষ ছাড়া খাবার পেয়ে সুস্থ থাকে, তাদের আমি সামলাতে পারব।'

'আপনি রিপোর্টার, ওরাও রিপোর্টার,' ডাক্তার অসন্তুষ্ট, 'ওদের প্রতি একটু বিশেষ নেক নজর...'

'আমি অন্ধকারে যুদ্ধ করছি, ডাক্তার,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমি অন্ধ, এবং আমার হাত দুটো পিছনে বাঁধা। কিসে কতটুকু ঝুঁকি তার চুলচেরা বিচার করে এগোতে হবে আমাকে। সাংবাদিকদের মধ্যে একজন লোভী লোক নেই, বুঝব কিভাবে? ওদেরকে সাবধান করলে কথাটা যদি কবীর চৌধুরীর কানে চলে যায়?'

'আই অ্যাপলোজাইজ!'

'আপনাকে ওরা নরকঙ্কাল, খুলি বা ওই ধরনের কিছু দেয়নি?'

'কি?' ডাক্তারের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'কিংবা এক-আধটা জাদু-ই-চেরাগ?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। 'এসবের মানে কি?'

'না, ভাবছিলাম,' বলল রানা।

'কি ভাবছিলেন?'

'কবীর চৌধুরীকে ঘোল খাওয়ানো কোন সমস্যাই হত না,' বলল রানা। 'যদি কোনভাবে একবার অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম।'

ডাক্তার গম্ভীর। গলটাকে ভারী করে তুলে বলল, 'দুঃখিত। আপনার অর্ডারের মধ্যে এসব ছিল না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পথ ধরল সে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল রানা। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই বসে আছে জুলি। পাশের চেয়ারে বসল রানা। 'সন্ধের খাবার নিয়ে ওয়াগন এলে অ্যাম্বুলেন্সে চলে যাবে তুমি,' বলল ও। 'ডাক্তার তোমাকে আরেকবার চেক আপ করবে।'

রানার দিকে তাকাল না জুলি। 'ইয়েস, স্যার। আপনি যা বলেন, স্যার।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল রানা। 'যতদূর মনে পড়ছে, একটু আগে বিদায় নেয়ার সময় আমরা বন্ধু ছিলাম।'

'কোন যুগেই কি মেয়েরা ছেলেদের সত্যিকার বন্ধু হতে পেরেছে?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল জুলি। 'আমরা তো পুতুল। আমাদের মন বলে কিছু থাকতে নেই...'

'সে-কথা যদি বলো, আমরা সবাই পুতুল, জুলি,' বলল রানা। 'আমাকেও অর্ডার করা হয়, আমি সেটা মেনে চলি। সব অর্ডার সব সময় পছন্দ হয় না, তবু কাজ বন্ধ করে বসে থাকলে চলে না। পরিস্থিতি এমনিতেই জটিল, সেটাকে আরও জটিল করে তুলো না, প্লীজ। ওখানে গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারবে অ্যাম্বুলেন্সে কেন তোমার থাকা দরকার।'

'ইয়েস, মি. মিত্র। আপনার সিক্রেট সার্ভিসে জোর করে ঢোকানো হয়েছে আমাকে, কাজেই আপনার নির্দেশ মত কাজ করতে আমি বাধ্য।'

হাসিটা চেপে গেল রানা। 'তার আগে, আরও একটা কাজ। কবীর চৌধুরীর সাথে কথা বলতে হবে তোমাকে। যদি দরকার হয়, একটু ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে...'

'আপনি যদি বলেন, আমি তার কোলেও বসতে পারি, স্যার।'

'এসব ব্যাপারে তাকে আমি ধোয়া তুলসী পাতা বলে জানি,' বলল রানা। 'কাজেই কোলে ওঠার চিন্তা-ভাবনা বাদ দাও। তাতে হিতে-বিপরীত ঘটতে পারে।'

ঘাড় ফেরাল জুলি। সবুজ চোখে সবুজ আগুন জ্বলছে। 'কেন?'

'তার কাছ থেকে জানবে, এরপর কোন্ কেব্‌লে কখন এক্সপ্লোসিভ ফিট করার কথা ভাবছে সে। আমি যাচ্ছি, একটু পর তার সাথে কথা বলবে তুমি। ঠিক আছে?'

'এখন পর্যন্ত আছে।' হাসল জুলি, তিক্ত হাসি। 'কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, নিজের মত আমাকেও, স্যার, আপনি একটা দুষ্টগ্রহ বানিয়ে তবে ছাড়বেন।'

'চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, বাকি খোদার ইচ্ছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। ফিরে এসে ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে আগের জায়গায় বসল ও। এখান থেকে ব্রিজের নিষিদ্ধ এলাকা মাত্র বিশ গজ দূরে, সাদা রেখার ওদিকে একজন লোক পাহারায় রয়েছে, তার হাতে একটা স্মাইযার মেশিন-পিস্তল। আগের মতই সামরিক কায়দায় পায়চারি করছেন জেনারেল পীল, এই মুহূর্তে এদিকে এগিয়ে আসছেন তিনি। উঠে দাঁড়াল রানা, ক্যামেরা তুলল, পর পর তিনটে ছবি তুলল জেনারেলের। তারপর জানতে চাইল, 'আপনার সাথে দুটো কথা বলতে পারি, জেনারেল?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল। 'না। কোন সাক্ষাৎকার নয়। এই সার্কাসে আমি একজন দর্শক, পারফরমার নই।' আবার তিনি হাঁটা ধরলেন।

ইচ্ছে করেই কথায় অনুরোধের সুর আনল না রানা। 'কিন্তু কথা বলার দরকার।'

আবার দাঁড়ালেন জেনারেল। রানার চোখ হয়ে তাঁর দৃষ্টি যেন মগজে গিয়ে ঠেকল। 'কি বললেন?' অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, শব্দ দুটোর মাঝখানে যথেষ্ট বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। রানা যেন প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে, কোর্ট-মার্শালে সাজা পাওয়া একজন অফিসার। ওর অস্ত্র, পদক আর ব্যাজ খুলে নেয়া হবে।

'আমাকে এড়িয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না, জেনারেল,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সেটা পছন্দ করবেন না।'

'জর্জ?' প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে জেনারেল পীল জানেন, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন একটা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাছাড়া, হ্যামিলটনের ব্যক্তিগত বন্ধুও বটেন তিনি। 'অ্যাডমিরালের সাথে আপনার সম্পর্ক?'

'আপনি বরং আমার পাশে এসে বসুন, জেনারেল,' বলল রানা। 'শান্ত, স্বাভাবিক থাকুন, তা না হলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।'

শান্ত এবং স্বাভাবিক হওয়া জেনারেলের স্বভাবের মধ্যেই নেই, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তিনি। রানার পাশে বসে জানতে চাইলেন, 'আই রিপিট, অ্যাডমিরালের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?'

'সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। শুধু এইটুকু জানুন, এই বিপদ থেকে প্রেসিডেন্টকে আমি বাঁচাতে চাইছি, জর্জ হ্যামিলটন তাতে সায় দিয়েছেন।'

রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে জেনারেল জানতে চাইলেন, 'পরিচয়?'

'মাসুদ রানা, বাংলাদেশ। কিন্তু কবীর চৌধুরীর কাছে প্রদ্যুৎ মিত্র।'

'রানা! রানা! জর্জের মুখে বোধহয় নামটা শুনেছি। এবং বোধহয় মাত্র একবার নয়।' রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল। 'এ ফ্রেন্ড ইন নীড ইজ আ ফ্রেন্ড ইনডীড। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা।' মুচকি একটু হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'বোঝা যাচ্ছে, ফাল হয়ে বেরোবার চেষ্টা করবেন আপনি, কিন্তু সুঁই হয়ে ঢুকলেন কিভাবে এর মধ্যে?'

'আমার রিপোর্টার পরিচয় আপনার বোধহয় জানা নেই,' বলল রানা। 'লন্ডনের দ্য নিউজে কাজ করি। তেল আলোচনা কাভার করার জন্যে আপনাদের সহযাত্রী হয়েছিলাম।' উঠে দাঁড়াল রানা, জেনারেলের আরও কয়েকটা ছবি তুলল। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'ওদের চোখে ধুলো দিচ্ছি। একটা কথা, জেনারেল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচে আপনার যারা কলিগ রয়েছেন ওদেরকে কিন্তু বলবেন না...'

'কলিগ? সব এক একটা ভাঁড়!'

'আমার সাথে আপনার কথা হয়েছে, ভাঁড়দের কেউ যেন তা জানতে না পারে।'

'আমার মন্তব্য সংশোধন করতে চাই। প্রেসিডেন্ট আমার ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'সবাই সেটা জানে, জেনারেল। প্রেসিডেন্ট আর একদল ভাঁড়। মেয়রকে অবশ্য ওদের দলে ফেলা যায় না। ওদের দু'জনের সাথে আপনি যদি গোপনে কথা বলতে চান, কোথাও হাঁটাহাঁটি করার সময় কাজটা সারবেন। কোচে আড়িপাতা যন্ত্র আছে।'

'আপনি যদি বলেন, তাহলে আছে, মি. রানা।'

'জেনেই বলছি, জেনারেল,' বলল রানা। 'আর, আপনি আমাকে শুধু রানা বলবেন।'

'জেনে বলছ?'

'হ্যাঁ। রিয়্যার কোচে বন বন করে ঘুরছে একটা টেপ-রেকর্ডার। আপনি দেখেছেন। আমি দেখিনি।'

'হ্যাঁ,' রানার কথার অর্থ বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল, 'আমি দেখেছি। কিন্তু তোমাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।' জেনারেল জানেন, রানা চাইছে ওর ভূমিকা যেন ফাঁস না হয়ে পড়ে।

'আপনার, জেনারেল, আমাদের পেশায় যোগ দেয়া উচিত।'

'তুমি তাই মনে করো?'

'এবার আমি আমার মন্তব্য পাল্টাতে চাই। একজন চীফ অভ স্টাফ আরও ওপর দিকে উঠতে পারেন না। তাঁর একমাত্র গতি নিচের দিকে। শুধু পতন ঘটতে পারে।'

'ঝিলিক মারে এই রকম বুদ্ধি অনেক দিন পর দেখলাম।' জেনারেলের হাসিতে প্রশংসা ঝরে পড়ল। 'এবার তাহলে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো আমাকে, ওয়ান্ডার-বয়!'

আবার দাঁড়াল রানা, খানিকটা পিছু হটল, ছবি তুলল আরও কয়েকটা। ফিরে এসে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এল জেনারেলকে—সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে জেনারেল পীল জানতে চাইলেন, 'আমাকে কি করতে বলো?'

'আমি? আপনাকে? কিছুই না, জেনারেল। একজন চীফ অভ স্টাফকে কেউ নির্দেশ দিতে পারে না।'

চীফ অভ স্টাফ এতক্ষণে চীফ অভ স্টাফ হলেন। 'কাজের কথা, রানা!'

'আপনার বন্ধুদের নিয়ে কোচের বাইরে বাতাস খেতে বেরোবেন,' বলল রানা। 'বলবেন, কোচে আড়িপাতা যন্ত্র আছে। জানাবেন খাবারের নিরাপদ ট্রে কিভাবে বেছে নিতে হবে।'

'কোন সমস্যা নয়। ব্যস?'

'শেষ আরেকটা কথা, জেনারেল। একটু ইতস্তত বোধ করছি, কিন্তু আপনি কাজের কথা পছন্দ করেন। অনেকেই জানে, অন্তত আমি জানি, সাধারণত আপনার কাছে একটা অস্ত্র থাকে।'

'এক সময় ছিল। আমাকে ভারমুক্ত করা হয়েছে।'

'হোলস্টারটা এখনও রয়েছে।'
'কোথাকার চোখ হে তোমার?'
'সোনার বাংলাদেশের।' চারদিকে চোখ বুলাল রানা, তারপর আবার বলল, 'যদি বইতে রাজি থাকেন, আপনাকে আমি একটা পয়েন্ট টু দিতে পারি।'
'ইট উইল বি আ প্লেজার।'
'বুলেটগুলোর ডগায় সায়ানাইড লাগানো আছে, জেনারেল।'
একটুও ইতস্তত না করে জেনারেল পীল বললেন, 'তাহলে তো আরও ভাল!'

দুই

সন্ধের খাবার নিয়ে ওয়াগন পৌঁছল সাড়ে সাতটায়। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরা রঙ করা উত্তর ব্যারিয়ারের কাছাকাছি একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সম্ভবত গভীর কোন আলোচনায় মগ্ন। ক্লান্ত পায়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল জুলি, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একজন গার্ড। চারপাশে অনেক খালি চেয়ার, মাঝখানের একটায় বসে ঝিমাচ্ছে রানা। ওর কাঁধে একটা হাত পড়তেই চমকে উঠে সিধে হলো ও।
'আহার, গুপ্তচর মশাই!' নিজের রসিকতায় নিজেই গলা ছেড়ে খানিক হাসল কবীর চৌধুরী।
'পৌঁছে গেছে?'
'হ্যাঁ। ওয়াইন আছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন না যে?'
'ওতে আমার রুচি নেই,' বলল রানা। 'তবে বিয়ারে আপত্তি নেই।'
'রিপোর্টারের মদে অরুচি, আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন, মি. দূত।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'বিয়ারও আছে, অঢেল। বাজারের সেরা জিনিস।'
'কার টাকায়?'
'এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।' কবীর চৌধুরীর চোখে পলক নেই, রানার চেহারায় কি যেন খুঁজছে সে।
চেয়ার ছাড়ল রানা, নিজের চারদিকে তাকাল। 'আপনার সম্মানীয় মেহমানরা...'
'ওদেরকে জানানো হয়েছে।'
'প্রেসিডেন্টের মেহমানরা না হয় বাদ, ওরা মুসলমান—কিন্তু আর সবাইকে ডিনারের আগে ককটেলের জন্যে একটু সময় দেয়ার দরকার ছিল।'
'সময় আছেও। খাবার রয়েছে গরম কাবার্ডে,' রানার মুখে আরও কয়েক সেকেন্ড কি যেন খুঁজল কবীর চৌধুরী। 'জানেন, মি. দূত, আপনি আমাকে আগ্রহী করে তুলেছেন। ঠিক আগ্রহী নয়, কৌতূহলী—নাহ্, আপনি আমাকে অস্বস্তির মধ্যে

ফেলে দিয়েছেন। আপনার কিসের সাথে কি যেন ঠিক মিলছে না। একটা ক্যামেরার পিছনে এখনও আমি আপনাকে খাপ খাওয়াতে পারছি না।'

মুচকি হাসল রানা, জোর করে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় শুরু করেছে। 'একই কথা আপনার সম্পর্কেও। আপনার চেহারা, ভব্যতা বোধ, রুচি, বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস—এসবের সাথে আপনার এই কাজটাকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। এই কাণ্ড নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না, আপনি একজন দুষ্ট লোক।'

আবার রানার কাঁধ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'চলুন, প্রেসিডেন্টের স্বার্থে খাবারগুলো মুখে দিয়ে টেস্ট করা যাক।'

'ব্যাখ্যা করুন।'

'প্রেসিডিয়োর ডাক্তার বন্ধুরা খাবারে কিছু মেশায়নি, বুঝব কিভাবে?'

'আরে, কথাটা ভাবিনি তো! তার মানে, কাউকে আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'কাউকে না।'

'কিন্তু আমাকে কেন? আমাকে আপনার রিপোর্টার মনে হয় না, গিনিপিগ মনে হয়?'

'কি মনে হয় বলব না,' কবীর চৌধুরী বলল। 'তবে গিনিপিগ হিসেবে আপনাকেই আমার পছন্দ। আপনি আর জেনারেল পীল, আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।'

'চোরের মন পুলিস পুলিস,' বলল রানা। 'অন্যায় কাজ করলে এই রকম হয়, কোন কারণ ছাড়াই সন্দেহ আর অস্বস্তি জাগে। পথ দেখান, মি. চৌধুরী।'

ওয়াগনের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। সাদা আর নীল রঙের ইউনিফর্ম পরা অ্যাটেনড্যান্টকে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'নাম?'

কয়েক সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকার পর প্রায় লাফ দিয়ে উঠে স্যালুট ঠুকল লোকটা। 'বোনি, মি. চৌধুরী।'

'ক'রকম ওয়াইন এনেছ, বোনি?'

'তিনটে সাদা, তিনটে লাল, মি. চৌধুরী।'

'আমাদের সামনে সাজাও, বোনি,' বলল কবীর চৌধুরী। ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে। 'মি. দূত ওয়াইনের একজন ইন্টারন্যাশনাল সমঝদার, জিভে একবার ঠেকিয়েই ভাল-মন্দ বলে দিতে পারবেন।'

'ইয়েস, স্যার।'

'কিন্তু…'

'আপনি মদ খান না, এই তো?' রানাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু বুঝছেন না কেন, এটা আমার হুকুম। আপনি আমার হুকুম অমান্য করতে চান?'

রানা চুপ। বোনির পিছু পিছু ওয়াগনে উঠল ওরা। কাউন্টারে ছয়টা বোতল আর ছয়টা গ্লাস রাখা হলো। 'প্রতিটা গ্লাসে সিকি আউন্স করে,' বলল রানা। 'আমি বমি করি, তাতে ভেসে মি. চৌধুরী গোল্ডেন গেটে গিয়ে পড়ুন, সেটা চাই না। তোমার কাছে রুটি আর লবণ আছে তো হে?'

'আছে, স্যার।' বোনির সতর্ক হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, তার ধারণা দুই উন্মাদের খপ্পরে পড়ে গেছে সে।

লবণ মেশানো রুটি মুখে দেয়ার ফাঁকে সবগুলো গ্লাস থেকে মদের স্বাদ নিল রানা। শেষে বলল, 'সব ক'টা প্রথম শ্রেণীর।' তারপর কবীর চৌধুরীর কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ভাল-মন্দ কিছুই আমি বুঝিনি। তবে বিষ-টিষ বোধহয় নেই। থাকলে এতক্ষণে পটল তুলতাম, কি বলেন?'

কবীর চৌধুরীও রানার কানে কানে বলল, 'আপনি আমার কাছে একটা জিনিস পাওনা হয়েছেন, মি. দূত।'

'কি?' চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্ষমাপ্রার্থনা।'

'সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না,' বলল রানা। 'আপনার তো নিশ্চয়ই খাওয়া-টাওয়ার অভ্যেস আছে, শুরু করছেন না কেন?'

সতর্ক হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। 'না, থাক।'

'কেন, থাকবে কেন?' চেহারায় গোবেচারা ভাব এনে বলল রানা, 'এখনও যদি সন্দেহ থাকে, আমার টেস্ট করা বোতলগুলো থেকে খান।' বোনির দিকে ফিরল ও। 'ওহে, মি. চৌধুরীকে ওয়াইন দাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আপনি?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। 'বিয়ার চালাবেন না?'

'আসল জিনিস পেটে পড়ার পর বিয়ার কি আর ভাল লাগবে? তবু আপনি যখন বলছেন, বোনি, বিয়ারের একটা ক্যানও তাহলে খোলো।'

বিয়ার আর ওয়াইন দিল বোনি। সময় নিয়ে যে যার গ্লাসে চুমুক দিল ওরা। এক সময় কবীর চৌধুরী জানতে চাইল, 'ডিনার দেয়ার জন্যে তুমি তৈরি তো, বোনি?'

'ইয়েস, স্যার।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল বোনি। 'এরই মধ্যে একজনকে ডিনার পরিবেশন করেছি, স্যার।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'বিশ মিনিট আগে। মি. স্টিফেন বেকার। সত্যি কথা বলতে কি, প্লেটটা তিনি একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। বললেন, এনার্জি জার হিসেবে সবার আগে তাঁরই এনার্জি দরকার।'

'যুক্তিটা অস্বীকার করা যায় না,' অলস ভঙ্গিতে রানার দিক থেকে বোনির দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'কোথায় গেলেন তিনি? কোচে?'

'না, স্যার। নিজের ট্রে নিয়ে তিনি পুব দিকের ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের দিকে চলে গেলেন। ওই ওদিকে।' হাত তুলে দিক নির্দেশ করল বোনি, তাক করা হাত অনুসরণ করে নিজেও তাকাল সেদিকে। তারপরই আঁতকে উঠল, 'ওহ্ গড!'

বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'গডের আবার কি হলো?'

'স্যার, দেখুন!'

ওয়াগনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্র্যাশ ব্যারিয়ার থেকে ঢলে পড়লেন এনার্জি জার স্টিফেন বেকার। রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করছেন ভদ্রলোক। লাফ দিয়ে ওয়াগন থেকে নামল রানা, কবীর চৌধুরী তাকে অনুসরণ করল। ছয়টা লেন পেরিয়ে স্টিফেন বেকারের পাশে এসে দাঁড়াতে

মাত্র ছয় সেকেন্ড সময় নিল দু'জন।

এনার্জি সেক্রেটারি অবিরাম বমি করছেন। কবীর চৌধুরী এবং রানা দু'জনেই তাঁকে প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তর দেয়ার মত অবস্থা নয় ভদ্রলোকের। বমি তো হচ্ছেই, সেই সাথে সারা শরীর ঘন ঘন মোচড় খাচ্ছে।

'কোথাও যাবেন না,' বলল রানা। 'আমি ডাক্তারকে ডেকে আনি।'

অ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তারের সাথে জুলিকেও পেল রানা। তারা দু'জনেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'জলদি, ডাক্তার! বোধহয় প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, বেকার সাহেব বিষ মিশানো ট্রে থেকে ডিনার খেয়েছেন। অবস্থা খুব সিরিয়াস।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

তার পথ আটকাল রানা। 'ডা. ইসহাক সম্ভবত মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি। ওষুধের এই যদি প্রতিক্রিয়া হয়,...আমি চাই, ওখানে গিয়ে খাবার পরীক্ষা করুন আপনি, এবং কবীর চৌধুরীকে জানান, খাবারগুলো বিষাক্ত হয়ে গেছে। ওষুধ দেয়া হয়েছে, তা যেন বুঝতে না পারে। ঠিক কি বলবেন, কিভাবে বলবেন, চিন্তা করে নিন। দরকার হলে দু'একজন কেমিকেল বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠান। ওই খাবার আর কেউ যেন, আই রিপিট, আর কেউ যেন না ছোঁয়। এখানে আমি পাইকারী খুন করার ঠিকাদারী নিইনি।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' বলল ডাক্তার। ছোঁ মেরে ইমার্জেন্সী ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

'এমন ঘটল কেন? রানা?'

'কি জানি। কোথাও বুঝতে ভুল করেছে কেউ। হয়তো আমিই দায়ী। থাকো এখানে।'

ব্রিজে ফিরে এসে রানা দেখল, সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী। থমথম করছে চেহারা। ধীরে ধীরে সিধে হলো ডাক্তার। প্রথমে কবীর চৌধুরী, তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাল রানা। 'ওয়েল?'

এনার্জি সেক্রেটারির অসাড় হাতটা ছেড়ে দিল ডাক্তার। ম্লান গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। মি. বেকার মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন!' চেহারাই বলে দেয়, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে কবীর চৌধুরী। 'তা কিভাবে সম্ভব!'

'প্লীজ, আমার কাজে কেউ বাধা দেবেন না,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'আপাতত আমি যা বলব তাই হবে। মাঝখানের এই প্লাস্টিক প্লেটটা খালি। বোধহয় মি. বেকার সবটুকু খেয়েছেন।'

কি যেন বলতে গেল কবীর চৌধুরী, কিন্তু কি ভেবে মুখ খুলল না।

লাশের ওপর ঝুঁকে তার মুখ শুঁকল ডাক্তার। কুঁচকে উঠল নাক। অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে আবার সিধে হলো সে। বলল, 'সালমোনেলা হতে পারে না। ওতে সময় লাগে। এমন কি বোটুলিনাস-ও নয়। এটার প্রতিক্রিয়া তাড়াতাড়ি হয়, তাই বলে এত তাড়াতাড়ি—উঁহুঁ।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। 'আমি হাসপাতালের সাথে কথা বলতে চাই।'

'বুঝলাম না। আপনার তো প্রথমে আমার সাথে কথা বলা উচিত।'

মাথা কাত করে মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল ডাক্তার। 'যা বলার গন্ধটাই বলে দিচ্ছে, ওটা আসছে প্যানক্রিয়াস থেকে। এক ধরনের ফুড পয়জনিং। ঠিক কি ধরনের, আমি জানি না। শুধু বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। হাসপাতালের সাথে কথা বলতে দিন, প্লীজ।'

'আমি যদি শুনি, অসুবিধে নেই তো?'

রানার দিকে তাকাবার ঝোঁকটা দমন করল ডাক্তার। বলল, 'কিসের অসুবিধে!'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে, পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে ডাক্তার। প্রেসিডেন্টের পাশের ফোনটা নিয়েছে কবীর চৌধুরী। কাছের একটা নরম চেয়ারে বসে আছে রানা। গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক।

ফোনে জানতে চাইল ডাক্তার, 'মি. বেকারের প্রাইভেট ফিজিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে কতক্ষণ সময় লাগবে আপনাদের?'

'যোগাযোগ হচ্ছে।'

'অপেক্ষায় থাকলাম।'

ওরা সবাই তাই থাকল। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সবাই সবাইকে দেখছে। অপরপ্রান্ত থেকে কথা শুনল ডাক্তার, 'স্যার?'

'এই মাত্র-ক'দিন আগে মি. বেকারের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে আরও ক'দিন সময় দরকার ছিল তাঁর।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এ থেকেই সমস্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তা মনে করছি না,' গমগম করে উঠল কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। 'আমি এই ইনফেকশনের উৎস কি জানতে চাই। দু'জন অ্যানালিটিকাল কেমিস্ট আসুক এখানে। তারা খাবার পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিক আমাকে। দু'জন যদি একমত হতে না পারে, একজনকে আমি ব্রিজ থেকে পানিতে ফেলে দেব।'

ডাক্তার শান্ত এবং অবিচল। 'সান ফ্রান্সিসকোয় এ-ধরনের কেমিস্ট আছে। দু'জনকে আমি চিনি—ওয়েস্ট কোস্টের সেরা। এরা দু'জন কোন ব্যাপারে কখনও একমত হতে পেরেছে বলে শুনিনি।'

'সেক্ষেত্রে তাদের দু'জনকেই পানিতে ফেলা হবে। আপনিও তাদের সাথী হবেন। এক্ষুণি যোগাযোগ করুন।'

ডায়াল করতে শুরু করল ডাক্তার।

কবীর চৌধুরীকে রানা বলল, 'এই মুহূর্তে আপনার মাথা গরম করা উচিত নয়।'

'আপনার সাথে পরে কথা বলব আমি। ডাক্তার?'

'ওরা আসবে না। আসবে, আপনি যদি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক আছে, ওদের কোন ভয় নেই। ফোন ছেড়ে দিন। ওটা আমার দরকার।' জানালা দিয়ে বাইরে কাকে যেন ইশারা করল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর কোচে উঠল রস পেরট, হাতে স্মাইযার মেশিন-পিস্তল। কবীর চৌধুরী কোচের পিছন দিকে এগোল। বলল, 'পুলিস চীফের সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

দু'সেকেন্ডের বেশি পেরোয়নি, লাইনে এলেন পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন।

'ডিকসন?' ভারী গলা, ধমকের সুর। 'ডাক্তাররা এখানে যারা আসছে, ওদের আমি কিছু বলব না। আমি চাই, ওদের সাথে তুমি আর ভাইস-প্রেসিডেন্টও ব্রিজে আসবে।'

কিছুক্ষণ দেরি হলো, তারপর আবার ইন্টারকমে ফিরে এলেন পুলিস চীফ। 'মি. ল্যাংফোর্ড রাজি আছেন। কিন্তু তাঁকে আপনি জিম্মি হিসেবে রেখে দিতে পারবেন না।'

'বেশ, রাজি আছি।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

'দিয়েও না রাখলে তোমাদের কিছু করার আছে? দরাদরি করবে, সে পজিশনে নেই তোমরা।'

'তা নেই। কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন আছে, মি. চৌধুরী।'

'জানি। কিন্তু কবীর চৌধুরীকে পরাবার মত হাতকড়া চাইলেই তুমি পাচ্ছ কোথায়? কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাদের সাথে দেখা করব আমি। আর, হ্যাঁ, টিভি ট্রাক পাঠিয়ে দাও।'

'আবার?'

'সরকারের কীর্তিকলাপ আমেরিকানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই আমি,' বলে ফোন রেখে দিল কবীর চৌধুরী।

সবাইকে নিয়ে কমিউনিকেশন ওয়াগনে চলে এসেছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ড এবং অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ধীরে ধীরে হাতের রিসিভার নামিয়ে রেখে একে একে তাদের সবার দিকে তাকালেন পুলিস চীফ আর্ল ডিক্সন। বললেন, 'শুনলেনই তো। মি. বেকার নেই। আসলে, কাউকে দায়ী করা যায় না। তার হার্টের অবস্থা ভাল ছিল না, কেউ জানবে কিভাবে? তবে, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কেউ জানল না-ই বা কেন?'

এফ.বি.আই. চীফ মাথা নিচু করে থাকলেন।

মুখ খুললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'আমি জানতাম। আমাদের সব সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালদের মত মি. বেকারও তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাউকে কিছু জানতে দিতে চাইতেন না। সবাইকে গোপন করে এর আগে দু'বার একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। শেষবার যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল। অথচ খবর ছড়ানো হলো, অতিরিক্ত খাটাখাটনির জন্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তারই চিকিৎসা চলছে। কাজেই, এ-ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা যেতে পারে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট বললেন, 'আপনি দায়ী কেন হতে যাবেন, অ্যাডমিরাল! এই রকম একটা পরিস্থিতি দেখা দেবে, আগে থেকে আমরা কেউ জানতাম? ডা. ইসহাকও দায়ী নন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যবান একজন প্রাপ্তবয়স্কের

জন্যে ওষুধটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। দেশ জোড়া যাঁর খ্যাতি রয়েছে, তাঁর কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। মি. বেকার অসুস্থ, সেটা তাঁর জানার কথা নয়। ওষুধ মেশানো খাবার একজন হার্টের রুগী খাবে, তা-ও তাঁকে জানানো হয়নি।'

জেনারেল গারল্যান্ড জানতে চাইলেন, 'এখন কি হবে?'

'পরিষ্কার আন্দাজ করা যায়,' বললেন পুলিস চীফ। 'দেশের লোকের সাথে আমাদের সাতজনের পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে—খুনী হিসেবে।'

লোকজন আর ক্যামেরা নিয়ে ব্রিজের মাঝখানে পৌঁছে গেছে টিভি ভ্যান। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়নি এখনও। দু'জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডিনার ট্রে-র খাবার পরীক্ষা করছে। পরীক্ষা যেভাবে এগোচ্ছে তা থেকে এখুনি বলে দেয়া যায়, জীবনে এই প্রথম একটা বিষয়ে একমত হতে যাচ্ছে ওরা। নিচু গলায় ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট। বেশিরভাগ সময় পরস্পরের দিকে শুধু তাকিয়ে আছেন, কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পুলিস চীফ ডিকসনের সাথে একা রয়েছে কবীর চৌধুরী। সে জানতে চাইল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে বলো, তুমি বা এফ.বি.আই. চীফ এ-ব্যাপারে কিছুই জানো না?'

ক্লান্ত সুরে পুলিস প্রধান বললেন, 'বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু জানি না। দিন কয়েক হলো শহরের আশপাশে বোটুলিনাস ছড়িয়ে পড়েছে।' রাস্তার মাঝখানে রাখা টিভি সেটটা ইঙ্গিতে দেখালেন তিনি। 'টিভি থেকেও বলা হয়েছে কথাটা।' এরপর ডিনার ওয়াগনের দিকে হাত তুললেন তিনি, ওদিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। 'এখানে পৌঁছবার আগেই ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে, ওই বোটুলিনাস-ই দায়ী।' বোটুলিনাসকে দায়ী করার পরামর্শ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছে ডাক্তাররা। তিনি ওদেরকে আরও বলেছেন, কবীর চৌধুরীকে জানাতে হবে মাত্র বারোটা প্লেটের খাবার বিষাক্ত হয়ে গেছে, তার বেশি না।

'ওদিকের ফোনে কথা বলো। গরম আরও কিছু খাবার চাও। প্রথম তিনটে এলোপাতাড়ি বেছে প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স এবং বাদশাকে খেতে দেয়া হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?'

অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে ওরা। ঝুলন্ত একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে জুলি। একটা ক্যানভাস চেয়ারে বসে তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। জুলির সবুজ চোখ ছলছল করছে।

'আমার ওপর এই জুলুম না করলেই কি নয়?' আবেদন ভরা চোখে তাকাল জুলি। 'চিরকাল ছটফটে আমি, ঘরে কেউ ধরে রাখতে পারত না। শেষ পর্যন্ত আমাকে কিনা তুমি নজরবন্দী করলে।'

'মুচড়ে যদি হাতটা ভেঙে দেয়, কিংবা নখের ভেতর যদি সুঁই ঢোকায়, তখন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যা জানো, গড় গড় করে সব বলে দেবে তুমি। তাই, আমাদের তিনজনের স্বার্থে, আবার তোমার অসুস্থ হয়ে পড়াই একমাত্র উপায়।'

'ভয় দেখালেই সব বলে দেব, এখন কিন্তু তা আর মনে হচ্ছে না,' ঘুম ঘুম

চোখে বলল জুলি। 'কারণ, কবীর চৌধুরীকে যতটা ভয় করি, তারচেয়ে বেশি ভয় করি তোমাকে। তোমাকে যদি ফাঁসিয়ে দিই, তুমি বোধহয় আমাকে খুনই করে ফেলবে, তাই না?'

'বোধহয়,' বলল রানা। 'যদি ইচ্ছে করে ফাঁসিয়ে দাও।'

শিউরে উঠল জুলি। 'যীশু, এই লোকের প্রেমে যদি পড়েও থাকি, এখন আমাকে এমন শক্তি দাও যেন ওকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে পারি।' শেষের দিকে জড়িয়ে এল কথাগুলো।

ফস্ করে দিয়াশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল ডাক্তার। 'একবার প্রেমে পড়ার শক্তি চায়, একবার ঘৃণা করার শক্তি চায়, মেয়েদের নিয়ে যীশুর হয়েছে এই এক জ্বালা।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দেরি করছেন কেন? আরেকটু পর ওকে পাবেন?'

'কবীর চৌধুরী কি বলল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ বুজল জুলি। 'ওই একই কেব্‌ল্-এ। বে-সাইড।'

'জিজ্ঞেস করায় কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

কিন্তু জুলির আর সাড়া পাওয়া গেল না। এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল ডাক্তার। 'ও এখন ঘুমাবে।'

'কতক্ষণ?'

'দু'ঘণ্টা।'

'কলম?'

ক্লিপ বোর্ড থেকে কলমগুলো নামাল ডাক্তার। 'কি করতে চাইছেন ঠিক জানেন তো?'

'আশা করি।' এক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আমাকে জেরার মুখে পড়তে হবে।'

'জানি। আপনার টর্চ দরকার?'

'পরে।'

তিন

দুই বিশেষজ্ঞের মধ্যে হিউম সিনিয়র, কবীর চৌধুরীর সাথে সে-ই কথা বলল, 'মোট বারোটা ইনফেকটেড ফুড-ট্রে পেলাম আমরা।'

রস পেরটের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, তারপর আবার ফিরল হিউমের দিকে। 'এই-ই সব? বারোটা? সতেরোটা নয়?'

মাথায় হিপ্পিদের মত কাঁধ সমান লম্বা চুল হিউমের, সোনালি। গোঁফ আর দাড়ি আলাদা করে চেনার উপায় নেই। চেহারাটা তীক্ষ্ণ, আরও ধারাল তার চোখের দৃষ্টি। এমন ভাবে তাকাল, যেন কবীর চৌধুরীকে ভস্ম করে দিতে চায়। কিন্তু গলার সুরটা শান্ত। বলল, 'বারোটা। নষ্ট মাংস। এক ধরনের বোটুলিনাসই দায়ী।

মুখে দিয়ে পরীক্ষা করারও দরকার নেই. গন্ধই পাবেন। অন্তত আমি পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, মি. বেকার পাননি।'

'মারাত্মক?'

মাথা নাড়ল হিউম। 'এই পর্যায়ে তা নয়। মি. বেকার ফুড পয়জনিঙে মারা যাননি। মানে, সরাসরি ফুড পয়জনিঙে মারা যাননি। তবে তাঁর দুর্বল হার্টের অবস্থা আরও খারাপ করে তুলতে এই বিষাক্ত খাবার সাহায্য করেছে, তা বলা যায়।'

'সুস্থ, স্বাস্থ্যবান একজন লোক যদি এই খাবার খায়, কি হবে তার?'

'অচল হয়ে পড়বে। প্রচণ্ড বমি করবে। পেটে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকবে। জ্ঞান থাকবে না, কিংবা থাকলেও নড়াচড়ার শক্তি পাবে না।'

'অর্থাৎ তাকে গোণার মধ্যে ধরার দরকার হবে না? তখন আর কারও জন্যে হুমকি নয় সে?'

'আপনি যে লাইনে চিন্তা করছেন, আমি সে-লাইনে চিন্তা করছি না,' বলল হিউম। 'এইটুকু বলতে পারি, প্রায় জড় পদার্থে পরিণত হবে সে। তার মাথাও বিশেষ কাজ করবে না।'

'আমি আর আমার লোকজন যদি ওই খাবার খেতাম, কিছু লোক কি খুশিই না হত!' পেরটের দিকে আবার তাকাল কবীর চৌধুরী। 'তুমি কি ভাবছ?'

'আপনি যা জানতে চান, আমিও তাই জানতে চাই,' বলে হিউমের দিকে তাকাল পেরট। 'বোটুলিনাস-ফোটুলিনাস যাই হোক, ওটা কি খাবারের সাথে ইচ্ছে করে কেউ মিশিয়ে দিতে পারে?'

'সে কি! তা কেন কেউ দিতে যাবে!'

'আপনার চেহারাটাই নিখুঁত একটা বিস্ময় চিহ্ন,' কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'ভাষায় সেটা আমদানী না করলেও চলবে। উত্তর দিন।'

'এই লাইনের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, একজন গবেষক বা একজন চালু ল্যাবরেটরি সহকারী প্রয়োজনীয় টক্সিন তৈরি করতে পারবে।'

'কিন্তু তাকে হয় ডাক্তার বা মেডিকেল প্রফেশনের সাথে জড়িত একজন হতে হবে? এবং ল্যাবরেটরির সুবিধেও থাকতে হবে তার?'

'হ্যাঁ।'

ডিনার ওয়াগনের অ্যাটেনড্যান্টকে কবীর চৌধুরী বলল, 'বোনি, কাউন্টারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো, জলদি।'

কাউন্টারের ওদিক থেকে এদিকে এসে কবীর চৌধুরীর সামনে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল বোনি।

'অত গরম তো নয়, বোনি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এখানে বরং ঠাণ্ডাই লাগছে। তাহলে তুমি ঘামছ কেন?'

'ঘামছি...' ঢোক গিলল বোনি। '...কই ঘামছি!' নিজের কপালে হাত দিল সে। হাতটা নামিয়ে চোখের সামনে ধরল। ভিজে গেছে। 'হ্যাঁ। তাহলে বোধহয় এইসব অস্ত্র দেখে। ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না।'

'কেউ তোমাকে ফুলের একটা টোকাও দেয়নি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'বা কেউ তোমার দিকে একটা আঙুলও তাক করেনি। যদিও, বলা যায় না, আমিই

হয়তো অর্ডার দেব, বোনিকে মেরে তক্তা বানানো হোক। তারপর আমি হয়তো বলব, তক্তাটাকে গুলি করে ফুটো করা হোক। হয়তো সবশেষে আমি চাইব, ফুটো তক্তাটা ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দেয়া হোক।' এক সেকেন্ড থেমে বোনির দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'বোনি, শালার ব্যাটা, আমার ধারণা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিস তুই। খাবারে বিষ মেশানোয় তোর হাত আছে। এনার্জি সেক্রেটারি মারা যাওয়ায় তোর বিবেক তোকে দায়ী করছে। আর সেজন্যেই এমন দরদর করে ঘামছিস তুই।'

বোনি ভাইস-প্রেডিডেন্ট এবং অন্যান্যদের দিকে তাকাল। যেন কেঁদে ফেলার অনুমতি চাইছে সে।

'আমার দিকে!' কড়া ধমক দিল কবীর চৌধুরী।

চমকে উঠে কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল বোনি। চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। সে-দুটো থরথর করে কাঁপছে। আবার একটা ঢোক গিলে বলল সে, 'এসব সত্যি নয়, স্যার।'

'তোমার পা। কাঁপছে কেন?'

বোনি তাড়াতাড়ি বলল, 'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার। ভয় পেলে এরকম হয় আমার।'

'বুঝতে পারছি, ভাল অভিনেতা বলেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ওরা। ধরা যখন পড়েই গেছ, তোমার ফার্স্ট ক্লাস অভিনয় এখন আর কোন কাজে আসছে না! বিষ মেশানো খাবারের প্লেট যাতে চেনা যায়, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছ তোমরা। সেটা কি বোনি?'

'মি. চৌধুরী,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপনি অযথা লোকটার ওপর অত্যাচার করছেন। সামান্য একজন ভ্যান ড্রাইভার ও।'

ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাবার গরজটাও দেখাল না কবীর চৌধুরী। তার কঠিন দৃষ্টি এখনও বিদ্ধ করছে বোনিকে। 'বিষ মেশানো খাবার কিভাবে চেনা যেত?'

'জানি না! আমি জানি না! আপনার কথাই আমি বুঝতে পারছি না...'

নিজের লোক টেরি আর হুয়ানের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী।

'ওকে নদীতে ফেলে দাও,' শান্ত, আলাপের সুরে বলল সে।

আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল বোনির গলা থেকে। টেরি আর হুয়ান দু'দিক থেকে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

ধস্তাধস্তি করল না বোনি, কিন্তু চিৎকার জুড়ে দিল, 'আমি খুন হব না! আমি খুন হতে চাই না! আমার কোন দোষ নেই! আমি...'

'এবার তুমি বলবে, বউ আর তিনটে বাচ্চা আছে তোমার!'

'এ-ও মিথ্যে কথা,' চিৎকার করল বোনি। 'দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, এই সংসারে আমি একা। এখনও সময় আছে, একজন নিঃসঙ্গ লোককে...'

টেরি আর হুয়ানের দিকে এগোলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। কিন্তু পেরটকে মেশিন-পিস্তল তুলতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা।

'প্লেটগুলো যদি চেনার কোন ব্যবস্থা থাকে,' কবীর চৌধুরীকে বলল পেরট,

'তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। আপনি হলে কি সেই তথ্য বোনির মত একজন নগণ্য, হাফ-পাগলকে জানাবার ঝুঁকি নিতেন, চীফ?'

'মাথা খারাপ! আর তাহলে ভয় দেখাবার দরকার নেই, বলছ?'

'যা ভয় পেয়েছে, সব বলবে এবার—যদি কিছু জানে।' গলা চড়াল পেরট। 'ওকে ফিরিয়ে আনো।'

আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়া হলো বোনিকে। ছেড়ে দিতেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। চেষ্টা করে দাঁড়াল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার যখন তাকাল, দেখল বোনি দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু ঠকঠক করে কাঁপছে। তার গলাও কাঁপতে লাগল, 'আমি যদি মিথ্যে কথা বলি, আমার ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

'এই না বললে তোমার কেউ নেই?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল পেরট।

'ও আমার পালক-পুত্র। খাবারে বিষ মেশানো সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।'

'যা জানো তাই বলো।'

'কোথাও যে কিছু একটা ঘাপলা আছে,' বলল বোনি, 'ভ্যানে প্লেট তোলার আগেই সেটা আমি ধারণা করেছিলাম।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। সবাই সতর্ক।

'কোথায়, বোনি? হাসপাতালে?' জানতে চাইল পেরট।

'হাসপাতালে? হাসপাতালের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি জনসঙ্গ-এ চাকরি করি।'

'চিনি। জনসঙ্গ বিখ্যাত ক্যাটারার, যে-কোন খাবারের অর্ডার নেয়। তারপর?'

'আমাকে বলা হলো, ওখানে পৌঁছলেই খাবার রেডি পাবে। সাধারণত পাঁচ মিনিট লাগে লোড করতে, সাথে সাথে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। কিন্তু আজ ওখানে পৌঁছবার পরও পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো আমাকে।'

'জনসঙ্গে যখন অপেক্ষা করছিলে, হাসপাতালের কোন লোককে ওখানে দেখেছ তুমি?'

'কাউকে না, স্যার।'

'আপাতত তোমাকে আমরা গোল্ডেন গেটে ফেলছি না,' বোনিকে বলল কবীর চৌধুরী। 'তবে বারোটা প্লেট থেকে তুমি যদি কিছু খেতে চাও, আমরা তোমাকে বাধা দেব না।' এবার অন্য একজনের ওপর রক্তচক্ষু হানল সে। 'ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স! আপনি আর সেই পুঁচকে মেয়েটা…কি যেন নাম? জুলি! আপনারা দু'জন বাকি রইলেন। সন্দেহ-টন্দেহ নয়, আমি জানি! খাবারের বিষ মেশানোর সাথে আপনারা জড়িত।'

'জানেন, মি. চৌধুরী? সত্যি জানেন?' ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স তীব্র ব্যঙ্গের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখনও আমাদেরকে গোল্ডেন গেটে ফেলে দেননি কেন?'

'দেইনি, দেব,' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কবীর চৌধুরী। তারপর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কোথায় সে? আমার সামনে হাজির করো তাকে!'

'কার কথা বলছেন, মি. চৌধুরী?' জানতে চাইল ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স।

'জুলি।'
'তাকে বিরক্ত করা চলবে না,' দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিল ডাক্তার।
কঠিন সুরে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'এখানে কার কর্তৃত্ব চলছে?'
'যেখানে আমার রোগীর স্বার্থ জড়িত, সেখানে আমার কর্তৃত্বই চলবে। তাকে যদি এখানে আনতে চান, কোলে বা কাঁধে করে তুলে আনতে হবে। কড়া ওষুধ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে। আপনার সময় কোথায় যে এসব খবর রাখবেন। জুলি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দয়া করে বিশ্বাস করুন।'
'না। টেরি, যাও দেখে এসো। কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে, জানোই তো। তলপেটে আঙুলের খোঁচা দিলেই···'
দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল টেরি। 'ঘুমটা জেনুইন, স্যার।'
'আমার বিশ্বাস, জুলিকে জেরার মুখে পড়তে দিতে চাননি আপনি, তাই ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।' অভিযোগ করল কবীর চৌধুরী।
'আপনি আর যাই হোন, ভাল সাইকোলজিস্ট নন, মি. চৌধুরী। আপনিও জানেন, সাহস বলতে কিছু নেই মেয়েটার। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে কে তাকে বিশ্বাস করবে?' কবীর চৌধুরী ডাক্তারের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। 'আরও একটা ব্যাপার হলো, আমরা জানি, মেয়েদের ওপর আপনি বরাবরই সদয়, তাদের ওপর অত্যাচার চালানো আপনার স্বভাব নয়।'
'সে খবর আপনি কোত্থেকে পেলেন?'
'পুলিস চীফ মি. ডিকসন বলেছেন আমাকে।'
পুলিস চীফের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'ডিকসন, বলেছ?'
'কেন, বলাটা কি অন্যায় হয়ে গেছে, মি. চৌধুরী?'
'একমাত্র আপনিই বাকি থাকলেন, ডাক্তার অ্যাম্বু।'
এনার্জি সেক্রেটারির লাশের দিকে ইঙ্গিত করল ডাক্তার। স্ট্রেচারে চাদর ঢাকা দেয়া রয়েছে। 'ভদ্রলোক মারা গেছেন। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমার কাজ লোককে বাঁচানো। তাছাড়া, খাবার নিয়ে ওয়াগন যখন এল, আমি তখন অ্যাম্বুলেন্সে। খাবার যখন পরিবেশন হলো, তখনও আমি অ্যাম্বুলেন্সে। একই সময়ে অ্যাম্বুলেন্সে থাকব, আবার ডিনার ওয়াগনে এসে বিষ মেশানো ট্রে আইডেনটিফাই করব, তা সম্ভব নয়।'
কবীর চৌধুরী ডাকল, 'টেরি?'
'ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, স্যার,' বলল টেরি। 'উনি অ্যাম্বুলেন্সেই ছিলেন।'
'কিন্তু,' ডাক্তারকে বলল কবীর চৌধুরী, 'ব্রিজে ফিরে আসার পর আর ডিনার ওয়াগন পৌঁছুবার আগে এর-তার সাথে কথা হয়েছে আপনার।'
টেরি বলল, 'তা হয়েছে, স্যার। বেশ কয়েকজনের সাথে আলাপ করেছেন উনি। মিস জুলিও।'
'জুলিকে বাদ দাও। ডাক্তার অ্যাম্বু সবচেয়ে বেশিক্ষণ কার সাথে কথা বলেছেন?'
টেরির স্মরণ শক্তি দারুণ। 'তিনবার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছেন উনি, স্যার। দু'বার মিস জুলির সাথে···'

'তাকে বাদ দিতে বললাম না! তার সাথে কথা বলার আরও অনেক সুযোগ পেয়েছে ডাক্তার—হাসপাতালে যাওয়া-আসার সময় অ্যাম্বুলেন্সে। আর কার সাথে?'

'রিপোর্টার প্রদ্যুৎ মিত্রর সাথে। অনেকক্ষণ।'

'কিছু শুনতে পেয়েছ?'

'না। ত্রিশ গজ দূরে ছিলেন ওঁরা, বাতাস বইছিল উল্টোদিকে।'

'কিছু হাত বদল হতে দেখেছ?'

'না।' নিঃসংশয়ে বলল টেরি।

ডাক্তারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'গুপ্তচরের সাথে এত কি কথা হলো আপনার?'

'গুপ্তচর?'

'প্রদ্যুৎ মিত্র।'

'শুনে লাভ নেই আপনার,' বলল ডাক্তার। 'ডাক্তারি শাস্ত্র—জানি, আপনার প্রিয় সাবজেক্ট নয় ওটা।'

রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'ডাক্তার আপনাকে ডাক্তারি শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করল, আর আপনি?'

'আমি রাজা-উজির মেরে গায়ের ঝাল মিটিয়েছি,' বলল রানা। 'আর কথা বলেছি শুধু ডাক্তারের সাথে নয়, কম করে আরও ত্রিশ জনের সাথে। বেশির ভাগই আপনার লোক তারা। শুধু ডাক্তারের সাথে কথা বলার ঘটনাটাকে বিশেষ একটা কেস হিসেবে দেখছেন কেন?'

'বরাবর ঠাণ্ডা দেখছি আপনাকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যাপারটা কি?'

'বিবেকের দংশন নেই। মনটা সাদা। আপনিও এ জিনিসটা চর্চা করতে পারেন।'

'আর, স্যার,' টেরি বলল, 'মি. প্রদ্যুৎ জেনারেল পীলের সাথেও অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছেন।'

'আচ্ছা! আপনিও কি রাজা-উজির মেরেছেন, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

'না। এই ব্রিজের আবর্জনা পরিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা।'

'আপনার পক্ষেই তা সম্ভব। তা, ওটা কি সফল আলোচনা ছিল?'

জেনারেলের চোখে হিম-শীতল দৃষ্টি। তিনি উত্তর দিলেন না।

পেরটের দিকে চিন্তিত চেহারা নিয়ে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মাঝখানে কেউ অনুপ্রবেশ করেছে।'

কুমড়ো আকৃতির চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল পেরট। তার মায়া ভরা চোখে ভয়ও নেই, উদ্বেগও নেই। বোকা বোকা দেখাল তাকে। 'আমাকে শুধু চিনিয়ে দিন, বস্। দু'হাতের মাঝখানে নিয়ে মাথাটা তার আমি ছাতু বানিয়ে দিই।'

'ডাক্তারকে বাদ দেয়া যায়,' বলে চলল কবীর চৌধুরী। 'তার কাগজ-পত্র আগেই আমি চেক করেছি। তাছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, ট্রেনিং পাওয়া ঝানু একজন এজেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ব্রিজে। এদিক থেকে বিচার করলেও ডাক্তার বাদ

পড়ে। সে এখানে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে। তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?'

'হচ্ছে, চীফ। কেউ আছে।'

'কে?'

ইতস্তত না করেই পেরট বলল, 'প্রদ্যুৎ মিত্র, চীফ।'

হাতছানি দিয়ে বেডলারকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী। তাকে বলল, 'মি. প্রদ্যুৎ মিত্র বলেছেন, তিনি নাকি লন্ডনের দ্য নিউজের রিপোর্টার। ব্যাপারটা চেক করতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার?'

'প্রেসিডেন্টের টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবহার করতে পারব তো?'

'ওসব তো এখন আমাদের।'

'কয়েক মিনিট।'

বাছাধন, যাবে কোথায়—এই রকম একটা ভাব নিয়ে রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ফাটল ধরল রানার চেহারায়, হাসছে। 'আমার বিরক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু হচ্ছি না। এত থাকতে আমাকেই সন্দেহ হলো আপনার? কেন ভাবছেন আমরা রিপোর্টাররা কেউ টিকটিকি? আপনার লোকদের কেউ একজন হতে পারে না?'

'পারে না। কারণ ওদেরকে আমি নিজে বাছাই করেছি।'

'নেপোলিয়নও তাঁর মার্শালদের নিজে বাছাই করেছিলেন। শেষ দিকে তাদের মধ্যে ক'জন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল, স্মরণ করুন। আপনার এই লোকজন, এরা কারা? এদের একজনের সততাও কি প্রশ্নের উর্ধ্বে? খুন, গুণ্ডামি, রাহাজানি, ছিনতাই, জালিয়াতি যাদের পেশা—,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, '—আমি বুঝতে অক্ষম, এদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়।'

'লেকচার থামান,' বিদ্রূপ করল পেরট। কবীর চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, তাকাল পশ্চিম দিকে। 'হাতে সময় কম, চীফ।'

'তাই তো!' একটু অস্থির হলো কবীর চৌধুরী। কালো, ঘন, অশুভ চেহারার বিশাল মেঘ প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে উঠে আসছে, যদিও এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে। 'প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স, বাদশা এখানে বসে ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজছেন : দর্শকরা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। লোক লাগাও, পেরট। ক্যামেরা পজিশন নিক। চেয়ারগুলো সাজানো হোক।' লোকজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল পেরট। তারপর তাকে নিয়ে রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে এল কবীর চৌধুরী। পেরটকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. চর আমাকে বললেন, তুমি নাকি তাঁর ক্যামেরা সার্চ করেছ?'

'হ্যাঁ। তবে খুলে আলাদা করে দেখিনি।'

'হয়তো দেখাই উচিত।'

'কিন্তু দেখতে না চাইলেই ভাল করবেন!' এই প্রথম নিজের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠতে দিল রানা। 'আপনি জানেন কি, এধরনের একটা ক্যামেরা শুধু জোড়া লাগানো শিখতে একজন মানুষের পাঁচ বছরের ট্রেনিং দরকার হয়? এটাকে নষ্ট না করে বরং নিজের কাছে রেখে দিন, আমি না করব না।'

'ব্লাফ দিচ্ছে, ওর কথায় কান দিয়ো না,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আপনার ক্যামেরা নষ্ট হবে না,' রানাকে বলল পেরট। 'মেকানিক্যাল জিনিয়াস বেডলার রয়েছে আমাদের সাথে।' কবীর চৌধুরীকে বলল, 'আমি ওঁর ক্যারি-অল, সীটের পিঠ আর তলা এবং র‍্যাকও সার্চ করেছি। পরিষ্কার।'

'ওকে সার্চ করো।'

'আমাকে সার্চ করবে?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'একবার তো করা হয়েছে।'

'তখন শুধু দেখা হয়েছে অস্ত্র আছে কিনা।'

যেভাবে সার্চ করল, রানার সাথে সরষের দানা থাকলেও পেয়ে যেত পেরট। চাবি, খুচরো পয়সা আর ভদ্র চেহারার খুঁদে একটা ছুরি ছাড়া যা পেল সে, সবই কাগজ।

'সাধারণত যা থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, প্রেস কার্ড...'

'প্রেস কার্ড?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'দেখো তো, লন্ডনের দ্য নিউজের কথা লেখা আছে কিনা।'

'এটা দেখুন,' কবীর চৌধুরীর হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল পেরট। 'অভিজাত ছাপা, দামী জিনিস—নকল বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ওকে এজেন্ট বলে সন্দেহ করছি আমরা, তা যদি হয় ও, সবচেয়ে দক্ষ লোককে দিয়ে কাগজপত্র জাল করিয়েছে।' কার্ডটা দেখে পেরটকে ফিরিয়ে দিল কবীর চৌধুরী, কপালে সূক্ষ্ম কয়েকটা রেখা ফুটল। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ।' লম্বা একটা এনভেলাপ খুলল পেরট। 'এয়ারলাইন টিকেট। হঙকঙ ফ্লাইট।'

'নিশ্চয়ই কালকের তারিখে নয়?'

'কালকের। আপনি জানলেন কিভাবে?'

'স্পাই নিজেই বলেছেন আমাকে। কি মনে হচ্ছে তোমার, পেরট?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল পেরট। রানার ফেল্ট কলম দুটো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে। একবার, এক সেকেন্ডের জন্যে, সে আর কবীর চৌধুরী মৃত্যুর মাত্র এক চুল দূরে চলে এল। কিন্তু পেরট অন্যমনস্ক, কলম দুটোর ক্লিপ আবার লাগিয়ে পাসপোর্ট খুলল সে। রানার মুখের কথা আর পাসপোর্টের লেখায় কোন অমিল খুঁজে পাবে না ওরা। ধীরেসুস্থে কয়েকটা পাতা ওল্টাল পেরট। 'চড়ুই পাখি, চীফ। কোথাও স্থির হয়ে বসতে জানেন না। গত দু'বছরে দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে যাননি।'

'কোত্থেকে ইস্যু করা হয়েছে পাসপোর্ট?'

'ইন্ডিয়া,' বলল পেরট। 'এসব থেকে কি বুঝব, চীফ?'

'কথার সাথে পাসপোর্টের তথ্য মিলে যাচ্ছে, এইটুকু বুঝতে পারছি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'উনি যদি এজেন্ট হন, আমি বলব কাভারের জন্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আয়োজন করা হয়েছে। এত কিছুর দরকার ছিল না। একজন এজেন্টকে এখানে সেখানে যেতে হয় বটে, কিন্তু দু'বছর ধরে দুনিয়া চষে বেড়াতে হয় না। একজন রিপোর্টারকে হয়।'

ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বেডলারকে। একটু অবাক চোখে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল?'

'লন্ডনের সাথে প্রেসিডেন্টের একটা হটলাইন রয়েছে। উনি যা বলছেন উনি তাই, স্যার। লন্ডনের দ্য নিউজ পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার।'

বেডলারকে রানা বলল, 'মি. চৌধুরী আমার ক্যামেরা ভাঙতে চান। ওটার ভেতর একটা টাইম বোমা আর একটা রেডিও আছে। দেখো, বিস্ফোরণে মারা যেয়ো না। ক্যামেরা খুলতে চাও খোলো, কিন্তু আবার ওটাকে জোড়া লাগিয়ে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরীর মাথা ঝাঁকানোটা লক্ষ্য করল বেডলার, ফিক করে হাসল, তারপর ক্যামেরা নিয়ে চলে গেল। রানা জানতে চাইল, 'এখানেই নিশ্চয় শেষ নয়? এবার বোধহয় আমার জুতোর শুকতলা দেখতে চাইবেন? কিংবা নকল খুলি আছে কিনা পরীক্ষা করবেন?'

কিন্তু কবীর চৌধুরী হাসল না। 'এখনও আমি সন্তুষ্ট নই। ডা. হিউম যে পয়জনারদের সাথে হাত মেলায়নি, বুঝব কিভাবে? কিভাবে বুঝব, তাকে বারোটার বেশি প্লেটে বিষ পেতে নিষেধ করা হয়নি? বিষ থাকার কথা সতেরোটা প্লেটে। সেগুলো চিনতে পারারও একটা ব্যবস্থা থাকার কথা···চিনতে পারবে এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে এই ব্রিজে। মি. দূত, আমি চাই, ডা. হিউম যে প্লেটগুলোকে নিরাপদ বলছেন সেগুলোর একটা থেকে আপনাকে খেতে হবে।'

'ডা. হিউমের ভুলও হতে পারে, তার ভুলের জন্যে আমাকে প্রাণ হারাতে বলেন আপনি? চাইতে পারেন, কিন্তু আমি খাচ্ছি না। আপনার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই, আমাকে আপনি কিডন্যাপও করেননি। তাছাড়া, আমাকে হিউম্যান গিনিপিগ বলে ধরে নেয়া আপনার উচিত নয়।'

'সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট খাবেন,' বলল কবীর চৌধুরী, 'প্রিন্স খাবেন, বাদশা খাবেন।' হাসল, যেন অপার আনন্দে আত্মহারা। 'রয়্যাল গিনিপিগ। সন্দেহ কি, ঘটনাটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাঁরা বাধা দিলে, জোর করে গেলানো হবে।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, ওকেও তো জোর করে খাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু সময়মত সামলে নিল নিজেকে। বিষাক্ত খাবার কিভাবে চিনতে হবে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীদের সেকথা জানাবার সুযোগ এখনও পাননি জেনারেল পীল। ডাক্তার অ্যাম্বু ছাড়া, রহস্যটা একমাত্র ও-ই জানাতে পারে। 'ভগবানই জানেন, ঠিক কি চাইছেন আপনি,' বলল ও। 'তবে, ডা. হিউমকে আমি বিশ্বাস করি। তিনি বলেছেন, বারোটা বাদে বাকি সব খাবার নিরাপদ। ঠিক আছে, গিনিপিগ হিসেবে আমাকেই আপনি ব্যবহার করুন।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'হঠাৎ মন বদলাবার কারণ?'

হাত আর মাথা নেড়ে ক্লান্ত একটা ভঙ্গি করল রানা। 'আপনার সন্দেহ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, মি. চৌধুরী। আপনার ডান হাত পেরটের দিকে তাকান, চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন, আমার কথা সমর্থন করছে সে। আপনার এই সন্দেহ, বুঝছেন না কেন, মস্ত দুর্বলতার লক্ষণ। আপনি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।'

'আমার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্যে এই মুহূর্তে কম করেও একশো কোটি লোক মাথা ঘামাচ্ছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনার না ঘামালেও চলবে। আমি জানতে চেয়েছি, সিদ্ধান্ত পাল্টালেন কেন?'

'কারণ, ডা. হিউম যদি ভুল করে থাকেন, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মেহমানরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। মারাও যেতে পারেন। আমি কেউ নই, নগণ্য—মারা গেলে কিছু আসে যায় না।'

আত্মবিশ্বাসী হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর মুখে। বোনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওহে, পালক ছেলের বাপ, কাউন্টারে দশটা নিরাপদ প্লেট রাখো।' নির্দেশ পালন করল বোনি। 'এবার মি. এজেন্ট, কোন্ প্লেটের খাবার মুখে দিতে চাইছেন আপনি?'

'আবার ভুল করলেন আপনি,' বলল রানা। 'এখনও আপনার সন্দেহ, বিষ মেশানো খাবারের প্লেট আমি হয়তো চিনতে পারব। এক কাজ করুন, কোন্টা থেকে খাব আপনিই বলে দিন।'

খুশি হলো কবীর চৌধুরী। আঙুল তুলে একটা প্লেট দেখাল সে।

এগোল রানা। কবীর চৌধুরীর বেছে দেয়া প্লেট তুলে নিল হাতে। ঢাকনি সরিয়ে নাকের কাছে তুলল সেটা, খাবারের ঘ্রাণ নিল। প্লেটের তলায় ওর আঙুলগুলো কিলবিল করছে। প্লাস্টিক পায়ার তলায় সূক্ষ্ম কোন খাঁজ থাকলে তার স্পর্শ পেত ও। এই প্লেটের খাবারে ওষুধ মেশানো হয়নি। একটা চামচ তুলে নিল ও। জ্বাল দিয়ে লালচে করে তোলা কটেজ পাই-এর মত দেখতে খাবারটা। এক চামচ মুখে দিল ও। মাংসের টুকরোটা প্রথমে ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে চিবাতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হলো, মুখ নাড়া বন্ধ করল, তারপর তিক্ত একটু হেসে আবার চিবাতে শুরু করল। মস্ত একটা ঢোক গিলে আরেক চামচ খাবার ভরল মুখে। পনেরো সেকেন্ড পর ট্রের ওপর সশব্দে ফেলে দিল হাতের চামচ।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'যদি রেস্তোরাঁয় থাকতাম, কিচেনে ফেরত পাঠাতাম প্লেটটা,' বলল রানা। 'না। শেফ-কে ডেকে তার মাথায় ঢালতাম এই খাবার। ছি, এটা কি একটা মুখে দেয়ার জিনিস!'

'বিষাক্ত, বলতে চাইছেন?'

'না। রান্নাটা বাজে।'

'আরেকটা প্লেট থেকে টেস্ট করতে আপনার হয়তো আপত্তি নেই?'

'আছে। আপনি বলেছেন, মাত্র একটা প্লেট থেকে খেতে হবে।'

গলার সুর আরও নরম করল কবীর চৌধুরী, 'আরে, খান। আপনার তো খিদেও পেয়েছে। নিন, নিন—হাত চালান।'

থমথমে হয়ে উঠল রানার চেহারা, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল আরেকটা প্লেট। ভাগ্যক্রমে, বিষ মেশানো নয়। আগের মতই চামচ দিয়ে মাংসের টুকরো চিবাল ও। বিপদ কেটে গেছে মনে করে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছে, এই সময় ওর হাতে আরেকটা প্লেট ধরিয়ে দিল কবীর চৌধুরী।

'নিন,' যেন কুটুমকে খাতির করে খাওয়াতে চাইছে কবীর চৌধুরী, 'এটা

থেকেও একটু চাখুন।'

প্লেটের পায়ার তলায় আঙুল ছোঁয়াতেই খাঁজ অনুভব করল রানা। এটা বিষ মেশানো খাবার।

চামচ দিয়ে খানিকটা খাবার মুখের কাছে তুলল রানা, হাঁ করল, তারপর কি মনে করে বন্ধ করল মুখ। চামচটা নাকের কাছে তুলে শুঁকল ও। সন্দেহের ছাপ ফুটল চেহারায়। তারপর চামচটা মুখের সামনে তুলে মাংসের টুকরোয় জিভ ঠেকাল শুধু, মুখে ভরল না। 'বিষাক্ত কিনা জানি না, তবে প্রথম দুটোর চেয়েও বাজে এটা। পচে গেছে নাকি? এমন বিচ্ছিরি কেন গন্ধটা?' প্লেটটা ডা. হিউমের নাকের সামনে ধরল ও।

রানার হাত থেকে প্লেট নিয়ে গন্ধ শুঁকল ডা. হিউম। তারপর নিঃশব্দে তার বিশেষজ্ঞ বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিল সেটা।

'চুপ করে থাকবেন না!' হুমকির সুরে বলল কবীর চৌধুরী।

খানিক ইতস্তত করে ডা. হিউম বলল, 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। ভাইরাসের পরিমাণ সামান্য, তাই হয়তো পরীক্ষার সময় ধরা পড়েনি। ঠিক জানতে হলে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে টেস্ট করাতে হবে।' চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি ধূমপান করেন?'

'বছরে দু'একটা—শখ করে।'

'ড্রিঙ্ক করেন?'

'না খেলে যদি প্রাণ হারাবার ঝুঁকি দেখা দেয়, তখন খেতেই হয়। তা না হলে সাধারণত খাই না।'

'ব্যাপারটা তাহলে খোলাসা হলো,' বলল ডা. হিউম। 'ননস্মোকার আর নন-ড্রিঙ্কারদের নাক আর জিভ সাংঘাতিক, স্বাদ-গন্ধ ধূমপায়ীদের চেয়ে একশো গুণ বেশি পায় ওরা। মি. প্রদ্যুৎ তাদেরই একজন।'

কারও সাথে পরামর্শ না করে এক এক করে আরও ছয়টা প্লেট পরীক্ষা করল রানা। সবগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল ও। ফিরল কবীর চৌধুরীর দিকে। 'আমার মতামতের কোন মূল্য আছে?'

'নেই। তবু শুনতে চাই।'

'সবগুলো নয়, বেশির ভাগ প্লেটই বাজে।'

'বাজে মানে?'

'বাজে মানে পয়জনাস। কোনটা বেশি, কোনটা কম। যেগুলোকে ভাল মনে হচ্ছে সেগুলোও হয়তো ভাল নয়। টেস্ট করলে হয়তো দেখা যাবে সবগুলো প্লেটেই বিষাক্ত খাবার রয়েছে। আমার তাই ধারণা। সবগুলোয় বোটুলিনাস ভাইরাস আছে।'

ডা. হিউমের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'সম্ভব?'

অস্বস্তি বোধ করছে ডা. হিউম। 'এরকম ঘটে। বোটুলিনাস সবখানে সমান হারে জমাট বাঁধে না। এতে কে কতটুকু আক্রান্ত হবে তাও বলা কঠিন। গত বছরই তো নিউ ইংল্যান্ডে একটা ঘটনা ঘটেছে। পিকনিকে গিয়েছিল পরিবারটা। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দশজন। ওদের খাবারেও বোটুলিনাস জমাট বাঁধে। পাঁচজন মারা

গেল, সামান্য অসুস্থ হলো দু'জন, তিনজন আক্রান্তই হলো না। অথচ স্যান্ডউইচগুলোয় একই মাংসের পেস্ট ভরা ছিল।'

পেরটকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল কবীর চৌধুরী।

'এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমাদেরকে ওরা দুর্বল ভাববে, চীফ।'

'তা ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা হলো না।'

'এটা বোধহয় ষড়যন্ত্র নয়, চীফ,' বলল পেরট। 'মি. প্রদ্যুৎ বিশটা প্লেট বিষাক্ত বলছেন। যতগুলো দরকার ছিল তারচেয়ে তিনটে বেশি।'

'কিন্তু কথাটা বলছে কে সেটা দেখছ না!'

'এতসব প্রমাণের পরও আপনি ওঁকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'বড় বেশি ঠাণ্ডা ও, বড় বেশি শান্ত। বোঝাই যায়, উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া লোক, সাত ঘাটের পানি খাওয়া—বাজি ধরে বলতে পারি, ওর আসল পেশা সাংবাদিকতা নয়।'

'আপনি কি এখনও এটাকে ষড়যন্ত্র বলে দেখাবার কথা ভাবছেন?'

'টিভিতে? একশোবার। ষড়যন্ত্র হোক বা না হোক, একটাই মাইক্রোফোন রয়েছে, এবং সেটা আমার হাতে।'

দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে তাকাল পেরট। 'দু'নম্বর ফুড ওয়াগন পৌঁছল।'

টিভি ক্যামেরা রেডি। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আসন নিয়েছেন। রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফাররাও যে যার চেয়ারে বসেছে। বিপুল কালো মেঘ বজ্র-মশাল নিয়ে ওদের দিকে মিছিল করে এগিয়ে আসছে। এর আগের দুটো অনুষ্ঠানেও এই নিয়মে বসেছিল সবাই, চোখে পড়ার মত পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এনার্জি সেক্রেটারি স্টিফেন বেকারের চেয়ারটা এবার দখল করেছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ড।

প্রেসিডেন্টের ঠিক পাশের চেয়ারটাতে বসেছে কবীর চৌধুরী। ক্যামেরা ঘুরছে, মাইক্রোফোনে কথা বলছে সে।

'প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আসসালামোয়ালায়কুম। আমেরিকা এবং গোটা দুনিয়ার দর্শকবৃন্দকে একটা জঘন্য অপরাধ চাক্ষুষ করার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। এই অপরাধ প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এই ব্রিজে সংঘটিত হয়েছে। আপনারা যাদেরকে ভালমানুষ বলে জানেন, যারা আইনের রক্ষক, তারাও যে ক্রাইম করে, এই ঘটনাটা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ফুড ওয়াগনটাকে দেখুন। ওয়াগনের কাউন্টার খাবার ভরা ট্রেতে ঢাকা পড়ে গেছে। জিনিসটা যেহেতু খাদ্য-বস্তু, নিরাপদ হবে বলেই ভাবছেন আপনারা। কিন্তু আসলে কি তাই?' তার আরেক পাশে বসা ডা. হিউমের দিকে তাকাল সে। 'ইনি ডা. হিউম, ওয়েস্ট কোস্টের সেরা ফোরেনসিক এক্সপার্টদের একজন।' ক্যামেরা আবার ওদের ওপর ফিরে এসেছে। 'আচ্ছা, মি. হিউম, ট্রের খাবারগুলো কি সত্যি নিরাপদ?'

'না।'

'কথা আরও জোরে বলতে হবে, ডা.।'

'না। ওগুলো নিরাপদ নয়। কয়েকটা বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

'কয়েকটা মানে ক'টা?'

'যতগুলো প্লেট আছে তার অর্ধেক। বেশিও হতে পারে। এখানে ল্যাবরেটরি নেই, কাজেই টেস্ট না করে সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।'

'বিষাক্ত বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। 'ইনফেক্টেড? কিসের দ্বারা ইনফেক্টেড?'

'ভাইরাস। বোটুলিনাস। ফুড পয়জনিঙের অন্যতম একটা উৎস।'

'কতটা বিপজ্জনক? মৃত্যু ঘটাতে পারে?'

'পারে।'

'ধরে নিতে পারি এই ফুড পয়জনিঙে প্রায়ই মৃত্যু ঘটে?'

'হ্যাঁ।'

'সাধারণত একটা খাবার নিজে থেকেই এই পয়জনে আক্রান্ত হয়—পচে গেলে বা এধরনের অন্য কোন কারণে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ল্যাবরেটরিতেও সিনথেটিক্যাল বা আর্টিফিশিয়ালি এর উৎপাদন সম্ভব?'

'এভাবে বললে ব্যাপারটাকে অতি সহজ আর হালকা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়...'

'আমরা চাইছি সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'এবং নিরাপদ একটা খাবারে এই ভাইরাস সিনথেটিক্যালি ইনজেক্ট করা যায়?'

'বোধহয় যেতে পারে।'

'হ্যাঁ কিংবা না?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ, ডা. হিউম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।'

অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। সাথে ডাক্তার অ্যাম্বু।

'আর কিছু না হোক, ভাল একজন উকিল হতে পারত লোকটা,' বলল রানা।

'টিভি ওকে জাদু করেছে।'

কয়েকশো কোটি দর্শককে উদ্দেশ্য করে বলে চলেছে কবীর চৌধুরী, 'আপনারা যারা মিনি পর্দায় চোখ রেখেছেন, তাঁদেরকে বলছি। মিলিটারি, পুলিস, এফ.বি.আই., সরকার বা অন্য কেউ, আমরা যারা এই ব্রিজের কর্তৃত্বে রয়েছি, তাদেরকে খুন করার একটা হীন অপচেষ্টা চালিয়েছে। এর নিন্দা—না, তা আমি করব না। নিন্দা বা প্রশংসা করার ভার আমি সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষের ওপর ছেড়ে দিলাম। তাঁরাই রায় দেবেন এই হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করাটা ওদে উচিত হয়েছে কিনা।

'বিষ মেশানো খাবার যখন পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আলাদা করে চেনার উপায়ও না থেকে পারে না। তারমানে এই ব্রিজেই কেউ একজন আছে যে ভাল

আর খারাপ খাবার চিনতে পারবে। তার দায়িত্ব ছিল, বিষাক্ত খাবার যাতে শুধু আমার আর আমার লোকদের হাতে পড়ে সেটা নিশ্চিত করা। খোদার অসীম দয়া, আমাদেরকে খুন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। এক ভদ্রলোক এই বিষ মেশানো খাবার খেয়ে ফেলেছেন। তাঁর পরিণতি সম্পর্কে পরে জানাচ্ছি আপনাদেরকে।

'ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ফুড ওয়াগনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে ব্রিজে এসে পৌচেছে ওটা।' ক্যামেরা দ্বিতীয় ফুড ওয়াগনের দিকে ঘুরল। 'কর্তৃপক্ষ আবার সেই একই জঘন্য কাজ করবে বলে মনে হয় না, তবে বলাও যায় না। কাজেই আমরা এখন দ্বিতীয় ফুড ওয়াগন থেকে তিনটে প্লেট নিয়ে প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স আর বাদশাকে খেতে দেব। তাঁরা যদি বেঁচে যান, আমরা ধরে নেব নতুন খাবারে বিষ মেশানো হয়নি। কিন্তু তাঁরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা মারা যান, দুনিয়ার লোক সাক্ষী থাকল, সেজন্যে আমাদেরকে দায়ী করা যাবে না। পুলিস আর সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ রয়েছে, ইচ্ছে করলে এক মিনিটের মধ্যে তাঁরা আমাদেরকে জানাতে পারেন, খাবারে বিষ আছে কি নেই।'

মেয়র মাইক সিলভার দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পেরট তার মেশিন-পিস্তল তুলল, কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কবীর চৌধুরীকে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মেহমানদের এই অবমাননা, এর শাস্তি তোলা রইল। আমি জানতে চাইছি, আপনার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে আরও নিচের কাউকে বেছে নিতে পারেন না?'

'নিচের কাউকে···আপনার মত?'

'হ্যাঁ, আমার মত?'

'মাই ডিয়ার মেয়র, আপনার সাহস বিতর্কের উর্ধ্বে—আমরা সবাই তা জানি। ঠিক এই কথা আপনার বুদ্ধি সম্পর্কে বলতে পারছি না। পরীক্ষা যদি হয়, এই তিনজনের ওপরই হবে। আজকের দিনে সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাঁরা। তাঁদের চূড়ান্ত বিদায় অর্থাৎ পরলোক-যাত্রা দেখার মত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। খাবারে বিষ মেশানোর জন্যে যারা দায়ী তাদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে, ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি। প্রাচীন কালে রাজা-মহারাজাদের খাবার প্রথম মুখে দিয়ে পরীক্ষা করত ক্রীতদাসরা। আমার ধারণা, ভারি মজা হবে সেই নিয়মটা যদি উল্টে দেয়া যায়। আপনি বসুন, প্লীজ।'

রানা একটা গাল দিল, 'মেগালোম্যানিয়াক বাস্টার্ড!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করল ডাক্তার অ্যাম্বু। 'তারচেয়েও খারাপ। জানে, এবারের খাবারে কিছু থাকার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু নাটকটা চালিয়ে যাবে। টিভিতে নিজেকে প্রচারের এই সুযোগ, সেটা তো উপভোগ করছেই, প্রেসিডেন্টকে অপমান করেও আনন্দ পাচ্ছে লোকটা। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, তবু বলছি, ও সুস্থ নয়, একটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমি যতটুকু বুঝি,' বলল রানা, 'সমাজের ওপর তার একটা ঘৃণা আছে। এই

অপারেশনের উদ্দেশ্য স্রেফ টাকা কামানো, কিন্তু সুযোগ পেয়ে ঘৃণাটুকু প্রকাশ করতে ছাড়ছে না, এই আর কি।'

'সমাজের ওপর ঘৃণা, সেটা কেন?'

'প্রশ্নটা কি বোকার মত হয়ে গেল না? দুনিয়ার যে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই তো অন্যায়, অবিচার, শোষণ আর বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।'

বিস্মিত হলো ডাক্তার। 'আপনি কি চৌধুরীকে সমর্থন করছেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'এরপর আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, আমি কমিউনিস্ট কিনা।'

রানার কথায় মন নেই ডাক্তারের, চেয়ারগুলোর দিকে খাবারের প্লেট নিয়ে যাওয়া দেখছে সে। 'আপনার কি মনে হয়, ওঁরা খাবেন?'

'খাবেন। কারণ জানেন, তা না হলে জোর করে খাওয়ানো হবে। তাছাড়া, বাদশা ও প্রিন্স যদি খেতে রাজি হন, আর প্রেসিডেন্ট যদি রাজি না হন, আগামী ইলেকশনে জেতা তো দূরের কথা, মনোনয়নই পাবেন না তিনি। একই ভাবে, প্রেসিডেন্ট যদি খান আর তাঁর মেহমানরা যদি না খান, লজ্জায় ওঁরা মুখ দেখাবেন কিভাবে?'

রানার কথাই ফলল। তাঁরা খেলেন। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজা থেকে মাথা নেড়ে সঙ্কেত দিল বেডলার, ইঙ্গিতে প্লেটগুলো দেখাল কবীর চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট পুতুল নন, কাউকে অনুকরণ করার ধার ধারেন না, বাদশা আর প্রিন্সের দিকে একবারও না তাকিয়ে ছুরি আর কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গোগ্রাসে গিললেন, তা বলা চলে না। খেলেন ধীরেসুস্থে, কিন্তু কোন বিরতি ছাড়াই। প্লেট অর্ধেকের মত খালি না করে থামলেন না তিনি। তারপর চামচ ইত্যাদি নামিয়ে রাখলেন ট্রে-র ওপর।

সাগ্রহে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'কেমন লাগল, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'হোয়াইট হাউসে আমার মেহমানদের এই খাবার দিলে আপত্তি করব, তবে পাতে দেয়ার অযোগ্য নয়।' প্রেসিডেন্টকে সম্পূর্ণ শান্ত, বরং এমন কি খুশি খুশি দেখে সবাই বুঝল কবীর চৌধুরী তাঁকে এতক্ষণ ধরে যতই অপমান করার চেষ্টা করে থাকুক, তিনি সে-সব গ্রাহ্য করেননি। 'ভাল হয় যদি একটু ওয়াইনের ব্যবস্থা করা যেত।'

'কয়েক মিনিট সময় দিন, প্লীজ। তারপর যত খুশি ওয়াইন চাইলেই পাবেন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এরপর যে দৃশ্যটা দেখবেন, সেটা যেমন শোকাবহ তেমনি মর্মান্তিক। দৃশ্যটা দেখার পর অনেকেই আপনারা রাগ আর শোক সামলাবার জন্যে ওয়াইন খেতে চাইবেন। প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে আসি। আমরা দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরক ফিট করতে যাচ্ছি কাল সকাল ন'টায়। আমেরিকান সময় কাল সকাল ন'টায়। অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে প্রিয় দর্শকদের সাদর আমন্ত্রণ রইল। এবার, ওই স্ট্রেচারের দিকে ক্যামেরা ধরা যেতে পারে।'

স্ট্রেচারটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। দুই মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। কবীর চৌধুরীর ইঙ্গিত পেয়ে একদিকের ক্যানভাস টেনে সরিয়ে নিল তারা। ফ্যাকাসে, ঝুলে পড়া লাশের মুখের ওপর জুম করল ক্যামেরা। দশ

সেকেন্ড কোন শব্দ নেই, ক্যামেরাও নড়ল না। তারপর মিনি পর্দায় আবার দেখা গেল কবীর চৌধুরীকে।

বলল, 'স্টিফেন বেকার, আপনাদের এনার্জি জার। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছে, বোটুলিনাস পয়জনিং। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে কে দায়ী তা এখনও কোথাও লেখা হয়নি, শুধু আপনাদের মনের পর্দায় ছাড়া।

'আমি, কবীর চৌধুরী, একজন ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল। ইতিহাসে এই প্রথম একজন ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল আইন রক্ষক কর্তৃপক্ষকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করল। আমি জানি, এ দেশের কোন আদালত আমার এই অভিযোগের বিচার করবে না। তাই আমি আমার মামলা এ দেশের জনসাধারণের কাছে দায়ের করলাম, আমি শুধু তাদেরই সুবিচার প্রার্থনা করি। ধন্যবাদ।'

জেনারেল গারল্যান্ডের মুখ থেকে গাল-মন্দ আর খিস্তির তুবড়ি ছুটল। সামরিক বাহিনীতে যারা যোগ দেয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই বিদ্যেটা রপ্ত করে নেয় তারা। শয়তানের বিষ্ঠা, ঘেয়ো কুকুর, মড়াখেকো ছাড়াও মা ও বোন সংক্রান্ত অনেক রকম বক্তব্য শুনতে পাওয়া গেল, কিন্তু বেশির ভাগই ছাপার অযোগ্য। জেনারেল ফিদার হোপ, অ্যাডমিরাল সোরেনসন, সেক্রেটারি অভ স্টেট এবং সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী একদম চুপ। তবে তাঁদের চেহারায় সমর্থনের ভাব ফুটে উঠল। জেনারেল গারল্যান্ড, হাজার হোক রক্ত-মাংসের মানুষ, এক সময় থামলেন—দম ফুরিয়ে গেছে।

'পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে,' প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট।

'ঘোলাটে মানে!' সবার দিকে একবার তাকালেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী। 'আমরা যদি এই রকম আরেকটা ভুল করি, দেশের অর্ধেক লোক চৌধুরীর পক্ষে চলে যাবে।'

'তারমানে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে আমাদের?' কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড। 'বেজন্মাটা...'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাড়াতাড়ি বললেন, 'রানার কাছ থেকে কিছু না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

'রানা?' অ্যাডমিরাল সোরেনসন একটু তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। 'এরপরও কি তার ওপর ভরসা করার কোন মানে হয়?'

'যা ঘটে গেছে, তার জন্যে রানা দায়ী বলে আমি মনে করি না,' বললেন হ্যামিলটন। 'তাছাড়া, ভুললে চলবে না, সিদ্ধান্তটা ছিল শতকরা একশো ভাগ আমাদের। কাজেই দায়ী যদি কেউ হয় তো আমরা।'

সবাই তাঁরা মাথা নত করলেন।

চার

দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে। সন্ধ্যায় ব্রিজে এল বিশেষ একটা অ্যাম্বুলেন্স, একটু পর এনার্জি সেক্রেটারির লাশ নিয়ে চলেও গেল সেটা। সময়ের অপচয় বলে মনে হলেও, লাশের পোস্টমর্টেম করা হবে। রাজ্যের আইন হলো, মৃত্যু অস্বাভাবিক হলে পোস্টমর্টেম এড়ানো যাবে না। লাশের সাথেই ব্রিজ থেকে বিদায় করে দেয়া হলো ডা. হিউম আর তার বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে। ব্রিজ ত্যাগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছার লক্ষণীয় অভাব দেখা গেল তাদের মধ্যে। রিপোর্টার, জিম্মি আর কিডন্যাপাররা ডিনার সারল—প্রথম দু'দল অরুচিতে ভুগছে, প্রায় কিছুই খেতে পারল না, তবে পানীয় খুব বেশি টানল। এত বেশি যে আরেক দফা পরিবেশন করতে হলো। টিভি ট্রাক দুটো চলে গেল, তার একটু পর গেল দুটো ফুড ওয়াগন। ব্রিজ থেকে সব শেষে বিদায় নিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। যাবার আগে ভাইস-প্রেসিডেন্ট একা, নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন প্রেসিডেন্টের সাথে। জেনারেল পীলের সাথে এই রকম একটা গোপন বৈঠক পুলিস চীফেরও হলো। দুটো ঘটনাই দূর থেকে সকৌতুকে প্রশ্রয়ের সাথে লক্ষ করেছে কবীর চৌধুরী, গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। তাঁদের গম্ভীর আর ম্লান চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি দুটো বৈঠকই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সমাধানের কোন উপায় বেরিয়ে আসেনি।

ডেভিড ল্যাংফোর্ড আর আর্ল ডিকসন পুলিস কারের দিকে এগোচ্ছেন, টেরির সামনে এসে থামল কবীর চৌধুরী। 'বলো।'

'পুলিস চীফ আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বলল টেরি, 'দু'জনের ওপর থেকে এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখ সরাইনি, স্যার। মি. প্রদ্যুৎ একবারও ওঁদের বিশ গজের মধ্যে যাননি।'

টেরির চোখেমুখে কৌতূহল লক্ষ করল কবীর চৌধুরী। 'প্রদ্যুৎ আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।' ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল সে। 'অপেক্ষা করুন।' ফিরল টেরির দিকে। 'কারণটা আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়।'

'তাঁকে তো তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে, স্যার। প্রতিটি টেস্টে উতরে গেছেন তিনি। আমরা যদি জানতে পারি ঠিক কি আপনি খুঁজছেন তাহলে হয়তো···'

'হ্যাঁ, উতরে গেছে সে।' চিন্তিত দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'আচ্ছা, তুমি হলে কি ওই বোটুলিনাস ডিনার খেতে, টেরি?'

'না।' ইতস্তত করল টেরি। 'তবে আপনি যদি সরাসরি হুকুম করতেন···'

'কিংবা কেউ যদি তোমার পিঠে পিস্তল ধরত।'

টেরি কোন কথা বলল না।

'প্রদ্যুৎ আমার হুকুমে চলে না। তার পিঠে পিস্তলও ধরেনি কেউ।'

'হয়তো অন্য কারও কাছ থেকে হুকুম পান তিনি।'

'হয়তো। খুব কড়া নজর রাখতে হবে, টেরি।'

'সারারাত জেগে থাকব।'

'থাকলে খুশি হব আমি।' পুলিস কারের দিকে এগোল কবীর চৌধুরী। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল টেরি।

পুলিস কারের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। তাঁর পাশে দাঁড়ানো পুলিস চীফ রাগে ফুলছেন। কবীর চৌধুরী হাসিমুখে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'সময়-সীমার কথা মনে আছে তো, মি. ল্যাংফোর্ড?'

'সময়-সীমা?'

হাসিটা বড় হলো চৌধুরীর মুখে। 'আপনার যা পদমর্যাদা, ন্যাকামি করা সাজে না, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ইউরোপে টাকা পাঠাতে হবে, ভুলে গেলেন? সব মিলিয়ে সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার। কাল দুপুরের মধ্যে।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড এমন অগ্নিদৃষ্টি হানলেন যে ওখানেই কবীর চৌধুরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হলো না।

'ফাইনের কথা? সেটাও নিশ্চয় মনে আছে? প্রতি ঘণ্টা দেরির জন্যে দুই মিলিয়ন ডলার জরিমানা। তারপর, বিনা শর্তে মুক্তি? জানি, এর জন্যে কিছু সময় নেবেন আপনারা। আপনাদের কংগ্রেস গাঁইগুঁই করবে। ওই সময়টা আমরা সবাই ক্যারিবিয়ানে হাওয়া খাব। শুভ সন্ধ্যা, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

রিয়্যার কোচের খোলা দরজার সামনে এসে থামল সে। এখানে রানা রয়েছে, বেডলারের কাছ থেকে এইমাত্র ফেরত পাওয়া ক্যামেরাটা কাঁধে ঝোলাচ্ছে ও। কবীর চৌধুরীকে দেখে সসম্মানে মাথা নামিয়ে বাউ করল বেডলার, হাসিমুখে বলল, 'বাঁশির মত পরিষ্কার, স্যার। দুর্লভ একটা ক্যামেরা···আমার যদি থাকত একটা!'

'একটা কেন, এক ডজন কিনতে পারবে—বেশি দেরি নেই। মি. অপারেটর, আপনার আরও একটা ক্যামেরা আছে।'

'আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আপনি বললে নিয়ে এসে দিতে পারি।'

'বেডলার, নিয়ে এসো।'

'পাঁচ লাইন পিছনে, জানালার দিকের সীট,' সাহায্য করল রানা। 'সীটের ওপরই পাবে।'

ক্যামেরা নিয়ে ফিরে এল বেডলার, দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'আশাহি-পেনট্যাক্স। এই রকম আমারও একটা আছে, স্যার। মিনি ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে একদম ঠাসা, ছোট একটা বোতামও লুকানো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ভেতরটা যদি ফাঁপা হয়?'

'দেখছি।' রানার দিকে তাকাল বেডলার। 'লোড করা?' মাথা নাড়ল রানা। ক্যামেরার পিছনটা খুলল সে, এই সময় ওদের সাথে যোগ দিল পেরট। ক্যামেরার ভেতরটা সবাইকে দেখাল বেডলার। 'ফাঁপা নয়।' পিছনটা বন্ধ করে দিল সে।

ক্যামেরা ফিরিয়ে নিল রানা। চেহারা এবং কণ্ঠস্বর, দুটোই ঠাণ্ডা। 'আপনি হয়তো আমার হাতঘড়িটাও চেক করতে চান। ওটা একটা ট্রানজিসটরাইজড দু'মুখো রেডিও-ও তো হতে পারে। সিনেমায় দেখেননি? প্রত্যেক স্পাইয়ের কাছে

একটা করে থাকে?'

চৌধুরী চুপ করে থাকল। রানার হাত ধরল বেডলার। ঘড়ির দু'দিকে দুটো খুদে নব রয়েছে, সেগুলোয় চাপ দিল সে। দুই সেট লালচে আলো দেখা গেল ডায়ালে। একটা আলোর মাঝখানে তারিখ দেখা গেল, অপরটায় দেখা গেল সময়। রানার কব্জি ছেড়ে দিল বেডলার।

'পালসার ডিজিটাল। বালির একটা কণাও ওখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'হুঁহ্!' আওয়াজটা করে ওখানে আর দাঁড়াল না রানা। গটমট করে চলে গেল। কানের পাশটা একবার চুলকে নিয়ে রিয়্যার কোচে উঠল বেডলার। পেরট জানতে চাইল, 'এখনও মন খুঁত-খুঁত করছে, চীফ? আপনিও কিন্তু ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন। সত্যি কিছু যদি লুকাবার থাকে ওর, আমাদেরকে এভাবে প্রকাশ্যে ঘৃণা করার সাহস দেখাতে পারত না।'

'আমরা এভাবে চিন্তা করব, সেটা হয়তো আগেই আন্দাজ করেছে ও। কিংবা সত্যিই হয়তো ওকে সন্দেহ করার কিছু নেই।' চীফকে গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন দেখল পেরট। 'কিন্তু,' বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'কোথাও কোন ঘাপলা আছে,-এই অনুভূতি আমাকে ছাড়ছে না। এধরনের অনুভূতি কখনও ঠকায়নি আমাকে। কিভাবে জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে এই ব্রিজে এমন একজন কেউ আছে যার বাইরের সাথে যোগাযোগ আছে।'

'আপনার বিশ্রাম দরকার, চীফ,' বলল পেরট।

চোখমুখ লাল হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর। মনে হলো, বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুধু তুমি জানো।'

'এবং আর কেউ জানবে না, চীফ,' মাথা নত করে আনুগত্য প্রকাশ করল পেরট। 'এখন কেমন? কোন রকম অসুবিধে বোধ করছেন?'

'একবার, একটু, বেশ কিছুক্ষণ আগে,' ফিসফিস করে বলল কবীর চৌধুরী।

'এখানে ডাক্তার আছে, কিন্তু তাকে জানানো চলবে না। আপনার প্রাইভেট ফিজিশিয়ানকে ডেকে পাঠালে হত না?'

'তাকে আসতে দেখলেই নানা গুজব ছড়াবে...'

'অবশ্য, তেমন কিছু ঘটলে অ্যাম্বুলেন্সে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট তো আছেই। চিকিৎসার অসুবিধে হবে না। আমার মনে হয়, অপারেশনটা করে ফেললেই ভাল করতেন, চীফ।'

'ওপেন হার্ট সার্জারীতে আমার ভয় নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল কবীর চৌধুরী। 'মরার ভয়ও আমি করি না। কিন্তু এখনও যে অনেক কাজ বাকি, পেরট!'

'জানি, চীফ।'

'টাকার অভাবে কত যে সময় নষ্ট হয়ে গেল।' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'এদিকে ফুরিয়ে আসছে আয়ু। সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা জানি না, থাকলে তাকে বলতে চাই, তুমি বাপু মস্ত একটা অন্যায় করছ।'

'কি অন্যায়, চীফ?'

'মানুষ বড় কম দিন বাঁচে, পেরট,' চৌধুরীর কণ্ঠস্বর থেকে আক্ষেপ ঝরে

পড়ল। 'অন্তত কিছু লোকের আয়ু তিন গুণ করে না দেয়াটা মস্ত একটা অন্যায়।'

'কিছু লোকের মধ্যে আপনি থাকবেন তার গ্যারান্টি কে দেবে, চীফ?'

'মানুষ অন্ধ, তারা আমাকে চিনতে পারছে না,' সখেদে বলল চৌধুরী। 'সভ্যতা আর মানবতাকে অমর করার জন্যে আমার সাধনা যে অবদান রাখতে পারে, তার তুলনা কোথায়? ওই কিছু লোকের তালিকায় আমি যদি না থাকি, সৃষ্টিকর্তার আরও একটা মস্ত অন্যায় হবে সেটা।'

'মাফ করবেন, চীফ। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আপনি ঠিক বলেছেন।'

'হার্ট নাকি ফুটো হয়ে যাচ্ছে,' চৌধুরীর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু বিষাদমাখা হাসি ফুটল। 'যে-কোন মুহূর্তে রক্ত বেরোতে পারে। তাহলে আর বাঁচব না।' হঠাৎ তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চেহারা হয়ে উঠল টকটকে লাল। 'কিন্তু আমার কাজগুলো শেষ করবে কে? কেউ আছে, যাকে আমি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি?'

'উত্তেজিত হবেন না, চীফ,' মৃদু কণ্ঠে আবেদন জানাল পেরট। 'আশায় বুক বাঁধতে হবে আপনাকে। এবার একসাথে অনেকগুলো টাকা আসছে হাতে। গবেষণার কাজ চালাতে আর কোন অসুবিধে হবে না। দরকার হলে কৃত্রিম একটা হার্ট...'

'কাজের কথা, পেরট,' প্রসঙ্গটা আর ভাল লাগছে না চৌধুরীর। 'আমি চাই, প্রতিটি লোকের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করা হোক। মেহমানরা কেউ যেন বাদ না পড়ে। মেয়েরা আপত্তি করবে, কান দেয়ার দরকার নেই। প্রতিটি লোকের প্রতিটি জিনিস, কোচের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করো।'

'রাইট, চীফ। রেস্ট রুম?'

'ওগুলোও।'

'অ্যাম্বুলেন্স, চীফ?'

'হ্যাঁ। ওটা আমি নিজে সার্চ করব।'

কবীর চৌধুরীকে অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকতে দেখে অবাক হলো ডাক্তার। 'আপনি? বোটুলিনাস আবার অ্যাটাক করেনি তো?'

'না। আপনার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে এসেছি।'

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার, টানটান চেহারা। 'বাইরের কাউকে আমি আমার মেডিকেল সাপ্লাই ছুঁতে দিই না।'

'আমি ছোঁব। লোকজন ডাকি, চান? ওরা আপনাকে বাঁধবে। মাথায় পিস্তলের বাঁট ঠুকে অজ্ঞানও করে দিতে পারে।'

'জানতে পারি, কেন সার্চ করতে চাইছেন? কি খুঁজছেন আপনি?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'দিলাম না বাধা। শুধু এই বলে সাবধান করছি, এখানে বিপজ্জনক ড্রাগ, এবং সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে। আপনার শরীরে যদি বিষ ঢোকে বা মোটা একটা রগ কেটে যায়, এই ডাক্তার আপনাকে কোন রকম সাহায্য করবে না।'

বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে জুলি। তার দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কবীর চৌধুরী। 'ওকে তুলুন।'

'তুলব? মানে?'

দরজার দিকে তাকাল চৌধুরী, 'ডাকব ওদেরকে?'

জুলির ছোট্ট শরীরটা দু'হাতে তুলে নিল ডাক্তার। বিছানার প্রতিটি ইঞ্চি যত্নের সাথে পরীক্ষা করল চৌধুরী। তলাটাও দেখতে ভুল করল না। 'শুইয়ে দিন।'

এরপর অ্যাম্বুলেন্সে যত রকম মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আছে সব এক এক করে পরীক্ষা শুরু করল সে। কি খুঁজছে জানে, সেটার সাথে এগুলোর কোন মিল খুঁজে পেল না। এক ধারে একটা টর্চ ঝুলছিল, হাত বাড়িয়ে নামাল সেটা। বোতাম টিপল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে মুখ খুলল। চাপ দিয়ে ছোট করল হুড। 'বড় অদ্ভুত ফ্ল্যাশলাইট তো!'

'ওটা একটা অপথ্যালমিক টর্চ,' বিরক্তি গোপন না করে বলল ডাক্তার। 'সব ডাক্তারেরই একটা করে থাকে। চোখের রোগ ধরতে সাহায্য করে।'

'চোখ তুলে নিতেও সাহায্য করবে, আশা করি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এই মুহূর্তে অবশ্য অন্য কাজে ব্যবহার করব। আসুন আমার সাথে।' পিছনের সিঁড়ি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল ড্রাইভারের পাশে। একটা সেক্স ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছিল ড্রাইভার, চৌধুরীকে দেখে আঁতকে উঠল সে।

'বেরোও!' তাড়াতাড়ি নিচে নামল ড্রাইভার। কোন কারণ ব্যাখ্যা না করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তন্নতন্ন করে সার্চ করল কবীর চৌধুরী। তারপর ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে উঠে সীট, কয়েকটা লকার ইত্যাদি যা কিছু আছে সব টর্চের আলোয় পরীক্ষা করল। নিচে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'ইঞ্জিনের হুড তোলো।'

হুকুম তামিল হলো। টর্চের আলোয় ইঞ্জিন চেক করল সে। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে এল অ্যাম্বুলেন্সে। পিছু পিছু এল ডাক্তার, তার হাত থেকে টর্চটা আলতোভাবে নিয়ে রেখে দিল আগের জায়গায়। ইঙ্গিতে একটা মেটাল ক্যান দেখাল চৌধুরী। একটা স্প্রিং ক্লিপের সাথে আটকানো রয়েছে। 'ওটা কি?'

'অ্যারোসল এয়ার-ফ্রেশনার,' বলল ডাক্তার। এই ক্যানেই রয়েছে মারাত্মক নার্ভ গ্যাস।

ক্লিপ থেকে ক্যানটা নামাল চৌধুরী। 'চন্দন,' পড়ল সে। 'অদ্ভুত একটা সুগন্ধ পছন্দ করেন দেখছি!' ক্যানটা কানের কাছে তুলে ঝাঁকাল সে। তরল চন্দন কল কল করে উঠল। সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে ডাক্তার, তার কপালের ঘাম যেন চৌধুরীর চোখে ধরা না পড়ে।

ক্যানটা ক্লিপে আটকে রাখল চৌধুরী। মেঝেতে রাখা চকচকে কাঠের একটা বাক্সের ওপর নজর পড়ল তার। 'ওটা?'

জবাব দিল না ডাক্তার। তার দিকে তাকাল চৌধুরী। একটা লকারে কনুই রেখে গালে হাত দিল ডাক্তার, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। তীক্ষ্ণ সুরে চৌধুরী বলল, 'কি হলো?'

'মি. চৌধুরী, আমার মত একজন নিরীহ লোককে অকারণে বিরক্ত না করলেই

কি নয়? এমন সব প্রশ্ন করছেন, আপনাকে আমার অশিক্ষিত মনে হচ্ছে। বড় বড় লাল অক্ষর, পড়তে পারছেন না? কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট—কারও হার্ট অ্যাটাক করলে ওই ইকুইপমেন্টের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।'

'সামনে অত বড় লাল সীল কেন?'

'ওটাই একমাত্র সীল নয়। গোটা ইউনিটটাই হারমেটিক্যালি সীল করা। ভেতরের প্রতিটি বিন্দু এবং ইকুইপমেন্ট বাক্স সীল করার আগে স্টেরিলাইজ করা হয়েছে। স্টেরিলাইজ না করা একটা সুঁই কোন রুগীর হার্টে বা হার্টের আশপাশে ঢোকানো হয় না।'

'সীলটা যদি ভাঙি, কি হবে?'

'আপনার? কিছুই হবে না। তবে সম্ভাব্য রুগীদের মস্ত ক্ষতি হবে। সীল ভেঙে ভেতরের ইকুইপমেন্ট হাতড়াবেন আপনি, ফলে ওগুলো আর ইমার্জেন্সীর সময় ব্যবহার করা যাবে না। এইটুকু বলতে পারি, প্রেসিডেন্টকে যেভাবে আপনি প্রতি মুহূর্তে অপদস্থ করছেন, তাঁর হার্টে গোলযোগ দেখা দিলে একটুও অবাক হব না আমি।' স্প্রিং ক্লিপের দিকে একটু সরে এল ডাক্তার। অ্যারোসল ক্যান এখন তার হাত থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। চৌধুরী যদি সীল ভেঙে ইউনিটের ভেতর দিকে হাত বাড়ায়, বিনা দ্বিধায় নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করবে সে। হয়তো ব্যবহার করতেও হবে না, সায়ানাইড এয়ার পিস্তল না-ও চিনতে পারে চৌধুরী। 'অবশ্য প্রেসিডেন্ট হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে সরাসরি আপনাকে কেউ দায়ী করতে পারবে না। কাজেই, ইচ্ছে হলে ভাঙতে পারেন সীল।'

'না, থাক।' বলে হঠাৎ করেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল চৌধুরী।

দরজার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে হন হন করে এগোল চৌধুরী, রানাকে পাশ কাটাল কিন্তু ওর দিকে একবারও তাকাল না। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। 'ব্যাপার কি, ডাক্তার? চৌধুরীকে অতিশয় বিচলিত বলে মনে হলো?'

'আপনিও তাহলে ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন?'

'পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।'

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটের সীল ভাঙলে হার্টের রুগীর চিকিৎসা হবে না, এই কথা শুনেই কেমন যেন হয়ে গেল চৌধুরী। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'হয়তো ওর নিজের হার্টের অবস্থা তেমন ভাল না,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই সার্চ করতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু পায়নি।'

'না।'

'ভেরি গুড।'

চৌধুরীকে লক্ষ করছে পেরট, কিন্তু চেহারায় কৌতূহল ফুটল না। 'অ্যাম্বুলেন্সে কিছু পেলেন, চীফ? কিংবা ডাক্তারের কাছে?'

'অ্যাম্বুলেন্সে কিছু নেই। ধেত্তেরি, ডাক্তারকে সার্চ করার কথা মনেই ছিল না।'
'ঠিক আছে, তাঁকে আমি সার্চ করব।'
'তুমি কিছু পেলে, পেরট?'
'আমরা দশজন মিলে সব তন্নতন্ন করেছি। পাইনি কিছু।'
ভুল জায়গায় ভুল লোকজনকে সার্চ করছে ওরা। ব্রিজ থেকে চলে যাবার অনুমতি পাবার আগে পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনকে সার্চ করা উচিত ছিল ওদের।

লম্বা টেবিলে বসে আছেন দুই জেনারেল, দুই অ্যাডমিরাল এবং দুই সেক্রেটারি। ওদের সামনে বোতল, বরফ আর গ্লাস রয়েছে। প্রায় সবাই যে যার গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে আছেন। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেন না বা কেউ কারও সাথে কথা বলছেন না। এই পরিবেশের সাথে তুলনা করলে শোক-সভাকে মনে হবে আনন্দ উৎসব। কমিউনিকেশন ওয়াগনের ভেতর দিকে নরম একটা বেল বাজল। আস্তিন গুটানো একজন পুলিস অফিসার টেলিফোনের ভিড় থেকে একটা তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে কথা বলল। ঘাড় ফেরাল সে। 'মি. নিউসম, স্যার! ওয়াশিংটন।'
সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বিরস বদনে আসন ত্যাগ করলেন, দেখে সবার মনে হলো অভিজাত একজন ফ্রেঞ্চ গিলোটিনে মাথা পেতে দিতে যাচ্ছেন। কমিউনিকেশন টেবিলের সামনে পৌঁছে অফিসারের হাত থেকে রিসিভার নিলেন তিনি। হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া কোন আওয়াজ করলেন না। সবশেষে বললেন, 'হ্যাঁ, প্ল্যান মোতাবেক।' ফিরে এসে সশব্দে আসন নিলেন তিনি। 'যদি দরকার হয়, তাই টাকার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।'
সেক্রেটারি অভ স্টেট ভারী গলায় জানতে চাইলেন, 'দরকার হবে না, এমন মনে করার কোন কারণ দেখছ তুমি?'
'ট্রেজারী বলছে, আমরা যেন দেই-দিচ্ছি করে কাল দুপুরের পর আরও চব্বিশ ঘন্টা পার করে দিই।'
'সেক্ষেত্রে আরও প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে চৌধুরীকে।'
'চাইলেই হলো আর কি!' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর মুখে রুগ্ন একটু হাসি ফুটল। 'আমাদের কেউ একজন একটা বুদ্ধি বেরও করে ফেলতে পারে। সেজন্যেই সময় নেয়া।'
এরপর আবার সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। খানিক পর ওয়াইনের বোতলটা টেনে নিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। সেটা নিঃশব্দে বারবার হাত বদল হতে লাগল।
ওয়াগনে উঠলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। কেউ কোন কথা না বলে খালি চেয়ার দুটোয় বসলেন তাঁরা। তারপর হাত বাড়ালেন দু'জনেই, কিন্তু এক সেকেন্ড আগে ভাইস-প্রেসিডেন্টই বোতলটা ছুঁলেন। নিস্তব্ধতাও ভাঙলেন তিনি, 'টিভিতে কেমন দেখলেন আমাদের?'
'দেখলাম আমেরিকা খাবি খাচ্ছে,' হতাশ সুরে বললেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। 'দুনিয়ার সেরা দেশ, একজনের মাথাতেও একটা বুদ্ধি আসছে না! দুনিয়া জয় করতে পারি, কিন্তু চৌধুরীর মত একটা পিঁপড়েকে মারতে পারি না! এই কি

আমাদের পরিচয়?'

'কেউ না পারলেও পিঁপড়েটাকে রানা মারতে পারবে,' বললেন পুলিস চীফ। একটা মোজার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। 'আপনার জন্যে।'

ভাঁজ খুলে কাগজটার ওপর চোখ বুলালেন হ্যামিলটন। পরমুহূর্তে অপারেটরের দিকে ফিরে গর্জে উঠলেন তিনি, 'আমার ডিকোডার! কুইক।' পুলিস চীফের দিকে তাকালেন তিনি। পানীয়র অভাবে মরে যেতে বসলেও ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাহায্য চাইবেন না তিনি। 'ওখানের অবস্থা কি বুঝলে? আমরা জানি না এমন কিছু দেখেছ? বেকার মারা গেল কিভাবে?'

'বললে নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, খিদে আর লোভেই মারা গেছে সে। ফুড ট্রে সম্পর্কে কেউ তাকে সাবধান করার আগেই একটা প্লেট ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'ও তো চিরকেলে পেটুক ছিল। খাবার দেখলে তার আর তর সইত না। ধারণা করি, তার মেটাবোলিক সিস্টেমে নিশ্চয়ই কোন গোলযোগ ছিল। মরা মানুষ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে নেই, কিন্তু তাকে আমি বরাবর সাবধান করে দিয়ে বলেছি, তুমি তোমার দাঁত দিয়েই নিজের কবর খুঁড়ছ। ঘটলও ঠিক তাই।'

'রানার কোন দোষ নেই?'

'এক বিন্দু না। তবে তার সম্পর্কে একটা খারাপ খবর আছে। চৌধুরী তাকে ভয়ানক সন্দেহ করছে। চালাক, অতি চালাক লোক এই চৌধুরী। কিভাবে যেন তার বিশ্বাস হয়েছে, ব্রিজে একজন দক্ষ এজেন্ট অনুপ্রবেশ করেছে। প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছে সে, লোকটা রানা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যদিও এখন পর্যন্ত রানার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি।'

'চৌধুরী যদি বুনো ওল হয় তো রানা তেমনি বাঘা তেঁতুল,' হ্যামিলটন বললেন, 'কিন্তু চৌধুরী যদি এতই সন্দেহ করছে, তোমাদের বিশ গজের মধ্যে রানাকে তো আসতে দেয়ার কথা নয় তার। বিশেষ করে জানে, ব্রিজ থেকে চলে আসবে তোমরা।'

'রানা আমার কাছাকাছি আসেওনি,' পুলিস চীফ বলছেন, 'ওর মেসেজ আমি জেনারেল পীলের কাছ থেকে পেয়েছি। রানা তাঁকেই দিয়েছিল মেসেজটা।'

'তারমানে জেনারেল পীল এর মধ্যে আছেন?'

'হ্যাঁ। রানা তাকে একটা সায়ানাইড পিস্তল দেবে বলে জানিয়েছে। আমার ধারণাই ছিল না, জেনারেল পীল এই রকম রক্তপিপাসু হয়ে উঠতে পারেন। দেখে মনে হলো, সত্যি সত্যি পিস্তলটা ব্যবহার করার কথা ভাবছেন তিনি।'

অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'সামনাসামনি যুদ্ধে পীলের কৃতিত্ব এরই মধ্যে ভুলে গেলে তোমরা? ট্যাঙ্ক কমান্ডার হিসেবে শত্রুদের মূর্তিমান আতঙ্ক ছিল না!'

'মনে পড়েছে! তাঁর কাছ থেকে মেসেজটা নিয়ে রেস্ট রুমে চলে যাই, তারপর মোজার ভেতর লুকিয়ে ফেলি। মনে করেছিলাম, ব্রিজ থেকে চলে আসার আগে

আমাদেরকে সার্চ করা হবে। ভাগ্যই বলব, তা হয়নি। রানার কথাই ঠিক। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর অহমিকায় ভুগছে চৌধুরী। সিকিউরিটির ব্যাপারে তার তেমন কোন মাথাব্যথাই নেই।'

রস পেরট চলে যাচ্ছে, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আর ডাক্তার। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে ডাক্তারকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিল রানা। 'সার্চ করতে এরা ভালই জানে, কিন্তু লুকানো জিনিস খুঁজে পেতে জানে না। আপনি যখন পেরটকে বললেন তাকে আপনি রোগী হিসেবে পেলে প্রতিশোধ নেবেন, রাগে চেহারা কেমন লাল হয়ে উঠেছিল, লক্ষ্য করেছেন?'

কালো অশুভ মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকাল ডাক্তার। বাতাসের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। কয়েকশো ফিট নিচে গোল্ডেন গেটের ঢেউয়ের মাথায় ফেনা—সাদা ঘোড়ার মেলা বসেছে যেন। 'সামনে দুর্যোগের রাত। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরই বরং আরামে থাকব, আমার সাথে ভাল কিছু বিয়ার আছে।'

'কিন্তু আমাকে বাইরে থাকতে হবে।'

'কারণটা...'

'শুধু অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে এসেছিল চৌধুরী, বলতে চান? খুদে একটা আড়িপাতা যন্ত্র রেখে যায়নি?'

'মাই গড!'

'এক হপ্তা ধরে খুঁজলেও ওটা আপনি পাবেন না।' সবচেয়ে কাছের হেলিকপ্টারের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকাল রানা। 'পাইলটের নামটা কি যেন?...মনে পড়েছে, ওয়াল্টার।'

'হঠাৎ পাইলটের নাম মনে করতে হচ্ছে কেন?'

'ভাবছি, আজ রাতে কি সে তার মেশিনেই ঘুমাবে?'

'আর্মি 'কপ্টারে বেশ কয়েকবারই চড়তে হয়েছে আমাকে,' বলল ডাক্তার। 'ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরি ক্যানভাস চেয়ার থাকে ওগুলোয়। এই চেয়ার আর শূল, দুটোর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিতে হলে টস করব আমি।'

'আমারও তাই ধারণা—সঙ্গীদের সাথে রিয়্যার কোচেই শোবে সে।'

'বিশেষ করে এই হেলি-র ওপরই আপনার নজর পড়েছে। ব্যাপারটা কি?'

শান্তভাবে নিজের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কাছাকাছি কেউ নেই যে ওদের কথা শুনতে পাবে। 'বিস্ফোরকের ডিটোনেটিং মেকানিজম আছে ওতে। আমার ইচ্ছে, আজ রাতে ওটাকে ডিঅ্যাকটিভেট করি।'

কিছুক্ষণ কথাই বলল না ডাক্তার। তারপর মৃদু কণ্ঠে জানাল, 'ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য আপনার চোখের পর্দা কেটে দেয়া।'

'কেন? আমাকে অন্ধ বলে মনে করছেন কেন?'

'অন্তত একজন সশস্ত্র গার্ড সারারাত পাহারা দেবে ওটাকে। আর গোটা ব্রিজে আলোর বন্যা বইবে। ডিটোনেটিং মেকানিজম নয়, ওই 'কপ্টারের কাছাকাছি যেতে চাইলে নিজেকেই ডিঅ্যাকটিভেট করা হবে।'

'গার্ড কোন সমস্যা নয়, ওকে আমি সামলাতে পারব। আর আলো? আমি

যখন চাইব তখন আলো নিভিয়ে দেয়া যাবে।'

'অ্যাব্র্যাক্যাড্যাব্র্যা!'

'ব্রিজ থেকে এরই মধ্যে মেসেজ চলে গেছে।'

'হোয়াট? সিক্রেট এজেন্টরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে, জানি। কিন্তু তারা যে জাদুও জানে, কই, শুনিনি তো! কিভাবে, কখন পাঠালেন মেসেজ? আস্তিন থেকে পায়রা বের করে ছেড়েছেন…?'

'পুলিস চীফ নিয়ে গেছেন।'

'আমাকে একটু মাফ করতে হবে, প্লীজ। দু'ঢোক পেটে না পড়লে আপনার সাথে পাল্লা দিয়ে বুদ্ধি খুলবে না আমার।' হন হন করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে চলে গেল ডাক্তার। দেড় মিনিটের মধ্যে ফিরল সে। 'টেরি সম্পর্কে একটা কথা, মি. প্রদ্যুৎ। ঈগলের চোখ। আমার নিজের চোখও কিছু কম নয়। খোলা ব্রিজে ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর পুলিস চীফ যতক্ষণ ছিলেন, আপনার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরায়নি সে। নিশ্চয়ই চৌধুরীর কাছ থেকে স্পেশাল অর্ডার পেয়েছে।'

'তাই। কিন্তু পুলিস চীফের ধারে কাছেও যাইনি আমি। টেরি আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সে জেনারেল পীল আর পুলিস চীফের দিকে খেয়ালই রাখেনি। আমার মেসেজ পুলিস চীফ পেয়েছেন জেনারেলের কাছ থেকে।'

'আলো কখন নিভবে?'

'এখনও জানি না। আমি সিগন্যাল পাঠাব।'

'জেনারেল পীল তাহলে আমাদের দলে নাম লিখিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ভাল কথা, জেনারেলকে সায়ানাইড গান দেব বলে কথা দিয়েছি। পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'একজন জেনারেলকে কথা দিলে সেটা তো রাখতেই হয়।'

'আরেকটা কথা। কার্ডিয়াক ইউনিটের সীল একবার ভাঙলে আবার সেটা লাগানোর উপায় থাকে?'

'আপনি আশঙ্কা করছেন চৌধুরী আবার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে আসতে পারে? না, সীল একবার ভাঙলে সেটা আর লাগানো সম্ভব নয়। তবে বাক্সের ভেতর আরও দুটো স্পেয়ার সীল আছে।'

'আপনি একটা প্রতিভা, ডাক্তার,' বলল রানা। 'প্রস্তাবটা দিয়েই ফেলি। যদি কখনও পেশা বদল করতে চান, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, প্লীজ। বিদায়ের আগে ঠিকানাটা চেয়ে রাখবেন।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রদ্যুৎ।'

টাইপ করা কাগজটা ডিকোডার থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন হ্যামিলটন। চোখ বুলাচ্ছেন, প্রতি মুহূর্তে ঢেউয়ের আকৃতি পাচ্ছে ভুরু আর কপাল। মুখ তুলে পুলিস চীফের দিকে তাকালেন। 'রানাকে শেষবার যখন দেখলে, ও কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল?'

'অ্যাডমিরাল, আপনিই তো বলেছেন, ওর চেহারা দেখে কখনোই কিছু বোঝা যায় না…'

'সত্যি। ওর এই মেসেজ, আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার রহস্য, হ্যামিলটন, আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো।'

'রানা বলছে: আজকেরটা বোধহয় দুর্যোগের রাতই হবে, তবে আমাদের জন্যে অনুকূল। এখন আমি দু'জায়গায় দুটো আগুন চাই। শুধু তেল দিয়ে, বা তেল আর রাবার দিয়ে আগুন ধরান। একটা চাই আমার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ধরুন লিংকন পার্কে। আরেকটা পুব দিকে, ধরুন ফোর্ট ম্যাসনে—প্রথমটার চেয়ে বড় আগুন হবে এটা। লিংকন পার্কের আগুনটা বাইশশো ঘণ্টায়। দুই-দুই-শূন্য-তিনঘণ্টায়, দরকার হলে ইনফ্রা-রেড সাইটের সাহায্য নিয়ে একটা লেজার বীম ব্যবহার করুন, রিয়্যার কোচের মাথায় বসানো রেডিও স্ক্যানারটা ধ্বংস করতে হবে। আমার ফ্ল্যাশলাইটের সিগন্যাল—এস.ও.এস.—না পেলে দ্বিতীয় আগুন জ্বালবেন না। পনেরো মিনিট পর ব্রিজ আর সান ফ্রান্সিসকোর উত্তর দিকের আলো নিভিয়ে দিন। দারুণ সাহায্য হবে ওই একই সময়ে যদি চায়না টাউনে আতসবাজি পোড়ানো হয়—দেখে যেন মনে হয় আতসবাজির কারখানায় আগুন ধরে গেছে।

'মাঝরাতে সাবমেরিন। ট্রানজিসটরাইজড ট্র্যান্সিভার দরকার, খুব ছোট, যাতে বেস ক্যামেরায় জায়গা হয়। আপনাদের এবং আমার ফ্রিকোয়েন্সি আগেভাগে সেট করে রাখবেন, সাবমেরিনের রেডিও-ও যেন ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা থাকে।'

বেশ কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল হ্যামিলটন থেমেছেন। অথচ কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন না। অবশেষে স্কচের দিকে আবার হাত বাড়ালেন হ্যামিলটন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোতলটা একবার করে নিজের দিকে টানল। নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত এই টানা-হ্যাঁচড়া থেকে রেহাই পেল না বোতলটা। তারপর রায় দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, 'ওই লোক একটা পাগল। সন্দেহ নেই, —বদ্ধ, বদ্ধ একটা উন্মাদ!'

সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করায় এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে রাজি নয় কেউ। প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত থাকায় তিনিই দেশের কাণ্ডারী, তাঁর কথাই আইন, তিনিই সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। কিন্তু পাগল আখ্যা দিয়ে তিনি চুপ করে থাকায় সবাই বুঝলেন, সিদ্ধান্ত তিনি আর কাউকে নিতে বলছেন। দায়িত্বটা যেচে পড়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন হ্যামিলটন।

তিনি মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমার বিবেচনায় রানা আমাদের চেয়ে অনেক কম পাগল। সে যে একটা প্রতিভা তার প্রমাণ আগেই আমরা পেয়েছি। মেসেজটা দুর্বোধ্য লাগার কারণ, সময়ের অভাবে সব কথা ব্যাখ্যা করে লিখতে পারেনি ও। সবশেষে জানতে চাই, ওর চেয়ে ভাল কোন আইডিয়া কেউ দিতে পারছে? ভুল হলো। কেউ কি আদৌ কোন আইডিয়া দিতে পারছে?'

কারও কাছে আইডিয়া থাকলেও, চেপে গেলেন।

'ডিকসন, ডেপুটি মেয়র আর ফায়ার চীফকে তলব করো। ওই আগুনগুলো জ্বালাও। আতসবাজির ব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ?'

পুলিস চীফ মৃদু হাসলেন। 'আতসবাজি পোড়ানো সানফ্রান্সিসকোয়

বেআইনী। ঘটনাচক্রে, চায়নাটাউনে বেআইনী একটা কারখানা আছে বলে জানি আমরা। মালিক লোকটা সহযোগিতা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। 'পাগল!' বললেন তিনি। 'বদ্ধ উন্মাদ!'

পাঁচ

সাগরের উপর আঁকাবাঁকা আলোর রেখা আর দূর থেকে ভেসে আসা গুরু-গম্ভীর আওয়াজ ওদেরকে মনে করিয়ে দিল, ঝড়-বৃষ্টি এগিয়ে আসছে। ব্রিজের মাঝখানে রানার সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলি। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে চেহারাটাকে তাজা ফুল আর শরীরটাকে ঝরঝরে এক ফোঁটা বৃষ্টি করে নিয়েছে। 'আজকের রাতটা যেন কেমন, না?' রানার আরও একটু গায়ের কাছে সরে এল সে। তাকাল আকাশের দিকে।

জুলির কাঁধে একটা হাত দিল রানা। 'সবকিছুর মত ঝড়-ঝাপটাকেও বুঝি ভীষণ ভয় পাও তুমি?'

'যখন আসে ব্রিজের মত কোথাও থাকতে চাই না।'

'পঞ্চাশ বছর ধরে যেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ রাতেই সেটা ভেঙে পড়বে না।' বৃষ্টির প্রথম কিছু ফোঁটা পড়তে শুরু করল, রানাও মুখ তুলল আকাশের দিকে। 'কিন্তু ভিজতে আমিও রাজি নই। এসো।'

লীড কোচে উঠে নিজেদের আসন দখল করল ওরা। জানালার ধারের সীটে জুলি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভরে গেল কোচ, আধঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে যদি নাও পড়ে, ঝিমাতে শুরু করল আরোহীরা। প্রতিটি সীটে রয়েছে আলাদা একটা করে রিডিং লাইট। এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি আলো হয় কমানো নয়তো নেভানো। করার কিছু নেই, দেখার কিছু নেই। দিনটা ছিল বড়, নানা দিক থেকে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। পেশীতে ঢিল পড়তেই চোখে জেঁকে বসল ঘুম। সোনায় সোহাগা হলো বৃষ্টির মিষ্টি রিমঝিম একটানা গান।

রাত যত বাড়ছে বৃষ্টির তেজও বাড়ছে তত। ঝড় এসে পৌছতে দেরি আছে এখনও, কিন্তু বাতাসের তীক্ষ্ণ বোলচাল আর বিদ্যুৎ চমকের চোখ ঝলসানো ঘটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না আবহাওয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি বা বজ্রপাত দুটোর কোনটাই ক্ষান্ত করতে পারেনি টেরিকে। নিষ্ঠার সাথে টহল দিয়ে যাচ্ছে সে। চৌধুরীকে কথা দিয়েছে, সারারাত জেগে নজর রাখবে রানার ওপর, ঠিক তাই করছে লোকটা। নিয়মিত পনেরো মিনিট অন্তর কোচে উদয় হচ্ছে সে। প্রথম কাজ চোখা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকানো। তারপর পিটার নটহ্যামের সাথে ফিসফিস করে দু'একটা কথা।

ড্রাইভারের পাশের সীটে তেরছা ভাবে বসে দরজার দিক মুখ করে আছে পিটার। রানা ছাড়া একমাত্র সে-ই জেগে আছে কোচে। সন্দেহ নেই, টেরি জেগে

থাকতে বলেছে তাকে। একবার ওদের দু'একটা কথা শুনতে পেয়েছে রানা। পিটার জানতে চাইছিল তার পালা শেষ হবে কখন। তাকে ধমক দিয়ে বলা হলো, রাত একটার আগে এখান থেকে নড়তে পারবে না।

রানার তাতে কোন অসুবিধে নেই।

ন'টার সময় আবার রুটিন চেকে এল টেরি। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। সাদা কলমটা বের করে তৈরি হলো রানা। কোচ থেকে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল টেরি। প্রথম ধাপে পা দিতে যাবে, এই সময় ঘটল ঘটনাটা। ভঙ্গিটা হোঁচট খাওয়ার মত। দড়াম করে পড়ে গেল সে, সিঁড়ির ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে রাস্তায়।

তার কাছে প্রথমে পৌঁছল পিটার, তারপর রানা।

'কিভাবে পা পিছলাল!'

'কি আশ্চর্য, পড়ল কিভাবে?' অবাক হলো রানা।

'নিজের দোষে,' বলল পিটার। 'গায়ে বৃষ্টির পানি নিয়ে কোচে ও-ই তো ওঠা-নামা করেছে, ভিজে পিছলা হয়ে আছে সিঁড়ি!'

টেরিকে পরীক্ষা করল ওরা। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে। পতনের আসল ধাক্কাটা সামলেছে কপাল, মাঝখানে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। পরীক্ষা করার ছুতোয় তার মাথায় আলতো ভাবে আঙুল বুলাল রানা। টেরির কানের পিছনে প্রায় আধ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে সুঁই। পুরোটা বের করে নিয়ে তালুর ভেতর রাখল রানা। জানতে চাইল, 'ডাক্তারকে ডাকব?'

'খুব ভাল হয়।'

অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটল রানা। কাছাকাছি পৌঁচেছে, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর আলো জ্বলে উঠল। ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যারোসল ক্যানটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে ভরল ও। মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে রানার পিছু পিছু লীড কোচে ছুটে এল ডাক্তার। ঘুমালে কি হবে, খবরের গন্ধ পেয়ে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেছে—আদর্শ রিপোর্টারদের এই এক গুণ। টেরিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা।

'পিছু হটুন,' নির্দেশ দিল ডাক্তার। রিপোর্টাররা সসম্মানে পথ করে দিল, তবে খুব একটা পিছিয়ে গেল না কেউই। ব্যাগ খুলল ডাক্তার, এক টুকরো গজ দিয়ে টেরির কপাল মুছল। ব্যাগটা তার কাছ থেকে বেশ একটু দূরে। বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি, কোচের ভেতর আলো কম, সবাই তাকিয়ে আছে আহত লোকটার দিকে। ব্যাগের ভেতর থেকে অয়েলস্কিনে মোড়া একটা প্যাকেট বের করল রানা, কেউ দেখতে পেল না। সেটাকে নিঃশব্দে গড়িয়ে দিল ও। কোচের তলা দিয়ে ছুটল সেটা, উল্টোদিকের আইল্যান্ডে গিয়ে ধাক্কা খেলো। দেখতে না পেলেও, আওয়াজটা শুনল রানা। ইতোমধ্যে দর্শকদের মাঝখানে মিশে গেছে ও।

সিধে হলো ডাক্তার। 'অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাব, দু'জন সাহায্য করুন আমাকে।' সাহায্যের হাত পাওয়া গেল। টেরিকে তারা তুলতে যাবে, এই সময় ঝড় তুলে হাজির হলো কবীর চৌধুরী।

'আপনার এই লোক আছাড় খেয়েছে, মি. চৌধুরী। জ্ঞান নেই। কোথায় কি রকম লেগেছে দেখার জন্যে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আছাড় খেয়েছে, নাকি ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে?'

'আমি কি করে জানব? মি. চৌধুরী, আপনি যদি আমাকে দেরি করিয়ে দেন, এই লোকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।'

'পড়েই গেছে, স্যার,' বলল পিটার। 'সিঁড়ির মাথা থেকে পা পিছলে গিয়েছিল। হাতের কাছে কিছু থাকলে হয়তো সেটা ধরে নিজেকে সামলাতে পারত...'

'ঠিক জানো, পড়ে গেছে?'

'জী-স্যার।' আরও কিছু বলল পিটার, কিন্তু আচমকা ফড়াৎ করে বজ্রপাত হলো, চাপা পড়ে গেল তার কথা। কথাগুলো নতুন করে বলতে হলো তাকে, 'টেরির কাছ থেকে দু'ফিট দূরে ছিলাম, স্যার। আমি নিজে ওকে পড়ে যেতে দেখেছি। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা, সাহায্য করারও সময় পাইনি।'

'তখন প্রদ্যুৎ কোথায় ছিল?'

'টেরির কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন না। পাঁচ সারি পিছনে নিজের সীটে, ওই ওখানে ছিলেন তিনি। সবাই যে যার সীটে ছিলেন। না, স্যার, আমি আপনাকে বলছি, এর মধ্যে কোন ঘাপলা নেই। নেহাতই একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

চৌধুরীর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না ডাক্তার। দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে টেরিকে বয়ে নিয়ে চলল সে।

'হুঁ।' রিপোর্টারদের দিকে তাকাল চৌধুরী। রানাকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। তার ট্রাউজার আর শার্ট ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সাথে। ঠাণ্ডায় একবার শিউরে উঠল সে। 'বৃষ্টিটা জ্বালাতন করে মারল দেখছি।' রানার দিকে আরেকবার দৃষ্টি হেনে হন হন করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল।

ডাক্তারকে যারা সাহায্য করল তারা নেমে এল, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠল চৌধুরী। ডাক্তার এরই মধ্যে টেরির লেদার জ্যাকেট খুলে নিয়েছে। শার্টের আস্তিন প্রায় কাঁধ পর্যন্ত গুটানো। একটা ইঞ্জেকশন রেডি করছে ডাক্তার।

'ওটা কিসের জন্যে?'

বিরক্ত হয়ে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার। 'আপনি এখানে কি করছেন? এখানে শুধু একজন ডাক্তারই মাতব্বরি মারতে পারে। গেটআউট।'

গ্রাহ্য করল না চৌধুরী। যেটা থেকে হাইপোডারমিকে ওষুধ ভরেছে ডাক্তার, সেই টিউবটা তুলে নিল সে। 'অ্যান্টি টিটেনাস?'

টেরির বাহু থেকে সুঁই বের করে নিল ডাক্তার। সেখানে অ্যান্টি-সেপটিক গজ চেপে ধরল। 'অ্যান্টি-টিটেনাস। শরীরের কোথাও চামড়া ফাঁক হলে এই ইঞ্জেকশন নিতেই হবে, আজকাল অশিক্ষিতরাও কথাটা জানে।' টেরির বুকে স্টেথস্কোপ রাখল সে। তারপর পালস দেখল, টেমপারেচার নিল। 'হাসপাতালকে বলুন একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিতে।' টেরির ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

'না।'

ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষা শেষ করল ডাক্তার। 'কি বললাম? অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন!'

'না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। টেরির চিকিৎসা এখানেই হবে।'

কথা না বলে লাফ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল ডাক্তার। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটি ফোঁটা ব্রিজে পড়েই চুর চুর হয়ে লাফিয়ে উঠছে রাস্তা থেকে ছ'ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত। টেরিকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসতে যারা সাহায্য করেছিল তাদেরকে সাথে করে একটু পরই আবার ফিরে এল ডাক্তার। একজন বিল গাইডেন, অপরজন রিচ লোগান। 'এঁদের কথায় বিশ্বাস আছে আপনার, মি. চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। 'ওঁরা জাঁদরেল রিপোর্টার, সবাই সম্মান করে। বাজে কথা বলার লোক নন।'

'আমি জানতে চাই, এসবের মানে কি?' ঠিক রাগ নয়, অসন্তুষ্ট চৌধুরী।

উত্তর না দিয়ে রিপোর্টারদেরকে বলল ডাক্তার, 'টেরি মাথায় আঘাত পেয়েছে। ওর খুলি ফেটে গেছে কিনা আমি জানি না। এক্স-রে ছাড়া নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। ও নিঃশ্বাস ফেলছে দ্রুত, কিন্তু ছোট করে। পালস দুর্বল, টের পাওয়া যায় কি যায় না। গায়ে জ্বর আছে, ব্লাডপ্রেশার লো। এসব অনেক কিছুরই লক্ষণ হতে পারে। তার একটা, সেরিব্রাল হেমোরেজ। আমার এই রোগীর জন্যে মি. চৌধুরী হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে দিচ্ছে না, এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন আপনারা। আরও সাক্ষী থাকলেন, টেরি যদি মারা যায় তার জন্যে দায়ী হবেন চৌধুরী একা। সেই সাথে আপনারা জানলেন, টেরি যে মারা যাচ্ছে সেটা চৌধুরী ভাল করেই জানেন। জেনেশুনে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর চিকিৎসায় বাধা দেয়া, আইন এধরনের ঘটনাকে হত্যার চেষ্টা বলে ঘোষণা করেছে। তার বেলায় অভিযোগ করা হবে, ফার্স্ট ডিগ্রী মার্ডার। টেরি যদি মারা যায়।'

'মি. চৌধুরী প্রতিবাদ করছেন না,' বিল গাইডেন বলল, 'তারমানে আপনার কথা সত্যি। আমি সাক্ষী থাকলাম।'

'আমিও,' বলল রিচ লোগান।

'আমার সন্দেহ,' ভারী গলায় বলল চৌধুরী, 'ব্রিজের বাইরে টেরিকে পেলে ওরা তাকে আর ফিরে আসতে দেবে না।'

'আপনার আত্মবিশ্বাস কমে আসছে, মি. চৌধুরী,' বলল ডাক্তার। 'যতক্ষণ আপনার জিম্মায় একজন প্রেসিডেন্ট, একজন বাদশা আর একজন প্রিন্স আছেন, টেরির মত একজন সাধারণ ক্রিমিন্যালকে পাল্টা জিম্মি রেখে কার কি লাভ হবে?'

চৌধুরী মন স্থির করল। আইনকে ভয় করার লোক নয় সে, সম্ভবত টেরির কথা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্তটা নিল। 'আপনারা কেউ একজন যান, বেডলারকে আমার কথা বললে সে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে।' ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। 'হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে টেরি নিরাপদে উঠুক, ততক্ষণ আপনার ওপর চোখ রাখছি আমি।'

রিপোর্টাররা নেমে গেল। টেরিকে চাদর দিয়ে ঢাকতে শুরু করল ডাক্তার।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল চৌধুরী। 'কি করছেন?'

'মানে?'

'ওকে চাদর দিয়ে মুড়ছেন কেন?'

'মুড়ছি না, ঢাকছি,' অসহায় ভঙ্গি করে বলল ডাক্তার। 'আপনার এই সাগরেদ শক পেয়েছে। শক পাওয়া রোগীদেরকে গরম রাখতে হয়।'

ডাক্তারের কথা শেষ হতেই আকাশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। কাছেই কোথাও পড়েছে বাজটা। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। চৌধুরীর দিকে ফিরে ডাক্তার বলল, 'জানেন, মি. চৌধুরী? আওয়াজটা আমার কাছে মনে হলো কেয়ামতের লক্ষণ।' একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তাতে ডিসটিল্ড্ ওয়াটার মেশাল সে।

'আমারও একটু দরকার,' বলল চৌধুরী।

'জানি। হেল্প ইওরসেলফ।'

ভিজে কাপড়ে লীড কোচে বসে আছে রানা। দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সের আসা এবং টেরিকে নিয়ে চলে যাওয়াটা এখানে বসেই দেখেছে ও। ঠাণ্ডায় হিহি করছে, কিন্তু মনে মনে খুশি। টেরির ওপর কলম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল কর্ড, ক্যানিস্টার, টর্চ আর অ্যারোসল এই চারটে জিনিস নাগালের মধ্যে আনা। এসে গেছে। প্রথম তিনটে কোচের তলায়, আইল্যান্ডের পাশে পড়ে আছে। শেষটা রয়েছে ওর পকেটে। চৌধুরীর লোকদের মধ্যে টেরি ছিল সবচেয়ে কর্মঠ আর সন্দেহপ্রবণ, তার সরে যাওয়া একটা বোনাস।

জুলিকে কনুই দিয়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিল রানা। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর কোচের লোকজন জেগেই আছে, প্রয়োজন ছাড়া মুখ খুলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ও। 'খুব মন দিয়ে শুনবে,' ফিসফিস করে বলল জুলিকে। 'যদি মনে হয় বোকার মত কথা বলছি, তবু আমার কথাগুলো রিপিট করবে না। বলো তো, সৌখিন একটা মেয়ে কি তার সাথে ছোট একটা অ্যারোসল এয়ার ফ্রেশনার রাখতে পারে?'

সবুজ চোখের পাতা ফেলা ছাড়া জুলির মধ্যে আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। 'না হয় রাখলই; তাতে কি?'

ক্যানটা দু'জনের মাঝখানে রাখল রানা। 'তাহলে তোমার ক্যারি-অলে রেখে দাও এটা, প্লীজ। চন্দন, তবে গন্ধ নিতে চেষ্টা কোরো না।'

'জিনিসটা কি তা আমার ভালই জানা আছে!' ক্যান অদৃশ্য হয়ে গেল। 'এটা নিয়ে যদি ধরা পড়ি, কি হবে আমার? মুচড়ে আমার হাত ভাঙবে চৌধুরী?'

'তা ভাঙবে না। তোমার ক্যারি-অল আগেই সার্চ করা হয়েছে, যে সার্চ করেছে তার মনে থাকার কথা নয় কি দেখেছে না দেখেছে—এই রকম আরও দশ-বারোটা ক্যারি-অল সার্চ করতে হয়েছে তাকে। তাছাড়া, তোমার ওপর কড়া নজর রাখছে না কেউ। আমি ওদের পয়লা নম্বর সন্দেহ।'

রাত দশটার দিকে নিস্তব্ধতা আর ঘুম ফিরে এল কোচে। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে এখনও, তবে প্রচণ্ডতা অনেক কমেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একবার তাকাল রানা। লিংকন পার্কের দিকে লালচে বা কালচে কোন ব্যাপারই ঘটছে না। ওরা কি তার মেসেজ বুঝতে পারেনি, নাকি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে অনুরোধটা। উঁহুঁ, এড়াতে পারে না। বুঝতে না পারারও কোন কারণ নেই। আসলে এই তুমুল বৃষ্টিতে আগুন ধরাতে অসুবিধে হচ্ছে ওদের।

দশটা সাতে দক্ষিণ-পশ্চিমে লাল একটা আভা ফুটে উঠল। সম্ভবত রানার চোখেই সবার আগে ধরা পড়ল ব্যাপারটা, কিন্তু অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব নিজে নিতে চাইল না ও। মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে গাঢ় রঙের তেলতেলে শিখা পঞ্চাশ ফিট উঁচু হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা নটহ্যামের চোখে পড়ল। হাঁ হয়ে গেল সে। তার কাছে এটা একটা অভিনব দৃশ্য। ড্রাইভারের পিছনে খোলা দরজা, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে, 'আরে দেখুন, দেখুন! কি অদ্ভুত কাণ্ড ! এই বৃষ্টির মধ্যে আগুন!'

এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল সবার। জানালা দিয়ে তাকাল তারা, কিন্তু চাক্ষুষ করাটা ঠিক জুৎসই হলো না। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়ি খাচ্ছে জানালায়, ভেতর দিকেও ঘেমে গেছে কাঁচ। খোলা দরজা দিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে এল সবাই, বৃষ্টি তো কী হয়েছে। বাইরে থেকে দেখার মতই একটা দৃশ্য। এরই মধ্যে আকাশের দিকে একশো ফিট খাড়া হয়ে উঠেছে আগুনের শিখা, শিখার মাথার ওপর তেলতেলে কালো ধোঁয়ার ছাতা। আগুনের প্রাবল্য এবং আকৃতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। কাছ থেকে আরও ভাল ভাবে দেখার জন্যে আবার সবাই ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলিঙের দিকে ছুটল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরাও ঠিক তাই করছেন। সাড়ম্বরে ধ্বংস হচ্ছে এই রকম একটা কিছু মানুষকে যেভাবে আকর্ষণ করে অন্য আর কিছুই তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে না।

লীড কোচ থেকে প্রথম দফা যারা নেমেছিল তাদের মধ্যে রানাও ছিল। কিন্তু পরে তাদের সাথে যোগ দেয়নি ও। শান্ত ভাবে কোচের সামনে চলে এল। তারপর কয়েক পা পিছু হটল। থেমে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা তুলল ও। কারও কোন খেয়াল নেই ওর দিকে। সবাই ছুটছে, তাকিয়ে আছে উল্টোদিকে। প্যাকেট থেকে টর্চ বের করল ও। ওর ডানদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী আন্দাজ করে টর্চ তাক করল, এস. ও. এস. সিগন্যাল পাঠাল মাত্র একবার। পকেটে টর্চ নিয়ে ব্রিজের কিনারা ধরে এগোল ও। মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখল। খানিক দূর এসেছে, একটা রকেট ছুটতে দেখল ও। তেরছাভাবে দক্ষিণ-পুব আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে এসে ডাক্তারের পাশে থামল রানা। আর সবার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার। রানাকে বলল, 'আগুন লাগাতে ওস্তাদ!'

'এ তো মাত্র শুরু। পরেরটা দেখে, তারপর বলবেন। আতসবাজির কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। চলুন, রিয়্যার কোচের সামনেটা দেখি।'

দেখল ওরা। পুরো এক মিনিট কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। ডাক্তার বলল, 'হুম। চিন্তার কথা?'

'নাহ্। সময়ের একটু হেরফের তো হতেই পারে। সাবধান, চোখের পাতা ফেলবেন না।'

চোখের পাতা ফেলল না ডাক্তার, কাজেই দেখতে পেল সে। নীলচে-সাদা রঙের ছোট্ট কিন্তু তীব্র একটা ঝলকানি, সিকি সেকেন্ড পরই অদৃশ্য হলো আবার।

'আপনিও দেখলেন কি?'

'হ্যাঁ। যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়েও কাছে।'

'রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার খতম?'

'সন্দেহ নেই।'

'কোচের ভেতর ওরা কিছু টের পায়নি তো?'

'রিয়্যার কোচে কেউ থাকলে তো,' বলল রানা। 'সবাই ওরা ব্রিজে। কিন্তু প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পিছন দিকে কিছু নড়াচড়া টের পাচ্ছি। চৌধুরী বোধহয় জেরা করছে কাউকে।'

রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কবীর চৌধুরী। পাশে বেডলারকে নিয়ে টেলিফোনে কথা বলছে সে।

'চোপ! আমি যা বলছি তাই হবে! খোঁজ নাও, এখুনি।'

'আপনি শুধু শুধু আমাকে ধমক মারছেন,' অপরপ্রান্ত থেকে ক্লান্ত সুরে বললেন পুলিস চীফ। 'প্রাকৃতিক খেয়ালে আমি বাদ সাধি কিভাবে? আপনাকে বুঝতে হবে, গত দু'পাঁচ বছরের মধ্যে এ-শহরে এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বজ্র-বৃষ্টি। ছোটখাট বিশ পঁচিশটা আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ারমাস্টার আমাকে জানিয়েছেন, তাঁর দমকল কর্মীরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে আগুন নেভাতে...'

'আমি অপেক্ষা করছি, ডিকসন।'

'আমিও অপেক্ষা করছি। আর, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন লিংকন পার্কে আগুন লাগলে তাতে আপনার কি ক্ষতি। বাতাস বইছে পশ্চিম দিকে, ধোঁয়াটা আপনাদের কাছে পিঠেও যাবে না। আসলে, মি. চৌধুরী, ছায়া দেখলেই চমকে উঠছেন আপনি। এক সেকেন্ড। দেখি কি রিপোর্ট এল।' কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর আবার কথা বললেন পুলিস চীফ, 'পার্ক করা তিনটে রোড অয়েল ট্যাংকার। একটার হোস পাইপ মাটিতে ঠেকে ছিল, তারমানে আর্থিং করা ছিল। ট্যাংকারের গায়ে বাজ পড়তে দেখেছে লোকেরা। এক জোড়া ফায়ার ইঞ্জিন পৌঁছে গেছে, আগুন এখন আয়ত্তের মধ্যে। সন্তুষ্ট?'

জবাব না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল চৌধুরী।

দমকল বাহিনীর লোকেরাই আগুন ধরিয়েছে, আগুনটাকে বাড়তে দিয়ে তারপর আবার তারাই নেভাচ্ছে সেটাকে। দাউ দাউ আগুন ধরা তেলের ব্যারেলগুলোর ওপর এক্সটিংগুইশার দিয়ে ফোম ঢালছে তারা। আগুন ধরাবার পনেরো মিনিট পর সম্ভব হলো সেটাকে নেভানো।

ব্রিজে ওরা যারা দেখছিল, হতাশ চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। খেলা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে জানলে এই বৃষ্টির মধ্যে কোচ থেকে হয়তো নামতই না কেউ। কিন্তু ওরা জানে না, আজ রাতের বিচিত্র অনুষ্ঠান মাত্র শুরু হয়েছে।

উত্তর দিকে আরও একটা আগুন লাগল। এমন কি আগেরটার চেয়েও দ্রুত বাড়তে লাগল সেটা। এক সময় এমন উজ্জ্বল আর গাঢ় হয়ে উঠল যে তুলনায় ডাউন-টাউন সানফ্রান্সিসকোর কংক্রিট টাওয়ারের আলোগুলোকেও ম্লান দেখাল। নিজের কোচে ফিরে এসেছিল কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে ছুটল আবার। পিছন দিকের কমিউনিকেশন সেকশনে একটা বেল বাজছে। ছোঁ দিয়ে

রিসিভার তুলল চৌধুরী। ফোন করেছেন পুলিস চীফ।

'অন্তত এই একবার আপনার চেয়ে আমি আগে। না, এই আগুনের জন্যেও আমরা দায়ী নই, মি. চৌধুরী। এমন একটা জায়গায় কেন আমরা আগুন ধরাব, যার ধোঁয়া আপনাদের দিক থেকে আরও দূরে পুব দিকে সরে যাবে?'

'কম কথায় সারো, ডিকসন,' কঠিন সুরে বলল চৌধুরী।

'আবহাওয়া অফিসার বলছে, প্রতি তিন কি চার সেকেন্ড অন্তর একটা করে বাজ পড়ছে। গড়পড়তা হিসেবে প্রতি বিশটার মধ্যে একটা বাজ আগুন ধরিয়ে থাকে। এগুলো মেঘ থেকে মেঘে নয়, মেঘ থেকে মাটিতে পড়ছে। নতুন কিছু ঘটলে জানাব।'

এই প্রথম চৌধুরীর আগে রিসিভার রেখে দিলেন পুলিস চীফ। নিজের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামাল চৌধুরী। এই প্রথম তার ভুরু আর ঠোঁটের দুই কোণে উদ্বেগের রেখা ফুটল।

নীল আভা নিয়ে ছয় থেকে সাতশো ফিট উঁচু হলো আগুনের শিখা, শহরের সবচেয়ে উঁচু ভবনের প্রায় সমান। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশ, যেমন ঘন তেমনি রুক্ষ মেজাজী, তেলে আগুন ধরিয়ে কয়েকশো নষ্ট টায়ার তাতে ফেলে দিলে এই রকমই হবার কথা। তবে এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে সে ভয় নেই। কাছেই রয়েছে দানব আকৃতির ছয়টা ফায়ার ইঞ্জিন আর ছয়টা মোবাইল ফোম ওয়াগন।

বাতাস উল্টো দিকে বইছে দেখে ব্রিজের দর্শকরাও বুঝল, আগুন শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পুব দিকে ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেয়র মাইক সিলভার, হাত দুটো শক্ত মুঠো, ছলছল করছে চোখ। একঘেয়ে সুরে অভিশাপ বর্ষণ করছেন তিনি।

রানাকে ডাক্তার অ্যাম্বু বলল, 'সম্ভবত বাদশা আর প্রিন্সের তেলই পুড়ছে। সেটা জেনে ওরা কি খুশি হবেন?' রানা কোন মন্তব্য করল না। 'এবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেননি তো, মি. মিত্র?'

'দিয়াশলাই আমার হাতে ছিল না,' বলল রানা। মুচকি হাসল ও। 'চিন্তা করবেন না, ওরা ওদের কাজ বোঝে। এখন আতসবাজি পোড়ানোটা কি রকম হবে সেটাই দেখার বিষয়।'

প্রেসিডেনশিয়াল কমিউনিকেশন সেন্টারে আবার ফোন বাজল। সাথে সাথে রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী।

'ডিকসন। ফোর্ট ম্যাসনের একটা অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক।' ফোর্ট ম্যাসনে কোন অয়েল স্টোরেজ ট্যাংকের অস্তিত্ব নেই। তথ্যটা চৌধুরীর জানা না থাকারই কথা। এইমাত্র ফায়ার কমিশনারের সাথে রেডিওতে কথা হলো। আগুনটা সম্পর্কে তিনি বললেন, 'যত গর্জে তত বর্ষে না। বিপদের তেমন কোন ভয় নেই।'

'কিন্তু ওগুলো কি, তাহলে?' হুঙ্কার ছেড়ে জানতে চাইল চৌধুরী।

'কোনগুলো কি, মি. চৌধুরী?'

'আতসবাজি! কয়েক ডজন। কানা, নাকি ভান করছ?'

'যেখানে বসে আছি, কই, কিছুই তো চোখে পড়ছে না! ওয়েট।' কমিউনিকেশন ওয়াগনের পিছনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ। চৌধুরী কিছু বাড়িয়ে বলেনি। একদিকের আকাশ আতসবাজিতে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। মুগ্ধ হবার মত একটা দৃশ্য। যেমন তাদের রঙের বাহার তেমনি তাদের ডিজাইন। দূর আকাশে উঠে গিয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে ওগুলো, রাতের কালো আকাশের গায়ে নক্ষত্র দিয়ে গাঁথা মালা হয়ে ভাসছে বাতাসে। উত্তর পুব দিকে ছোঁড়া হচ্ছে ওগুলো, ওই দিকটাই পানির সবচেয়ে কাছাকাছি—তারমানে, প্রতিটি আতসবাজি সান ফ্রান্সিসকো বে-তে পড়ে নিভে যাবে। আপনমনে হাসলেন পুলিস চীফ। চৌধুরী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তা না হলে ব্যাপারটা লক্ষ করত সে। ফোনের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

'হ্যাঁ, দেখলাম। মনে হলো চায়নাটাউনের দিক থেকে আসছে। নিশ্চয়ই ওরা নিউ ইয়ার উদ্‌যাপন করছে না। চেক করে দেখি, দাঁড়ান।'

ডাক্তার অ্যাম্বুকে রানা বলল, 'আপনার এই সাদা কোট গা থেকে নামান। অন্ধকারে নড়াচড়া করলে লোকের চোখে পড়ে।' ডাক্তারকে সাদা কলমটা ধরিয়ে দিল ও। 'কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন তো?'

'ক্লিপ টিপে ধরে মাথার বোতামে চাপ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ। কেউ যদি একেবারে সামনে চলে আসে, তাক করবেন মুখে। সুঁইটা বের করে নিতে হবে।'

'শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে দিয়ে আপনি...'

'প্রেসিডেন্ট যে আপনার নিজের এলাকার লোক, কথাটা ভুলে গেলেন?'

রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'চায়নাটাউনই। ওখানের একটা আতসবাজির কারখানায় বাজ পড়েছে। ঝড়টা যাই যাই করেও যাচ্ছে না। আরও ক'জায়গায় যে আগুন লাগবে, যীশুই বলতে পারে।'

কোচ থেকে নেমে এসে পুব ব্যারিয়ারের কাছে পেরটের পিছনে চলে এল চৌধুরী। পেরট ঘুরে দাঁড়াল।

'এরকম সাধারণত দেখা যায় না, চীফ।'

'ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি না, পেরট,' গম্ভীর গলায় বলল চৌধুরী।

'চীফ?' পেরটের প্রশ্নের মধ্যে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের বিরুদ্ধে এসব ওদের চাল। চক্রান্ত।'

'কিন্তু চীফ, এগুলো আমাদের ক্ষতি করবে কিভাবে? যতটুকু বুঝতে পারছি, কিছুই তো বদলায়নি। ওই আগুন বা আতসবাজি আমাদেরকে যদি পোড়াতে আসে, প্রেসিডেন্ট আর জিম্মিরাও কি অক্ষত থাকবেন?'

'তবু...'

কথা শেষ করতে পারল না চৌধুরী, কারণ ঠিক তখনই গোটা ব্রিজ আর উত্তর সান ফ্রান্সিসকো ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে।

অটুট নিস্তব্ধতা। ব্রিজে যেন একটা মানুষ নেই। অন্ধকার যে গাঢ় হলো তা নয়। কোচগুলো থেকে মৃদু আলো বেরিয়ে আসছে। আতসবাজির কমলা-লাল রঙের আভাও পড়েছে ব্রিজে। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। ফিসফিস করে পেরট বলল, 'এখন আমারও মন খুঁত খুঁত করছে, চীফ।'

'জেনারেটার চালু করো। দক্ষিণ আর উত্তর টাওয়ারের সার্চ লাইট জ্বালব আমরা। সেলফ-প্রপেলড কামানগুলো রেডি করো, লোড করো, ক্রুদের তৈরি থাকতে বলো। প্রতিটা কামানের সাথে তিনজন করে লোক রাখো, প্রত্যেকের কাছে সাব-মেশিনগান থাকবে। ওদেরকে সতর্ক করার জন্যে আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, তুমি যাও উত্তরে। তারপর দু'দিকেরই চার্জে থাকবে তুমি। বেজন্মা ডিকসন কি বলতে চায় শুনব আমি।'

'আপনি নিশ্চয়ই ব্রিজের বাইরে থেকে সশস্ত্র আক্রমণ আশঙ্কা করছেন না?'

'কি আশঙ্কা করব, আমি জানি না। সবদিক থেকেই আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, পেরট। জলদি!'

দক্ষিণ দিকে ছুটল চৌধুরী। রিয়্যার কোচের পাশ দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে ডাকল, 'বেডলার! জেনারেটার! জলদি!'

চৌধুরী আর পেরট যে যার গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই চালু হলো জেনারেটার। সার্চ লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল দক্ষিণ আর উত্তর টাওয়ার। ব্রিজের মাঝখানে এর ফল হলো উল্টো, অন্ধকার দানা বাঁধল সেখানে। কামান রেডি করা হলো, মেশিনগানাররা প্রস্তুত। নিজের জায়গায় থেকে গেল পেরট, কিন্তু ছুটে মাঝখানের কোচে ফিরে এল চৌধুরী।

এত ছুটোছুটি আর সাবধানতা, সবই আসলে বৃথা। ওদের উচিত ছিল রানাকে খুঁজে বের করা।

ছয়

সামনের হেলিকপ্টারে রয়েছে রানা। হাতে শাটার লাগানো ফ্ল্যাশলাইট, আলোটা সুতোর চেয়ে একটু যদি মোটা হয়। ট্রিগারিং ডিভাইস খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। পাইলটের সীট আর তার পেছনের সীটের মাঝখানে রয়েছে ওটা।

ছোট্ট ছুরির ডগা দিয়ে এরই মধ্যে টপ-প্লেটের চারটে স্ক্রু খুলে ফেলেছে রানা। ডিভাইসটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার বা কানেকশন বিচ্ছিন্ন করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তাহলে কবীর চৌধুরী মেরামত করে নেবে। টার্মিনাল থেকে ক্রোকোডাইল ক্লিপ খুলে নিল ও, তুলে নিল নিফ সেলগুলো, দুটোর মাঝখানের কানেকশন ছিঁড়ে দুটো আলাদা পকেটে ভরল ওগুলো। চৌধুরীর কাছে স্পেয়ার সেল না থাকারই কথা। অন্তত থাকার কোন কারণ নেই। জায়গামত বসিয়ে টপ কাভারে স্ক্রু আঁটতে শুরু করল ও।

পুলিস চীফ রাগ চেপে রাখতে পারলেন না, যেন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। 'আমাকে আপনি কি মনে করেন, মি. চৌধুরী? জাদুকর হুডিনি? এখানে বসে আঙুল নাড়ব আর শহরের অর্ধেক, গোটা উত্তর দিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে? আমি আবার বলছি, সম্ভবত দুটো মেইন ট্র্যান্সফর্মার নষ্ট হয়ে গেছে। কেন নষ্ট হয়েছে জানার জন্যে প্রতিভার দরকার নেই। আর, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করতেই হয়, আকাশে আমাদের পুরানো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন।'

কবীর চৌধুরী গুম মেরে আছে।

'কি ভয় করছেন আপনি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলেন পুলিস চীফ। 'আপনার বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট পাঠাব? আমরা জানি, আপনার কাছে হেভি কামান আর সার্চলাইট আছে। জিম্মিদের কথাও আমরা ভুলিনি। আসলে, মি. চৌধুরী, নিজের ওপর আপনি আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। আবার যোগাযোগ করব।'

যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে দেখে রিসিভার নামিয়ে রাখল চৌধুরী। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে আছে। হাত দুটো মুঠো পাকানো। অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'বার বলা হলো, তার নাকি আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটছে।

সীট ছেড়ে উঠল না সে।

হেলিকপ্টারের দরজা আস্তে করে বন্ধ করল রানা, ঝুপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামল। খানিকটা দূরে ডাক্তার অ্যাম্বুর কাঠামো দেখল ও, পিছনে আগুনের টাওয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারটা এখনও আকাশ ছুঁয়ে আছে, কিন্তু ছোট আর নিস্তেজ হয়ে আসছে দ্রুত।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল ডাক্তার। রানা বলল, 'চলুন, পশ্চিম দিকে যাই। শূটিং প্র্যাকটিসের সুযোগ পেলেন?'

'ওদিকে কেউ তাকায়নি পর্যন্ত, কাছে আসা তো দূরের কথা। তাকালেও, অন্ধকারে কিছু দেখতে পেত না।' আতসবাজি আর আগুনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ব্রিজের মাঝখানে চোখ ফেরালে গভীর অন্ধকারই দেখতে পাবার কথা। সাদা কলমটা রানাকে ফিরিয়ে দিল ডাক্তার। 'আপনার জিনিস আপনার কাছেই থাক।'

'আপনিও তাহলে আপনার ফ্ল্যাশলাইট ফিরিয়ে নিন,' বলে সেটা ডাক্তারের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এবার আপনার অ্যাম্বুলেন্সে ফেরা উচিত। জেনারেলকে কি দিতে হবে মনে আছে? আপনাকেই পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর সাথে আমাকে কেউ দেখুক, চাই না। বলবেন, আমার অনুমতি পাবার আগে যেন ব্যবহার না করেন। এই জিনিস আগে কখনও দেখেছেন?' পকেট থেকে একটা সেল বের করে ডাক্তারের হাতে দিল ও। অন্ধকার, জিনিসটা কি দেখার জন্যে চোখের কাছে তুলতে হলো ডাক্তারকে।

'এক ধরনের ব্যাটারি?'

'হ্যাঁ। ট্রিগারিং ডিভাইসে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে থাকে। দুটো ছিল,

দুটোই নিয়ে এসেছি।'

'এবং আসা-যাওয়ার কোন চিহ্ন রেখে আসেননি?'

'না।'

'তাহলে তো আগে যেতে হয় ব্রিজের কিনারায়।'

গোল্ডেন গেটে সেল দুটো ফেলে অ্যাম্বুলেন্সে চলে এল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রানা ফিসফিস করে বলল, 'হঠাৎ আলো জ্বলতে দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে, তারচেয়ে টর্চ জ্বালুন।'

'হ্যাঁ। আলো দেখে ভাবতে পারে আতসবাজি না দেখে এখানে আমরা কি করছি।' ফ্ল্যাশলাইটটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডাক্তার। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটের সীল ভাঙতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না তার। কয়েকটা ইকুইপমেন্ট তুলে সরিয়ে রাখল, তারপর ভেতরের ছোটখাট কলকজা নাড়াচাড়া করে তলার দিকে লুকিয়ে থাকা একটা কম্পার্টমেন্ট খুলল। ভেতর থেকে তুলে আনল সায়ানাইড গান।

আবার ইকুইপমেন্ট ভরে ইউনিট সীল করল ডাক্তার। সায়ানাইড গান পকেটে ভরে নিচু গলায় ঘোষণা করল, 'এখন আমি এই ব্রিজের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।'

ফোনে পুলিস চীফ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছিল। ট্র্যান্সফর্মার নষ্ট হয়নি। শহরের ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টের ওপর আজ রাতে কি রকম চাপ পড়েছে আন্দাজ করুন। জেনারেটারের ওভারলোড কয়েল জ্বলে গেছে।'

'কতক্ষণ?' কবীর চৌধুরী জানতে চাইল।

'কয়েক মিনিট।'

অভ্যেস মত পুব ব্যারিয়ারের কাছে একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল পীল। পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে দেখতে পেলেন তিনি। চাপা গলায় ডাক্তার বলল, 'কথা আছে, জেনারেল।'

সান ফ্রান্সিসকো আর গোল্ডেন গেট ব্রিজের আলো পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে নেমে এসে পেরটের সাথে দেখা করল চৌধুরী। চেহারা শান্ত, উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। 'বিপদ কেটে গেছে তা মনে কোরো না। আরও কিছুক্ষণ সবাইকে সতর্ক অবস্থায় রাখো।'

'মন খুঁত খুঁত...?'

'ওটা আমার চিরকেলে স্বভাব।'

শেষ আতসবাজিটাও নিভে গেল। ফোর্ট ম্যাসনের আগুনটাও এখন আর নেই, ওদিকে শুধু লাল একটা আভা দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত অনেক কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি ধরে এলেও থামার কোন লক্ষণ নেই। আজ রাতে যদি সান ফ্রান্সিসকোয় আগুন লাগতও, এই বৃষ্টিই নিভিয়ে ফেলত সেটাকে। উপভোগ্য

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে, এতক্ষণে যেন এই প্রথম সবাই উপলব্ধি করল, ঠাণ্ডায় হি হি করছে তারা। কোচে ফেরার জন্যে হুটোপুটি পড়ে গেল।

জুলি ফিরে এসে দেখল জানালার ধারের সীটে বসে আছে রানা। একটু ইতস্তত করে পাশের খালি চেয়ারটাতেই বসে পড়ল সে। 'আমার সীটটা তোমার দরকার হলো কেন?'

'প্যাসেজে যাবার সময় তোমার ঘুম ভাঙাতে চাই, তাই।'

'জানতে পারি, বীরপুরুষ কোথায় যেতে ইচ্ছে করেন?'

'সত্যিই কি জানতে চাও? আমার মনে হয়, জানতে না চাইলেই ভাল করবে। মুচড়ে কেউ হাত ভেঙে দিচ্ছে, কল্পনা করতে কেমন লাগে?'

'কিন্তু পুলিস চীফ বলেছেন, চৌধুরী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে না।'

'পুলিস চীফ শান্ত চৌধুরীর কথা বলেছেন। অশান্ত চৌধুরী করতে পারে না এমন কাজ নেই।'

শিউরে উঠল জুলি। এজন্যে পাতলা, ভিজে কাপড়টাই শুধু দায়ী নয়। 'থাক, বাবা! ওসব জেনে দরকার নেই আমার। তুমি কখন…?'

'মাঝরাতের ঠিক আগে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল জুলি। 'ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না।'

'চমৎকার। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ধাক্কা দিয়ো।' চোখ বুজল রানা, জুলির মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এমন কি জুলিও জেগে নেই, রানার কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি হালকা নাক ডাকছে। খানিক পর পর এসে দেখে যাবার জন্যে টেরি নেই, কাজেই সুযোগটা পিটার নটহ্যামও নিচ্ছে—একটানা না ঘুমালেও, ঘুমাচ্ছে। বুকে চিবুক ঠেকিয়ে ঢুলছে সে, মাঝে মধ্যে ঝাঁকি দিয়ে সিধে করছে মাথা। চোখ বুজে জেগে আছে শুধু রানা, মাঝরাতে টহলে বেরনো বিড়ালের মত সতর্ক। জুলির গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে কানে কানে বলল, 'যাবার সময় হয়েছে।'

রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সিধে হলো জুলি। চোখ পিট পিট করে তাকাল রানার দিকে। কোচের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, ব্রিজ আর ড্রাইভিং সীটের মাথা থেকে অল্প যা একটু আলো আসছে।

'অ্যারোসলটা দাও।'

'কি দেব?' হঠাৎ সম্পূর্ণ জেগে উঠল জুলি। আবছা অন্ধকারে তার চোখের সাদা অংশটুকু এখন পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। 'ও, হ্যাঁ।' সীটের তলায় হাত দিয়ে অ্যারোসল ক্যানটা বের করে আনল সে। কোটের বাঁ দিকের ভেতর পকেটে সেটা আটকে রাখল রানা। জুলি জানতে চাইল, 'ফিরবে কখন?'

'ভাগ্য ভাল হলে, বিশ মিনিটের মধ্যে। বড়জোর আধঘণ্টা। তবে ফিরব।'

কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ রানার নাকের পাশে চুমু খেলো জুলি। 'প্লীজ, টেক কেয়ার।'

প্রয়োজনীয় একটা উপদেশ, কাজেই রানা কোন মন্তব্য করল না। 'প্যাসেজে

বেরিয়ে যাও। আওয়াজ না করে।'

জুলিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল রানা, হাতে সাদা কলম। নটহ্যামের বুকে থুতনি ঠেকে রয়েছে। এক ফুট দূর থেকে বোতামে চাপ দিল রানা, নটহ্যামের বাঁ কানের পিছনে বিঁধল সুঁইটা। তাকে ধরে সীটের পিঠে হেলান দেয়াল রানা। চেহারায় কোন বিশেষ ভাব না নিয়ে ঘটনাটা ঘটতে দেখল জুলি। নিচের শুকনো ঠোঁটটা একবার শুধু ভিজিয়ে নিল।

একজন টহল গার্ড আছে, জানে রানা। বারকয়েক তাকে দেখেছেও। ড্রাইভারের খোলা দরজা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল ও। আসলেও একজন গার্ডকে দেখা গেল, দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। যেভাবে আসছে, কোচের গা ঘেঁষে যাবে না, পাশ কাটাবে বেশ একটু দূর থেকে। লোকটার কাঁধ থেকে একটা মেশিন-কারবাইন ঝুলছে। রানার মনে হলো, লোকটা বোধহয় ওয়াল্টার, হেলিকপ্টারের একজন পাইলট। তারপর ভাবল, ভুলও হতে পারে।

নটহ্যামের মৃদু রিডিং লাইট নিভিয়ে দিয়ে ওখানেই থাকল রানা। হাতে ছিল অ্যারোসল ক্যান, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে বের করল কলমটা। নক আউট সুঁইয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর একজন লোকের মনে হবে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ সকালের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, নক-আউট গ্যাসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর অসুস্থ লাগে এবং বমি পায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সে ঘুমায়নি, তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। এই ব্যাপারটা চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করুক ওয়াল্টার, ও তা চায় না।

বোতামে চাপ দিল রানা, সেই সাথে লাফ দিল যাতে ওয়াল্টার পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলতে পারে। ওয়াল্টার ব্যথা পেলে বা আহত হলে ওর কিছু এসে যায় না, কিন্তু রোডের ওপর মেশিনগান পড়ে শব্দ হলে বিপদ ঘটতে পারে। ওয়াল্টারের ঘাড় থেকে সুঁইটা উদ্ধার করল, টেনে-হিঁচড়ে কোচে তুলল তাকে। ড্রাইভিং সীটের সামনের একটুখানি জায়গার ভেতর ঠেলে বসিয়ে দিল অচেতন শরীরটা। আরোহীদের কারও ঘুম ভাঙলেও দেখতে পাবে না ওয়াল্টারকে।

সব দেখল জুলি। কিছু নেই চেহারায়। শুধু আরেকবার ঠোঁট ভেজাল সে।

এবার সামনের দরজা দিয়ে ব্রিজে উদয় হলো রানা। এদিকে আলো বেশি, যেন অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এল ও। জানে, উত্তর আর দক্ষিণ তীর থেকে নাইট-গ্লাসের সাহায্যে ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করা হচ্ছে। অপর দুটো কোচে কেউ পাহারায় আছে কিনা কে জানে, হয়তো কেউ জেগেই নেই। থাকলেও কিছু এসে যায় না, দুটো কোচের একটা থেকেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

রানা জানে না, রিয়্যার কোচে জেগে রয়েছে পেরট আর বেডলার। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা।

ক্র্যাশ ব্যারিয়ার পেরিয়ে রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে নিচে তাকাল ও। শুধু অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু। সাবমেরিন ওখানে থাকতেও পারে, নাও পারে। পিছিয়ে এসে কোচের তলা থেকে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা বের করল

ও। ভেতরে একটা ফিশিং লাইন আর ভারী ল্যাবরেটরি স্যাম্পল ক্যানিস্টার রয়েছে। ফিশিং লাইন থেকে হুক আর টোপ কেটে ফেলে দিল, তার বদলে লাইনের মাথায় বাঁধল ক্যানিস্টার। রেলিঙের ওপর দিয়ে অপর দিকে ঝুলিয়ে দিল সেটা, চৌকো কাঠের কাঠামো থেকে খুলে ছাড়তে শুরু করল লাইন। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড পর থামল ও, লাইনটা আলতো ভাবে ধরে আছে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে। টান অনুভব করবে, অপেক্ষা করছে এই আশায়।

লাইন নড়ছে না। আরও দশ ফিট নিচে নামাল রানা। তবু কোন টান নেই। তাহলে কি সরে গেছে সাবমেরিন? স্রোত আর ঢেউ খুব বেশি, তাই হয়তো ঠিক পজিশনে সেটাকে রাখতে পারেনি ক্যাপ্টেন।

কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নির্বাচিত লোক হবে ক্যাপ্টেন, অসম্ভব হলেও ঠিক জায়গায় সাবমেরিন রেখে দায়িত্বের পরিচয় দেয়ার কথা তার। আরও দশ ফিট নিচে লাইন নামাল রানা। দুই আঙুলের মাঝখানে কেঁপে উঠল লাইন। পরম স্বস্তি বোধ করল ও।

বিশ সেকেন্ড পর আবার টান পড়ল লাইনে, পরপর দু'বার। দ্রুত সেটাকে তুলতে শুরু করল ও। যখন বুঝল সবটা উঠে আসতে আর মাত্র কয়েক ফিট বাকি, নিচের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। ব্রিজের গায়ে রেডিওটা বাড়ি খাক, চায় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হাতে চলে এল একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ। টোপ ফেলে কি শিকার মিলল দেখার জন্যে কোচের পাশে, আলোয় চলে এল ও। ব্যাগের গলা থেকে প্যাঁচানো লাইন খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল খুদে একটা চকচকে ট্র্যানজিসটরাইজড ট্র্যানসিভার।

'মাঝরাতে মাছ ধরার নেশা, মি. প্রদ্যুৎ?' রানার পিছন থেকে বলল পেরুট।

এক সেকেন্ড, তার বেশি না, নড়ল না রানা। ব্যাগটা ধরে আছে বুক সমান উঁচুতে, একটা হাত বাঁ দিকের কোট পকেটে ঢুকে গেল চুপিসারে।

'কি মাছ পেলেন সেটা একটু দেখতে চাই,' আবার বলল পেরুট। 'ঘুরুন, কিন্তু সাবধানে, মি. প্রদ্যুৎ। আপনি যদি আচমকা কিছু করতে শুরু করেন, ট্রিগারে চেপে বসা আমার আঙুলটাও···বুঝতেই পারছেন।'

ঘুরল রানা। অত্যন্ত সাবধানে। অ্যারোসল ক্যান এরই মধ্যে ব্যাগে ভরে নিয়েছে ও। বলল, 'শেষ পর্যন্ত তাহলে ধরাই পড়ে গেলাম!'

'চীফ ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন।' পেরুটের কুমড়ো আকৃতির চেহারায় কোন ভাব নেই, চোখ দুটো মায়াভরা, দাঁড়িয়ে আছে রানার কাছ থেকে পাঁচ কি ছয় ফিট দূরে। মেশিন-পিস্তলটা আলগাভাবে দু'হাতে ধরে আছে, কিন্তু তর্জনী দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে ট্রিগার। এই দূরত্বের অর্ধেকটা পেরোবার আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে রানা। পরিষ্কার বোঝা গেল, রানার কাছ থেকে কোন রকম প্রতিরোধ আশা করছে না পেরুট।

'কি আছে ওই ব্যাগে?' জানতে চাইল পেরুট।

অত্যন্ত সাবধানে ব্যাগের ভেতর হাত ভরে ধীরে ধীরে অ্যারোসল ক্যানটা বের করে আনল রানা। জিনিসটা এতই ছোট, হাতের ভেতর প্রায় লুকিয়ে থাকল। ও জানে, এর রেঞ্জ দশ ফিট। অন্তত ডাক্তার তাই বলেছে। এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে

কতটা বিশ্বাসযোগ্য অ্যাম্বু।

ডান বগলের নিচে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ব্যারেলটা সরাসরি রানার দিকে তাক করল পেরট। 'দেখতে দিন আমাকে।'

শান্তভাবে হাতটা লম্বা করে দিল রানা। পেরটের মুখ তিন ফিটের বেশি দূরে নয়, এই সময় বোতামে চাপ দিল ও। হাতের ক্যান ছেড়ে দিয়েই ছোঁ দিয়ে পেরটের মেশিন-পিস্তল কেড়ে নিল ও। পায়ের কাছে সদ্য পড়া শরীরটার দিকে তাকাল। নড়ার কথাও নয়, নড়ছেও না। অ্যারোসল ক্যান তুলল ও, ট্র্যানসিভার বের করে সুইচ অন করল। 'রানা।'

'হ্যামিলটন।'

আওয়াজ আরও কমাল রানা। 'এটা কি একটা ক্লোজড ভি-এইচ-এফ লাইন? কারও শুনতে পাবার কোন উপায়ই নেই?'

'নেই।'

'রেডিওর জন্যে ধন্যবাদ। এখানে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। একজনকে সরাতে চাই। রস পেরট আমাকে ধরেছিল, কিন্তু ওকে আমি ধরেছি। গ্যাস কেস। ওকে গোল্ডেন গেটে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন চাইছে না। এমন কিছু করেনি সে যাতে ওর ওপর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারি। বলা যায় না, ওকে হয়তো রাজসাক্ষী করা যেতে পারে। ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলতে পারি?'

নতুন একটা কণ্ঠস্বর শুনল রানা। 'ক্যাপ্টেন বলছি। কমান্ডার মরিসন।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, ক্যাপ্টেন। এবং রেডিওর জন্যে ধন্যবাদ। অ্যাডমিরালকে কি বলেছি, আপনি শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার জ্ঞান নেই,' বলল রানা। 'প্যাসেঞ্জার হিসেবে ওকে নিতে পারেন?'

'আমার ওপরে নির্দেশ আছে, আপনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে।'

'সহজে টেনে তোলা যায় এই রকম লাইন বা রশি আছে? পাঁচশো ফিট দরকার আমার।'

'দাঁড়ান, চেক করে দেখি।' খানিক পর আবার ক্যাপ্টেনের গলা পেল রানা। 'আমাদের কাছে তিনটে ত্রিশ ফ্যাদমের কয়েল আছে। জোড়া লাগাতে হবে আর কি।'

'গুড।' লাইনের এক মাথায় পেরটের মেশিন-পিস্তলটা বাঁধল রানা। 'লাইন নেমে যাচ্ছে। মেশিন-পিস্তলটা খুলে নেবেন। আপনার রশি পেলে ওটা আমি রেলিঙে একবার মাত্র পেঁচিয়ে নেব, তারপর রেলিঙের নিচে দিয়ে ফেলে দেব ডগাটা, তাতে পেরট ঝুলবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

লাইন টেনে রশি তুলল রানা। রশিটা রেলিঙে পেঁচিয়ে পেরটের কাছে চলে এল পেরটের কোমর আর বগলের তলায় ফাঁস পরাল ও, অজ্ঞান শরীরটা তুলে নিয়ে এল ব্রিজের কিনারায়। রেডিওতে জানতে চাইল, 'রেডি?'

'রেডি।'

কিনারা থেকে ব্রিজের নিচে পেরটকে নামিয়ে দিল রানা। প্রথম কয়েক সেকেন্ড ওখানেই ঝুলতে থাকল সে, তারপর নিচের দিকে নামতে শুরু করে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। রেলিঙের ওপর রশিতে এক সময় ঢিল পড়ল, রেডিওতে শোনা গেল মরিসনের গলা, 'হাতে এসে গেছে।'

'অক্ষত?'

'অক্ষত। আর কিছু, মি. রানা?'

'না। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, কমান্ডার।' এক সেকেন্ডের জন্যে পেরটের কথা ভাবল রানা। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে সাবমেরিনে আবিষ্কার করে কি ভাববে সে?

'রানা?' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ফিরে এসেছেন।

'বলুন।'

কি বলবেন, ভেবে পেলেন না অ্যাডমিরাল। ইচ্ছে করছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু জানেন, এসব রানা মোটেও পছন্দ করে না। 'এই ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়', 'আমেরিকা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ', ইত্যাদি অনেক কথা ভিড় করে এল মনে, কিন্তু কোনটাই যথেষ্ট বলে মনে হলো না।

'অ্যাডমিরাল?'

রানা অস্থির হয়ে উঠছে, বুঝতে পারলেন তিনি। মুচকি একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। বলার মত একটা কথা খুঁজে পেয়েছেন, যা শুনলে সত্যি গর্ব অনুভব করবে রানা। বললেন, 'জেনারেল রাহাত খানের সাথে কথা হয়েছে আমার, এই একটু আগে। তোমার কথা শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন, রানা।'

অ্যাডমিরাল ভুল করেননি, কথাটা শুনে সত্যি গর্বে ফুলে উঠল রানার বুক। একটু বিনয় করেই বলল ও, 'আপনি নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়ে বলেছেন।'

'শত বাড়িয়ে বললেও তোমার সবটা কৃতিত্ব আমার পক্ষে ভাষায় রূপ দেয়া সম্ভব নয়, রানা।'

'আসলে ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে,' বলল রানা। 'এক্সপ্লোসিভের ট্রিগারিং মেকানিজম অকেজো করে দিয়েছি, অ্যাডমিরাল।'

'গুড। ভেরি গুড।' আনন্দ আর উচ্ছ্বাস এবার আর ধরে রাখতে পারলেন না অ্যাডমিরাল। 'তুমি জাদু জানো, রানা। মেয়র সাহেব সাংঘাতিক খুশি হবেন।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে আবার একবার ব্রিজের আলো নিভিয়ে দিন,' বলল রানা। 'দক্ষিণ টাওয়ারের পুব দিকে লোক পাঠান। তারা সব রেডি হয়ে আছে তো?'

'আছে।'

'কেমন লোক তারা?'

'বাছাই করা।'

'ওদেরকে বলে দেবেন, এক্সপ্লোসিভ থেকে ডিটোনেটব খুলে নিতে হবে। সাবধানের মার নেই।'

'ঠিক আছে।'

'আরও একটা কথা। আলো নেভাবার আগে লেজার ব্যবহার করুন, ওদের দক্ষিণ মুখো সার্চলাইটটা আমি চাই না।'

'থাকবে না।'

'আর, কোন সময়েই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন না। রেডিওটা আমার কাছেই থাকতে পারে, কখন কার সামনে থাকি তারও কোন ঠিক নেই। চৌধুরীর সাথে কথা বলছি, এই সময় যদি রেডিও থেকে পিপ পিপ আওয়াজ বেরোয় তাহলেই সর্বনাশ।'

'রেডিও অন করে রেখে তোমার অপেক্ষায় থাকব শুধু, যোগাযোগ করব না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর সহকর্মীদের দিকে তাকালেন। রানার কৃতিত্বে তাঁর নিজের গর্বিত হবার অধিকার আছে বলে মনে করছেন তিনি, তাই চেহারা থেকে আনন্দ উত্তেজনা চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে গেলেন। হাসলেন না, কিন্তু চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন তিনি, সবশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্টের ওপর। 'পাগল, স্যার। আপনি বলেছিলেন।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবেই নিলেন। বললেন, 'এখনও বলি, অ্যাডমিরাল। হয়তো উপকারী পাগল, কিন্তু পাগল তো বটেই। অনেকেই বুঝতে ভুল করেছে, ওকে আমি আসলে পাগল বলে প্রতিভাবান বোঝাতে চেয়েছি। এবং ওদেরকে তো আমরা পাগল বলেই জানি।'

'ওর বুদ্ধি আর সাহস অফুরন্ত,' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বললেন। 'ঠিক লোকটা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে রয়েছে, বুঝলাম। কিন্তু এত সবের পরেও আমাদের আসল সমস্যা মিটছে না। জিম্মিদের মুক্ত করার উপায় কি?'

'আমার কোন ভাবনা নেই,' হ্যামিলটন বললেন। চেয়ারে আরাম করে বসলেন তিনি। 'কিছু একটা বুদ্ধি ঠিকই বের করে ফেলবে রানা।'

সাত

বুদ্ধি করছে রানা, তবে ঘুমোবার। ড্রাইভিং সীটের সামনে থেকে এরই মধ্যে ওয়াল্টারকে তুলে কোচে ওঠার দ্বিতীয় ধাপে বসিয়ে দিয়েছে ও, তার মাথা আর কাঁধ ঠেকে আছে হ্যান্ড-রেইলের সাথে। দু'চার মিনিটের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসবে তার। ওদিকে নটহ্যামও নড়াচড়া করছে।

প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে এগোল রানা। শুধু জেগে নয়, সতর্ক অবস্থায় রয়েছে জুলি। প্যাসেজে বেরিয়ে এল দ্রুত, রানা জানালার ধারের সীটে বসতে আবার দখল করল নিজের সীট। ভিজে কোট খুলে মেঝেতে ফেলার আগে তাকে অ্যারোসল ক্যানটা ধরিয়ে দিল রানা। নিচের দিকে ঝুঁকে ক্যারি-অলের ভেতর সেটাকে চালান করে দিল জুলি। ফিসফিস করে বলল, 'আবার তোমাকে দেখতে পাব ভাবিনি। কোন বিপদ হয়নি তো?'

'সত্যিই কি জানতে চাও?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল জুলি, তারপর দ্রুত মাথা নাড়ল। মুচড়ে ধরে তার হাতটা কেউ ভেঙে দিচ্ছে, কল্পনায় দেখতে পেল দৃশ্যটা। নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তোমার গলায় ওটা কি ঝুলছে?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠল রানা, ঘুম ঘুম ভাবটা এক পলকে দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। পেরটকে রশি দিয়ে বাঁধার সময় রেডিওটা গলায় ঝুলিয়েছিল ও, তারপর আর নামানো হয়নি। টহলরত চৌধুরীর চোখে পড়তে পারত ওটা। গলা থেকে ট্র্যানসিভার নামিয়ে স্ট্র্যাপের ক্লিপ খুলল ও, ক্যামেরা তুলে নিয়ে বেসে ঢুকিয়ে দিল রেডিও।

'কি ওটা?'

'ক্যামেরা।'

'ক্যামেরার ভেতর ওটা যেটা ঢুকে গেল?'

'কিছু একটা হবে। নাম জানি না।'

'কোত্থেকে পেলে? মানে, এই কোচ—স-ব—তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে।'

'পেলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে। সবখানে আমার বন্ধু আছে, জানো না? ভাল কথা, ধন্যবাদ, সবুজনয়না। ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে হয়তো তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে আমার চুমো খাওয়া উচিত।'

'কি!'

রানা আবিষ্কার করল, চুমো ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা মনে হয় আসলে ততটা অপটু নয় মেয়েটা। ও বলল, 'এটাই আজ রাতের সবচেয়ে সুন্দর কাজ। সারাদিন আর সারারাতের। গোটা হপ্তার। ধেত্তেরি, আসলে সারা মাসের। উঁহু, বোধহয় পুরো বছরের। এই ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর আবার একদিন, কোন এক সময়, আবার আমরা এটা করব, কেমন?'

'এখনই আবার নয় কেন?' জুলির সবুজ চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক।

'এখন নয়, কারণ, তুমি যদি শুয়ে পড়তে চাও? এখানে আমি তোমাকে কোথায়...'

চড়টা জায়গা মত পৌঁছবার আগেই জুলির হাত ধরে ফেলল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দিক নির্দেশ করল। কোচের সামনের দিকে কে যেন নড়ছে। ওরা তাকাল। ওয়াল্টার। আশ্চর্য দ্রুততার সাথে খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, ব্রিজের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত তাকাল বারকয়েক। লোকটা কি ভাবছে, আন্দাজ করতে পারল রানা। শেষ কথাটা মনে আছে তার, লীড কোচের ধাপ দেখছিল। এখন ধরে নিচ্ছে, সে বোধহয় দু'এক মিনিট বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসেছিল ওখানে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, ঘুমিয়েছিল এ-কথা সে কোনমতেই চৌধুরীর কাছে স্বীকার যাবে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কোচে উঠল সে, মেশিন-গানের মাজল দিয়ে খোঁচা মারল নটহ্যামের গায়ে। চমকে উঠে চোখ মেলল নটহ্যাম, তাকিয়ে থাকল।

'তুমি ঘুমাচ্ছ?' চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়াল্টার।

'আমি? ঘুমাচ্ছি?' যেন আকাশ থেকে পড়ল নটহ্যাম। 'চোখ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিলে সেটা ঘুম হয়ে যায়?'

'বিশ্রাম নিক, কিন্তু খবরদার, ছুটি যেন না নেয়।' হুঁশিয়ার করে দিয়ে কোচ থেকে নেমে গেল ওয়াল্টার।

'ঘুম আসছিল,' ফিসফিস করে বলল রানা, 'এখন আর আসছে না। সন্দেহ করছি, একটা আলোড়ন উঠতে পারে। ভান করতে নয়, তখন সত্যি সত্যি ঘুমাতে চাই আমি। তোমার কাছে ঘুমের ওষুধ নেই, না?'

'কেন থাকবে?'

'ঠিক আছে, অ্যারোসল ক্যানটা তাহলে দাও আমাকে।'

'কেন?'

'নাক দিয়ে সামান্য একটু টানব। তারপর তুমি আমার হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখবে ওটা।'

ইতস্তত করছে জুলি।

'ডিনারের কথা মনে আছে? একটা দুটো নয়, অনেকগুলো, তুমি আর আমি?'

'ডিনার? কই, সে'রকম কিছু বলেছ বলে তো মনে পড়ছে না!'

'ঠিক আছে, এখন না হয় বললাম। কিন্তু ভেবে দেখো, আমাকে যদি গোল্ডেন গেটে ফেলে দেয়া হয়, কে তোমাকে ডিনার খেতে নিয়ে যাবে?'

শিউরে উঠে ক্যারি-অলের দিকে হাত বাড়াল জুলি।

রিয়্যার কোচে ঘুমাচ্ছে কবীর চৌধুরী। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল বেডলার, 'স্যার?'

সাথে সাথে ঘুম ভাঙল চৌধুরীর, এক পলকে সতর্ক হয়ে উঠল। 'সমস্যা, বেডলার?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। দুশ্চিন্তা হচ্ছে। চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে এখুনি আসছি বলে সেই যে গেছে পেরট, এখনও ফিরছে না।'

'কতক্ষণ আগে গেছে?'

'আধ ঘণ্টা, স্যার।'

'সেকি! হতভাগা, আরও আগে কেন জাগাওনি আমাকে!'

'আপনার একটু ঘুম দরকার ছিল, তাই, স্যার। আমাদের একমাত্র ভরসাই তো আপনি। তাছাড়া, আমার ধারণা, পেরট নিজেকে রক্ষা করতে জানে।'

'তার সাথে মেশিন-পিস্তল আছে?'

'আছে।'

সীট ছাড়ল চৌধুরী, নিজের অস্ত্রটা তুলে নিল। 'এসো। কোন্দিকে গেছে জানো?'

'উত্তর।'

হেঁটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে চলে এল ওরা। ড্রাইভিং সীটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে বসে সিগারেট টানছে গার্ড হুয়ান। দরজায় মৃদু টোকা পড়তে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে। ভেতরের পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ভরল, ঘোরাল। বাইরে থেকে দরজা খুলে চৌধুরী বলল, 'পেরটকে দেখেছ?' প্রশ্নটা নিচু গলায় না করলেও পারত সে। প্রেসিডেন্ট, রাজকীয় মেহমান, জেনারেল আর

মেয়র, সবাই ঘুমাচ্ছেন—এবং অন্তত নাক ডাকার ব্যাপারে মানব জাতির আর সবার সাথে তাঁদের কোন পার্থক্য নেই।

'দেখেছি, স্যার। তা আধঘণ্টা আগে তো হবেই। ওদিকে, কাছের রেস্টরুমের দিকে চলে গেল।'

'তারপর বেরিয়ে আসতে দেখোনি?'

'আমার ডিউটি ভেতরে, স্যার। জেগে থাকা, কেউ যাতে আমাকে কাবু করে অস্ত্রটা কেড়ে না নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বাইরে বড় একটা তাকাইনি।'

'ঠিক আছে।' দরজা বন্ধ করল চৌধুরী। দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় তালা লাগাবার আওয়াজটা শুনল সে। তারপর কাছের রেস্টরুমের দিকে এগোল ওরা। পেরট নেই ওখানে। দ্বিতীয় রেস্টরুমও খালি। যত সময় যাচ্ছে, চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠছে চৌধুরীর। বেডলারকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল সে। পিছনের দরজা খুলে উঠল, টর্চ জেলে সুইচ বোর্ড দেখল, আলো জেলে এগোল কটে শুয়ে থাকা ডাক্তার অ্যাম্বুর দিকে। ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙানো হলো ডাক্তারের।

চোখ পিট পিট করে তাকাল ডাক্তার, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত তুলে আড়াল করল চোখ। তারপর হাতঘড়ি দেখল সে। 'পৌনে একটা! এত রাতে কি হলো আবার?'

'পেরটের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে দেখেছেন?'

'না।' একটু উদ্বিগ্ন দেখাল ডাক্তারকে। কারণটা পেশাগত দায়িত্ববোধও হতে পারে। 'সে কি অসুস্থ ছিল, নাকি অন্য কিছু?'

'অসুস্থ কেন হবে?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল চৌধুরী।

উত্তর না দিয়ে বিরক্তির সাথে বলল ডাক্তার, 'তাহলে আমাকে জ্বালাতন করার কি মানে হয়? কে জানে, পেরট হয়তো ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারকে দেখল চৌধুরী। তার চোখ দুটো একটু ফুলে আছে। নিদ্রাই এর কারণ, অনিদ্রা নয়। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল চৌধুরী। বেরিয়ে এল অ্যাম্বুলেন্স থেকে। তাকে অনুসরণ করল বেডলার।

একজনকে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। ওয়াল্টার। কাঁধ থেকে মেশিন-গান ঝুলছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'গুড মর্নিং, স্যার।'

'পেরটকে দেখেছ নাকি?'

'পেরটকে? কখন?'

'আধঘণ্টার মধ্যে?'

মাথা নাড়ল ওয়াল্টার। 'না তো!'

'কেন? তোমরা দু'জনেই তো ব্রিজে ছিলে।'

'কোথাও একবারও থামিনি আমি, স্যার। সারাক্ষণ টহলের মধ্যে ছিলাম। পিছন দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু খুব বেশিবার না। পেরট ব্রিজে থাকলেও তাকে হয়তো আমি দেখতে পাইনি। কিংবা ব্রিজে ছিল, কিন্তু তারপর আর ছিল না। হয়তো কোচগুলোর ওই সাইডে গেছে।'

'তা কেন যাবে?'

'হয়তো লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। কিংবা আর কিছু। তার মনে কি ছিল

আমি তার কি জানি, স্যার!'

'হুঁ।' ওয়াল্টার একজন এক্স-ন্যাভাল অফিসার, এবং অভিজ্ঞ হেলিকপ্টার পাইলট। চৌধুরীর পালিয়ে যাবার প্ল্যানে তার ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই তাকে চটাতে চাইল না চৌধুরী। নরম সুরে বলল, 'তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ব্রিজের এই মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকো, মাঝে মধ্যে চারদিকে চোখ বুলাবে। তোমার ছুটি হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি আছে।'

বেডলারকে নিয়ে লীড কোচের দিকে এগোল চৌধুরী। লীড কোচের সামনের অংশে একটা মাত্র আলো জ্বলছে, তাও কমানো। আগুনের একটা টুকরো দেখল ওরা। পিটার নটহ্যাম চুরুট ফুঁকছে। চৌধুরী বলল, 'যাক, অন্তত গার্ডরা সবাই জেগে আছে। কিন্তু সেজন্যেই পেরটের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য আরও দুর্বোধ্য লাগছে আমার।'

ওদেরকে লীড কোচে উঠতে দেখে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটহ্যাম। 'গুড মর্নিং, স্যার। এদিকে সব ঠিক আছে, স্যার।'

'তুমি পেরটকে দেখেছ? আধ ঘণ্টার মধ্যে?'

'কই! কেন, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'কোথাও দেখছি না তাকে।'

চিন্তা করল পিটার। 'শেষ তাকে কে দেখেছে?'

'হুয়ান। তার দেখা থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এই কোচ থেকে নেমেছে কেউ?'

'আগুন দেখার পর কেউ নামেনি, স্যার।'

এগিয়ে গিয়ে রানার সীটের কাছাকাছি দাঁড়াল চৌধুরী। রানার চোখ বন্ধ। বড় করে, গভীর ভাবে শ্বাস টানছে আর ছাড়ছে ও। পাশে বসে জেগে রয়েছে জুলি। সবুজ চোখ দুটো একটু যেন ম্লান। রানার চোখে টর্চের আলো ফেলল চৌধুরী। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। রানার একটা চোখের পাতা দু'আঙুলের ডগায় ধরে ওপর দিকে তুলল চৌধুরী। চোখের চারপাশের মাংসপেশী কাঁপল না বা চামড়ায় টান পড়ল না। জেগে থাকলে পড়ারই কথা। চোখের ভেতর সাদা জমিন আর কালো মণির ওপর মনোযোগ দিল চৌধুরী। কালো তারা নড়ছে না।

'সন্দেহ নেই, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে আছে,' বলল চৌধুরী। নিরাশ যদি হয়েও থাকে, চেপে রাখতে পেরেছে সেটা। 'এই মেয়ে, কখন থেকে জেগে আছ তুমি?'

'ঘুমালাম কখন?' সবুজ চোখ তুলে তাকাল জুলি। নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'ব্রিজে আবার ফিরে না এলেই বোধহয় ভাল করতাম। আমি খুব ভীতু মানুষ। বাজ পড়তে শুনলে কলজে শুকিয়ে যায়।'

'ভয়ের কিছু নেই, ঝড় প্রায় শেষ হয়ে গেছে।' একটু হাসল চৌধুরী। নেমে গেল লীড কোচ থেকে।

ওটা কোন ভয়ের কারণ নয় জুলির। চৌধুরী যদি রানার ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে তখন কি হবে এই ভেবে কলজে শুকিয়ে যাচ্ছিল ওর। চৌধুরী যদি রানার গালে চড়ও কষত, তবু জাগত না রানা।

বিশ মিনিট পর। রিয়্যার কোচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী আর বেডলার। বেডলার বলল, 'খুঁজতে কোথাও বাকি রাখা হলো না, স্যার। পেরট ব্রিজে নেই।'

'হ্যাঁ। তোমার কি ধারণা?'

'স্যার,' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল বেডলার, 'আমি কি মন খুলে কথা বলতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল চৌধুরী।

'পেরট ব্রিজ থেকে লাফ দিতে পারে না। দুনিয়ার সব লোক আত্মহত্যা করলেও, পেরট করবে না। সাত সংখ্যার একটা মোটা টাকা পেতে আর মাত্র দু'পাঁচ দিন দেরি আছে, কাজেই দলবদলও করতে পারে না সে। তাছাড়া, দলবদল করতে হলে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যেতে হত তাকে—যে কোন টাওয়ারের দিকেই যাক, দু'হাজার ফিট হাঁটতে হত, আর ওয়াল্টার তাকে দেখতে পেতই।'

'তাহলে?'

'আমার বিশ্বাস, দুর্ঘটনায় পড়েছে পেরট। আপনি, স্যার, ঠিক জানেন তো, ডাক্তার কোন শয়তানী করেনি?'

'জানি।'

'আর, মি. প্রদ্যুৎ তো ননই। শয়তানী করতে পারে আরেকজনের কথা মনে পড়ছে, জেনারেল পীল। কিন্তু হুয়ান সে সম্ভাবনাও নাকচ করে দিচ্ছে। প্রথমে টেরি, তারপর পেরট···' খানিক চিন্তা করল বেডলার। 'কেন যেন, স্যার, আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে যদি টেরি টহলে থাকত তাহলে বোধহয় ঘটনাটা ঘটত না। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, টেরির পড়ে যাওয়াটা অ্যাক্সিডেন্ট কিনা।'

'কি মনে হয়?'

'পচা একটা আপেল, স্যার। আমাদের মধ্যেও থাকতে পারে।'

'ভাবতেও খারাপ লাগে, তবে চিন্তা করে দেখা দরকার। কিন্তু বেঈমানী করে কার কি লাভ? টাকাটা কি কম? সেটা কেউ হারাতে চাইবে কেন?'

'কোনভাবে হয়তো সরকার তাকে দ্বিগুণ টাকার লোভ দেখিয়েছে।'

'এসব তোমার বাজে চিন্তা,' বলল বটে চৌধুরী, কিন্তু তার কপালে উদ্বেগের রেখা দেখে বেডলারের বুঝতে অসুবিধে হলো না, সম্ভাবনাটা তাকে অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। 'পেরট সম্পর্কে কি ভাবছ তুমি?'

'এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত, স্যার। গোল্ডেন গেটে পড়ে গেছে ও।'

কমিউনিকেশন ওয়াগনে বেশ আরামেই রয়েছে রস পেরট। শুধু তাই নয়, নমস্য ব্যক্তিদের সঙ্গও জুটেছে তার কপালে। টেবিলের একদিকে বসেছে সে একা, আরেক দিকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন পুলিস। পেরটের কুমড়ো আকৃতির চেহারায় সাধারণত ভাবের কোন হদিস পাওয়া যায় না, এখনকার অবস্থা ঠিক তার

উল্টো। ভয়ানক অস্থির এবং চঞ্চল দেখাল তাকে। ছিল গোল্ডেন গেট, ব্রিজে, তারপর নিজেকে আবিষ্কার করল শত্রুদের মাঝখানে, ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিচ্ছে সে। হাত দুটো বারবার মুঠো পাকাল আর খুলল। তারপর বলল, 'ওর আসল পরিচয় তাহলে মাসুদ রানা? কি এমন লোক, অথচ আমাদের সবাইকে একেবারে রামছাগল বানিয়ে ছাড়ল!'

'নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছ না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ। 'কম করেও দশ বছর ঘানি টানতে হবে তোমাকে।'

'লাভ লোকসান তো সব ব্যবসাতেই আছে,' জবাব দিল পেরট।

'লোকসান দিতেই হবে, এমন কোন কথা নেই,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'বুঝলাম না!'

'সবাইকে আমরা এই প্রস্তাব দিই না, তা তুমিও জানো। ইচ্ছে করলে তুমি হাত মেলাতে পারো।'

'না।' পেরটের মায়াভরা চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল।

'ক্ষতিটা কি?' পেরটের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ। 'টাকা পাবে। প্রোটেকশন পাবে। স্বাধীনতা পাবে। দশটা বছর! চিন্তা করে দেখো, জীবন থেকে গায়েব হয়ে যাবে।'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যামিলটন। 'জানতাম, তুমি রাজি হবে না। একদিক থেকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু চরম একটা বোকামি।' পুলিস চীফের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি আমার সাথে একমত তো?'

পুলিসদের দিকে ফিরলেন ডিকসন। 'হাতকড়া পরাও। সামরিক হাসপাতালের ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেকশনে নিয়ে যাও। ডাক্তারদের বলবে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছবেন। টেপ-রেকর্ডার যেন হাতের কাছেই থাকে।'

'হাসপাতাল? রেকর্ডার? তারমানে ড্রাগ?'

'তারমানে ড্রাগ। তোমার সহযোগিতা আমাদের চাই-ই।'

কুমড়োর মাঝখানে একটু ফাটল ধরল।

'হাসছ কেন?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'জোর করে বা ড্রাগের সাহায্যে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে,' বলল পেরট, 'এদেশের কোর্ট তা মানবে না।'

'কে বলল তোমাকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাই আমরা? তোমার সম্পর্কে এরই মধ্যে যা যোগাড় হয়েছে, বিশ বছর জেল খাটাবার জন্যে সেটুকু যথেষ্ট।'

'তাহলে?'

'আমরা ইনফরমেশন চাই। সোডিয়াম পেনটোথাল আর কয়েকটা গাছ গাছড়ার শিকড় থেকে কিছু রস মিশিয়ে ডাক্তাররা তোমাকে যা খাওয়াবেন বা ইঞ্জেক্ট করবেন, তার তুলনা নেই—তোমার বকবকানি থামানোই একটা সমস্যা

হয়ে দাঁড়াবে।'

কালো হয়ে গেল পেরটের চেহারা।

রাত তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। গোল্ডেন গেটের তীরে দাঁড়িয়ে একজন এয়ারফোর্স লেফটেন্যান্ট লেজার রাইফেলের আলট্রাভায়োলেট টেলিস্কোপ সাইটের ক্রশ-হেয়ার ব্রিজের দক্ষিণ সার্চলাইটের ঠিক মাঝখানে স্থির করল। একটা বোতাম টিপল সে, মাত্র একবার।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। কমিউনিকেশন ট্রাকের আড়ালে একটা অদ্ভুত দর্শন ভেহিকেল রয়েছে, তিনজন লোক উঠে বসল তাতে। ড্রাইভিং সীটে বসল ধূসর রঙের কোট পরা একজন লোক, বাকি দু'জন বসল পিছনে। এদের দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল রয়েছে, ধূসর রঙের ওভারঅল পরেছে ওরা। একজনের নাম পিকি, আরেকজনের নাম জসি। কারও বয়সই পঁচিশ ছাড়ায়নি, দেখতে ভদ্র, জোর আছে গায়ে। দেখে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট বলে মনে হয় না, কিন্তু ওরা তাই। দু'জনের সাথেই পিস্তল আছে, আছে সাইলেন্সার। পিকির কাছে ক্যানভাস ব্যাগ রয়েছে, তাতে টুল-কিট ছাড়াও পাওয়া যাবে দুটো অ্যারোসল গ্যাস ক্যান, ভারী কর্ডের একটা বল, অ্যাডহেসিভ টেপ আর একটা টর্চ। জসির কাছেও এই রকম একটা ব্যাগ রয়েছে, তাতে পাওয়া যাবে একটা ওয়াকি-টকি, থার্মোস আর স্যান্ডউইচ।

রাত তিনটেয় শুধু গোল্ডেন গেট নয়, আশপাশের সব আলো চলে গেল। ধূসর কোট পরা লোকটা অদ্ভুত দর্শন ভেহিকেলে স্টার্ট দিল। প্রায় নিঃশব্দে ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে এগোল সেটা।

কমিউনিকেশন ওয়াগনের ডিউটি পুলিসম্যান ফোনের রিসিভার তুলল। কলটা কবীর চৌধুরীর, তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। 'ডিকসন?'

'চীফ এখানে নেই।'

'ডাকো তাকে!' ধমক লাগাল চৌধুরী।

'ব্যাপারটা কি আমাকে যদি বলেন...'

'ব্রিজের আলো আবার চলে গেছে। ডাকো তাকে!'

রিসিভার টেবিলে রেখে ওয়াগনের পিছন দিকে চলে এল ডিউটি অফিসার। খোলা দরজার পাশে একটা টুলে বসে আছেন পুলিস চীফ, এক হাতে একটা ওয়াকি-টকি, আরেক হাতে কফির কাপ। ওয়াকি-টকি ঘর ঘর করে উঠল।

'পিকি, স্যার। টাওয়ারের ভেতর চলে এসেছি আমরা। ইলেকট্রিক কার্ট নিয়ে এরই মধ্যে অর্ধেক পথ ফিরে গেছে ফোর্ড।'

'ভাল।' ওয়াকি-টকি নামিয়ে রাখলেন পুলিস চীফ। 'চৌধুরী? নিশ্চয়ই জেগে আছে?'

আস্তে-ধীরে কাপে চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করলেন তিনি। তারপর উঠে

দাঁড়ালেন। ভেতর দিকে এসে রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। তারপর একটা হাই তুললেন। 'কিছু মনে করবেন না, মি. চৌধুরী। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বলতে হবে না। আবার আলো চলে গেছে। শহরের সবখান থেকে এই একই অভিযোগ আসছে, আমরা কি করতে পারি? অপেক্ষা করুন।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। প্যাসেজ ধরে ছুটে এল বেডলার। তার দিকে ভারী চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যের বাদশা আর প্রিন্স এখনও ঘুমাচ্ছেন। হাতে রিসিভার নিয়ে এদিক ওদিক তাকাল চৌধুরী। দ্রুত, চাপা গলায় বলল বেডলার, 'স্যার, সর্বনাশ! দক্ষিণের সার্চ লাইট জ্বলছে না।'

'অসম্ভব!' চৌধুরীর চেহারা আরও গম্ভীর আর কালো হয়ে উঠল। 'কি হয়েছে?'

'গড নোজ। ওদিকে কোন আলো নেই। অথচ জেনারেটার চালু রয়েছে।'

'এক ছুটে উত্তরে যাও, ওদিকেরটাকে ঘুরিয়ে দাও এদিকে। না। অপেক্ষা করো।' ফোনে পুলিস চীফ ফিরে এসেছেন। 'তুমি বলছ এক মিনিট?' বেডলারের দিকে ফিরল সে। 'দরকার নেই। আলো আবার ফিরে আসছে।' চৌধুরী আবার ফোনে কথা বলল, 'ভুলো না, ডিকসন। ঠিক সাতটার সময় এই ফোনে সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে চাই আমি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোল চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট তাকে থামালেন।

'এই দুঃস্বপ্ন শেষ হবে কখন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সেটা আপনার সরকারই ভাল বলতে পারবে।'

'সরকার যে আপনার অনুরোধ রাখবে, সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। ভাল কথা, ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আপনাকে আমার বন্ধু হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা নেই,' জবাব দিল চৌধুরী।

'সমাজের ওপর আপনার এই ঘৃণা বা আক্রোশ, এটা কেন?'

হাসি দেখে প্রেসিডেন্টের মনে হলো, কৌতুক বোধ করছে চৌধুরী। বলল, 'সমাজকে আমি পরোয়া করি না।'

'তাহলে রাগটা কি আপনার আমার ওপর? তাই বা কেন? দুনিয়ার চোখের সামনে আমাকে এভাবে ছোট করার কি কারণ থাকতে পারে?'

চুপ করে থাকল চৌধুরী।

'উত্তর নেই বলে ধরে নেব?'

'আছে। কিন্তু আপনার সেটা পছন্দ হবে না।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

'আমেরিকা একটা অশুভ শক্তি। আর কিছু না হোক, তাকে একটু বেকায়দায় ফেলে কিছু খসিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি!'

'আমেরিকা অশুভ শক্তি কেন?'

'সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন আপনারা,' বলল চৌধুরী। 'কোত্থেকে, কার

ধন চুরি করে এই পাহাড় তৈরি হয়েছে সে কথা যদি ছেড়েও দিই, তবু প্রশ্ন থেকে যায়—এই সম্পদ মানবজাতির কোন্ কল্যাণে ব্যয় করছেন আপনারা? অস্ত্র তৈরি করছেন, বিক্রি করছেন গরীব দেশগুলোর কাছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে তারা। একটা হাইড্রোজেন বোমার দাম কত? কত দাম একটা সুপারসনিক বোমারুর? কিংবা একটা মিসাইলের? অথবা একটা নৌ-বহরের পিছনে কত টাকা লাগে? ওদিকে সারা দুনিয়া জুড়ে সখিনা আর চিনু গোয়ালারা যে মাসে পনেরো দিন না খেয়ে থাকে, সে-খবর রাখেন না কেন? সম্পদের বড়াই করেন, কিন্তু এ-কথা কি সত্যি নয় যে কোন সম্পদই আসলে কারও ব্যক্তিগত হতে পারে না? গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পৃথিবীর সবার। আপনি জ্ঞানী মানুষ, তবু আপনি জানতে চান, কেন আমি আমেরিকাকে ঘৃণা করি? হাসালেন দেখছি!'

'সময় নিয়ে আলোচনায় বসে এসব বিষয়ে কথা বলার বোধহয় সুযোগ হবে না,' প্রেসিডেন্ট বললেন। চৌধুরীর কথা শুনে তিনি রাগেননি। 'আপনি বোধহয় রাজনীতি পছন্দ করেন না?'

'পলিটিক্স বোর মি।'

'ডিকসনের সাথে আজ আমার কথা হচ্ছিল। ও বলছিল, আপনি নাকি খুব বড় একজন বিজ্ঞানী। যদি বিজ্ঞান চর্চার সব রকম সুবিধে দেয়া হয়, এসব আপনি ছেড়ে দেবেন?'

'বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ দেয়া হবে, সেই সাথে দেয়া হবে শর্ত, তাই না?' মুচকি হাসল চৌধুরী। 'যা আবিষ্কার করব তা শুধু আমেরিকা ভোগ-দখল করতে পারবে, ঠিক?'

'যদি কোন শর্ত না দেয়া হয়?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমার মনটা আবার বড় খুঁতখুঁতে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট।' কোচ থেকে নেমে গেল চৌধুরী।

লিফটে চড়ে দক্ষিণ টাওয়ারে উঠে এল ওরা। লিফট থেকে প্রথমে বেরোল জসি, তারপর পিকি। লিফটের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল পিকি, চাপ দিল একটা বোতামে, তারপর দরজা বন্ধ হতে শুরু করতে হাতটা বের করে নিল।

খোলা টাওয়ারে বেরিয়ে এল ওরা। পাঁচশো ফিট নিচে অন্ধকার, ব্রিজটাকে প্রায় দেখাই গেল না। এক মিনিট পর ব্যাগ থেকে ওয়াকি-টকি বের করল পিকি, এরিয়াল লম্বা করে বলল, 'এবার আপনারা পাওয়ার লাইন কেটে দিতে পারেন।'

ওয়াকি-টকি রেখে দিয়ে ওভারঅল খুলে ফেলল সে। গাঢ় রঙের স্যুটের ওপর পরে আছে একটা লেদার হারনেস, পিছনে ভারী ইস্পাতের বকলস। বকলসের সাথে একটা নাইলন রোপ রয়েছে, সেটা পিকির কোমরের সাথে কয়েক পাক জড়ানো। কোমর থেকে ওটা খুলছে, এই সময় টাওয়ারের মাথায় এয়ারক্রাফট ওয়ার্নিং লাইট আর ব্রিজের আলো ফিরে এল। 'ওদের চোখে ধরা পড়ে যাব?'

'এয়ারক্রাফট ওয়ার্নিং লাইটের কথা ভাবছ?' মাথা ঝাঁকাল পিকি। 'ওদের আর আলোটার মাঝখানে থাকব না আমরা, কিভাবে দেখতে পাবে? দক্ষিণের

সার্চলাইটও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।'

নাইলন রোপ খুলে প্রান্তটা জসির হাতে ধরিয়ে দিল পিকি। 'কিছুর সাথে ভাল করে পেঁচিয়ে নাও। কিন্তু ধরে থেকো।'

'তা থাকব,' নিঃশব্দে হাসল জসি। 'কিন্তু তুমি যদি ডাইভ দাও, তোমাকে টেনে তোলা আমার কম্মো নয়। তখন আমাকেই ওগুলো খুলে আনতে যেতে হবে, কিন্তু রশি ধরার জন্যে কেউ এখানে থাকবে না।'

'এর জন্যে আমাদের ডেঞ্জার মানি পাওয়া দরকার।'

'তোমাকে তাহলে আর্মি বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের কলঙ্ক বলে মনে করা হবে।'

চওড়া কেবলে উঠে পড়ল পিকি। এক্সপ্লোসিভ থেকে ডিটোনেটর খুলতে শুরু করল সে।

আট

সকাল সাড়ে ছ'টায় চোখ মেলল রানা। দেখল, ক্লান্ত দৃষ্টিতে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে জুলি। তাকে বলল ও, 'বাঙালী মেয়েদের মতই স্বামী-অন্ত-প্রাণ হবে তুমি। আমার জন্যে সারারাত জেগে আছ!'

'শরীর ভাল তো? অ্যারোসলের কোন প্রতিক্রিয়া নেই?'

'কই! আর কোন ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তা নেই তো?'

'আছে। একটার একটু পর চৌধুরী এসেছিল। তুমি সত্যি ঘুমাচ্ছ কিনা দেখার জন্যে টর্চ দিয়ে তোমার চোখ পরীক্ষা করেছে।'

'প্রাইভেসী সম্পর্কে সবার সেন্স সমান নয়, কি আর করা,' বলল রানা। 'তার মানে?'

'মানে, এখনও তোমাকে সন্দেহ করছে সে।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'পেরট। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তাই?'

'মনে হচ্ছে অবাক হওনি।'

'পেরট আমার কে, আমিই বা পেরটের কে? রাতে আর কিছু ঘটেনি?'

'তিনটের দিকে ব্রিজের আলো আবার চলে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা।' এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'কিছুই দেখছি তোমাকে অবাক করতে পারছে না!'

'আলো চলে গেলে আমার অবাক হওয়ার কি আছে! অনেক কারণেই তা যেতে পারে।'

'আমার ধারণা কারণ মহাশয় আমার পাশে বসে আছেন।'

'তুমি নিজেই সাক্ষী আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'কিন্তু মাঝরাতে?' রানার কানের লতিতে ঠোঁট ছোঁয়াল জুলি। 'পেরটকে মেরে ফেলোনি তো?'

'কি মনে করো তুমি আমাকে? ভাড়াটে খুনী?'

'আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'পেরট মরেনি। বিশ্বাস করো, প্রচুর খাতির করা হচ্ছে তাকে।'

'তুমি যা বলছ আর চৌধুরী যা ভাবছে, মিলছে না।'

'চৌধুরী কি ভাবছে তুমি জানলে কিভাবে?'

'নটহ্যাম চলে যাবার পর…'

'নটহ্যাম যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, চৌধুরীকে বলেছে সে?'

'না।'

'নটহ্যাম চলে যাবার পর কি হলো?'

'তার বদলে ওই গরিলা এল।' নতুন গার্ডের দিকে তাকাল জুলি, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও। গরিলা নয়। ভাল্লুক।

'চার্লি। চৌধুরীর মোবাইল থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক।'

'বেডলারও আসা-যাওয়া করেছে, বেশ কয়েকবার। গরিলাকে একবার বলল, চৌধুরীর বিশ্বাস পেরট গোল্ডেন গেটে পড়ে গেছে।'

'ভুল।'

'আসল ব্যাপারটা কি বলবে আমাকে?'

'তুমি শুনতে চাও না,' মুচকি হাসল রানা। 'আমি যদি ভুলে যাই, মনে করিয়ে দিয়ো—আজ রাতে তোমাকে নিয়ে ডিনার খেতে বেরোব।'

'হোয়াট!' সবুজ চোখে বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জুলি। 'আজ রাতে! তোমার কি মাথা খারাপ হলো? আজ রাতে?'

'শুনতে ভুল করোনি।'

ঠিক সাতটায় প্রেসিডেনশিয়াল কোচে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী,' ডেভিড নিউসম বললেন। 'আপনার অসম্ভব দাবি আমরা মেনে নিয়েছি, মি. চৌধুরী। প্রয়োজনীয় অ্যারেঞ্জমেন্টও করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে আপনার কন্ট্যাক্ট যোগাযোগ করবে এই আশায় অপেক্ষা করছি আমরা।'

'অপেক্ষা করছেন? তার মানে? তার সাথে আপনাদের দু'ঘণ্টা আগেই তো যোগাযোগ হওয়ার কথা।'

ধৈর্য না হারিয়ে নিউসম বললেন, 'তিনি আবার যোগাযোগ করবেন সেই আশায় আছি আমরা।'

'কখন যোগাযোগ করেছিল সে?'

'আপনি যেমন বললেন, দু'ঘণ্টা আগে। তিনি তাঁর ইউরোপিয়ান বন্ধুদের সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন।'

'কথা ছিল নিজের পরিচয় দেয়ার জন্যে একটা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবে সে।'
'করেছেন। আহামরি কিছু না, আমার ধারণা। ''কবীর চৌধুরী''।'
হাসি ফুটে উঠল চৌধুরীর মুখে। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। কোচ থেকে সকালের কচি রোদে যখন বেরিয়ে এল, তখনও হাসছে। এখানে বেডলার রয়েছে, কিন্তু বসকে হাসতে দেখেও হাসতে পারল না সে। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে, আপাতত দু'জনের দায়িত্ব একাই পালন করতে হচ্ছে তাকে। হাসতে না পারার কারণ অবশ্য সেটা নয়।
'টাকার ব্যাপারটা সব ঠিক হয়ে গেল।'
'খুশির খবর, স্যার,' নিস্তেজ গলায় বলল বেডলার।
চৌধুরীর মুখের হাসি নিভে গেল। 'কি ব্যাপার, বেডলার?'
'আপনাকে আমি দুটো জিনিস দেখাতে চাই, স্যার।' চৌধুরীকে নিয়ে দক্ষিণ মুখো সার্চলাইটের কাছে চলে এল সে। 'সার্চলাইটে দুটো ইলেকট্রোড থাকে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বাঁ দিকেরটা দেখুন।'
দেখল চৌধুরী। 'মনে হচ্ছে গলে গেছে বা চাপ দিয়ে বাঁকানো হয়েছে। ব্যাপার কি, বেডলার?'
'আর, এদিকে দেখুন, স্যার। গ্লাসে ছোট্ট একটা ফুটো।'
'এসবের মানে?'
'আরও আছে, স্যার।' চৌধুরীকে নিয়ে রিয়্যার কোচের কাছে ফিরে এল বেডলার। হাত তুলে কোচের ছাদ দেখাল। 'রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার। চেক করে কারও কাছে ট্র্যানসিভার পাওয়া যায়নি, তাই ওটা ব্যবহার করিনি আমরা। কিন্তু কেন যেন আজ সকালে ইচ্ছে হলো, স্ক্যানারটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওপরে উঠে দেখি বেস-এর রিভলভিং পিন ঝলসে গেছে।'
'বাজ পড়লে অমন হতে পারে? দু'জায়গাতেই?'
'কিন্তু স্যার, স্ক্যানার বা সার্চলাইট কোনটাই মাটির সাথে লেগে ছিল না! দুটোই রাবার হুইলের ওপর রয়েছে।'
'স্ক্যানার...'
'কোচের রাবার হুইলের ওপর, স্যার।'
'তাহলে কি?'
'আমার বিশ্বাস, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লেজার বীম ব্যবহার করছে, স্যার।'

এই সাত সকালেও টেবিলে হাজির হয়েছেন তাঁরা সাতজন। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক এখন তাঁরাই, আপাতত কমিউনিকেশন ওয়াগনই তাঁদের হেডকোয়ার্টার। ফোন বাজতে রিসিভার তুলল একজন পুলিস অফিসার।
'কবীর চৌধুরী। জেনারেল গারল্যান্ডকে চাই।'
'আশপাশেই কোথাও আছেন। একটু ধরুন, প্লীজ।' মাউথপীসে হাত চাপা দিল অফিসার। 'জেনারেল গারল্যান্ড, স্যার, চৌধুরী আপনাকে চাইছেন।'
'স্পীকারের সুইচ অন করো, ডেভিলটার কথা আমরা তাহলে সবাই শুনতে

পাব। বলো, আসছি।'
'জেনারেল আসছেন।'
গারল্যান্ড রিসিভার নিলেন। 'চৌধুরী?'
পাল্টা অপমান করল চৌধুরী। 'গারল্যান্ড?'
জেনারেল গারল্যান্ড চুপ করে থাকলেন।
'গারল্যান্ড, তোমার ওই লেজার বীম যদি আরেকবার ব্যবহার করো, প্রেসিডেন্টের কান কাটব, সেই সাথে জেমস ফেয়ারকে ফেলে দেব গোল্ডেন গেটে।'
টেবিলে যাঁরা বসে আছেন, দ্রুত পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকালেন তাঁরা।
'মানে?'
'একটা সার্চলাইট আর রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার নষ্ট করা হয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কাজগুলো লেজার বীমের।'
'বোকার মত কথা বলছ তুমি, চৌধুরী,' গারল্যান্ড রাগের সাথে বললেন। 'বে এলাকায় লেজার বীম ইউনিট আছে নাকি যে ব্যবহার করব? থাকলে আমরাই প্রথম জানতাম। থাকলে, ব্রিজে তোমার লোক যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের প্রত্যেকে এক এক করে গায়েব হয়ে যেত। তারপর, হেলিকপ্টার দুটো? টেরও পেত না, অথচ অচল করে দিতাম ওগুলো। পালাবার সময় দেখতে, উড়ছে না। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে বাজ পড়েছে।'
'কিন্তু মাটির সাথে ওগুলোর কোন যোগাযোগ ছিল না। রাবার হুইলের ওপর…'
'মাটির সাথে তো প্লেনেরও যোগাযোগ থাকে না, তাহলে প্লেনে বাজ পড়ে কেন? জানা কথা, সার্চলাইটের জন্যে জেনারেটার ব্যবহার করছ তুমি। নিশ্চয়ই পেট্রল জেনারেটার? কার্বন-মনোক্সাইডের ধোঁয়ায় দম আটকে মরতে চাও না, কাজেই ওটা কোন কোচে রাখোনি। বলো দেখি, তোমার কোচ-ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্যেও কি জেনারেটার ব্যবহার করছ—মানে, ট্র্যান্সফর্মারের সাহায্যে?'
'হ্যাঁ।'
জেনারেল গারল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তোমার সব চিন্তা আমাকেই করতে হবে বুঝি, চৌধুরী? কিভাবে কি ঘটেছে এবার বুঝতে পেরেছ? স্ক্যানার আর সার্চলাইটের সাথে মাটির যোগাযোগ নেই, এটা তোমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আর কিছু বলবে?'
'হ্যাঁ। খবর দাও, ন'টায় টিভি ক্যামেরা রেডি চাই আমি।'
রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জেনারেল। 'আমাদের টিভি অনুষ্ঠান কখন যেন?'
'চৌধুরীর পরপরই,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'সাড়ে ন'টায়।'

'কি বুঝলে, বেডলার?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।
'সন্দেহ নেই, জেনারেল চালাক লোক।' বেডলারকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখল চৌধুরী। 'কিন্তু বিদ্যুৎ যদি জেনারেটারের মধ্যে দিয়েই গিয়ে থাকে, তাহলে একটা

ইলেকট্রোড থেকে আরেকটায় যায়নি কেন, তা না গিয়ে গ্লাস ফুটো করল কেন? মানে, গ্লাস ফুটো করে কোথায় গেল?'

'হুঁ।'

'ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আমার জানা নেই, স্যার। তবু বলতে পারি, এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে।'

'তুমি ঠিক ধরেছ। ভাল কথা, বেডলার, হীলকে ব্রিজে নিয়ে এলে কেমন হয়? এখানে আমরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, সেটা খানিকটা পূরণ হওয়া দরকার, তুমি কি বলো?'

'মাউন্ট টামালপাইজ আমাদের দখলে চলে এসেছে, ওদিকটা বব ইয়ং একাই সামলাতে পারবে। হ্যাঁ, হীলকে আনিয়ে নেয়াই ভাল।'

'ওয়াল্টার পাহারায় রয়েছে, মারকুয়েজকে বলো, 'কপ্টার নিয়ে এখুনি যেন চলে যায়। টেলিফোনে ওদেরকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, ওরা যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে জেনারেল পীলের নাক কেটে নেব আমরা।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে পুলিস চীফকে সাবধান করে দিল চৌধুরী। একটা 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল মারকুয়েজ। কোচ থেকে বেরিয়ে এসে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল চৌধুরী। জেনারেল গারল্যান্ড একটা কথা অন্তত সত্যি বলেছে, লেজার বীম হেলিকপ্টারের কোন ক্ষতি করেনি।

'বলছিলাম কি,' জুলিকে বলল রানা, 'তুমি একবার লেডিস রুমে গেলে পারতে না?'

'কেন? ও, বুঝেছি, যেতে বলার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।'

'হ্যাঁ। যা বলি, রিপিট করো।'

রানার কথা চারবার রিপিট করল জুলি। 'ব্যস, এইটুকু?'

'হ্যাঁ।'

'একবার বললেই মনে থাকত। কাজটা তুমি নিজে কেন করছ না?'

'এটা জরুরী, এখুনি করা দরকার। তাছাড়া তোমরা মেয়েরা ব্রিজে রয়েছ মাত্র চারজন, আমরা রয়েছি পঞ্চাশজন। তুমি ইচ্ছে করলেই নিরিবিলি একটা জায়গা পাবে, আমি পাব না।'

'ইতিমধ্যে কি করবে তুমি? ভাল কথা, তোমাকে আমার বনমানুষের মত লাগছে।'

'দাড়ি কামিয়ে মানুষ হতে বলছ, এই তো? কিন্তু যন্ত্রপাতি সব সান ফ্রান্সিসকোয় রেখে এসেছি। আপাতত বনমানুষকেই পছন্দ করতে হবে তোমার। সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট ওয়াগন আসছে, মনে আছে?'

'খিদেই নেই,' বলে এগোল জুলি। কথা বলল নিগ্রো চার্লির সাথে। ভাল্লুকটা গাম্ভীর্যের সাথে মাথা ঝাঁকাল। লেডিস রুমে যাবার অনুমতি পেয়েছে জুলি।

পুলিস চীফের সামনে একটা ট্র্যানজিসটার, সেটা ঘড় ঘড় করে উঠল। সেটটা কাছে টেনে নিয়ে সাউন্ড বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বাকি ছয়জন সেটের দিকে ঝুঁকে

পড়লেন। সবাই সাগ্রহে আশা করছেন রানা কথা বলবে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?' মেয়েলী গলা।

'স্পিকিং।'

'জুলি।'

'ক্যারি অন, মাই ডিয়ার।'

'রানা আপনাকে একটা শেষ উপায়ের কথা জানিয়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো একটা মারাত্মক আর ভয়ঙ্কর উপায়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'রানা জানতে চায়, উপায়টাকে আরও কম মারাত্মক করা সম্ভব কিনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চায় ও। ওটাকে নন-লেথাল লেভেলে নামিয়ে আনার জন্যে যতটা সময় দরকার তা আপনাকে দেয়া যাবে।'

'চেষ্টা করব। গ্যারান্টি দিতে পারি না।'

'রানা বলছে, এক মিনিট আগে স্মোক বোমা দিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করলে ভাল হয়। বলছে, তার এক মিনিট আগে রেডিওতে কথা বলবে আপনার সাথে।'

'ওর সাথে আমারও আর্জেন্ট কথা আছে। ও নিজে কথা বলছে না কেন?'

'কারণ আমি লেডিস টয়লেটে রয়েছি। কেউ আসছে।' ট্র্যান্সিভার থেমে গেল।

কমিউনিকেশন ডেস্কের দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। 'আর্মারি! ইমার্জেন্সী।' ফিরলেন জেনারেল গারল্যান্ডের দিকে। 'জেনারেল, এ-ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগবে আমার।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'অ্যাডমিরাল, আপনি আমাদের বলেছিলেন, রানার শেষ উপায়টা কি তা আপনার জানা নেই।'

তাঁর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন হ্যামিলটন। 'আমি সিকিউরিটির লোক, স্যার। অনেক সময় ডান হাতের কাজ সম্পর্কে বাঁ হাতকেও কিছু জানতে দিই না।'

ব্রিজের মাঝখানে ব্রেকফাস্ট এল সাড়ে সাতটায়। সাতটা পঁয়তাল্লিশে হেলিকপ্টার নিয়ে নিরাপদে ফিরে এল মারকুয়েজ। রজার হীলকে গম্ভীর কিন্তু অক্লান্ত এবং তাজা দেখাল, পুলিসের ইউনিফর্ম এখনও পরে আছে সে। বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই ফটোগ্রাফাররা অনেকগুলো ছবি তুলে নিল তার।

হীলের সাথে একধারে দাঁড়িয়ে জরুরী আলোচনা সারছে কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ডিউটি গার্ড চেসটনকে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। 'ফোন, স্যার।'

হীল বলল, 'এদিকটা সব আমি সামলাব, স্যার। আপনি বিশ্রাম নিন। চিন্তার কিছুই নেই।'

কোচে এসে ফোন ধরল চৌধুরী।

পুলিস চীফ বললেন, 'আপনার জন্যে দুঃসংবাদ আছে, মি. চৌধুরী। বনি বোয়ানকো আপনার চেহারাও দেখতে চান না। আশ্রয় দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বলছেন, তিনি আর আপনার বন্ধু নন।'

'কে?' রিসিভারটা এত জোরে চেপে ধরল চৌধুরী, নিজেরই মনে হলো ভেঙে যাবে ওটা। 'কার কথা বলছ?'

'ব-নি-বো-য়া-ন-কো ক্যারিবিয়ানে আপনার স্বর্গদ্বীপ, তার প্রেসিডেন্ট। তিনি আপনাকে নেবেন না।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন, কিন্তু স্বীকার করছেন না। আসলে, মি. চৌধুরী, সারা দুনিয়ায় আপনার পাবলিসিটি দেখে বেচারা ঘাবড়ে গেছেন। তাঁকে আমরা খুঁজতে যাইনি। তিনিই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি আমাদের সাথে ইন্টারন্যাশনাল লাইনে রয়েছেন, আপনি চাইলে আপনার সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি। দেব?'

কথা বলল না চৌধুরী। কপালে চিটচিটে ঘাম। কয়েক সেকেন্ড পর পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল কানে।

'তুমি একটা বোকা, চৌধুরী। বদ্ধ উন্মাদ। মুখে লাগাম টানতে জানো না! জিম্মিদের নিয়ে ক্যারিবিয়ানে আসছ, সবাইকে জানিয়ে দিলে। বলে দিলে, দ্বীপ দেশটার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক সম্পর্ক নেই। বললে, দেশটা জাতিসংঘের সদস্য নয়। আমেরিকানদের এরপর আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে? এ তো দুই-দুই চারের মতই সহজ অংক। গুয়ান্তানামো বেস থেকে একটা নৌ-বহর এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। আমার ছোট্ট দেশের ওপর ঝাঁক ঝাঁক ফাইটার প্লেন উড়ে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র খবর পেলাম, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমার এই ছোট্ট দেশটাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড করতে মাত্র নাকি আধঘণ্টা সময় লাগবে তাঁদের। এরপরও তুমি আশা করো, তোমাকে আমি ঠাঁই দেব?' থামলেন বনি বোয়ানকো, হাঁপাতে লাগলেন।

চৌধুরী হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

'তুমি একটা আস্ত পাগল, চৌধুরী। তোমাকে আমি আগেও সাবধান করে দিয়ে বলেছি, যা করবে চুপচাপ করবে, ঢোল পেটাতে যেয়ো না। কিন্তু যার পতন ঘনায়, সে কি ভালমানুষের কথায় কান দেয়?'

'কাজটা ভাল করলে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল চৌধুরী। 'আমার শত্রুতা কিনলে তুমি। একদিন প্রতিশোধ নেব।' ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

নয়

দুঃসংবাদটা হালকা ভাবে নিল রজার হীল। 'বনি বোয়ানকো তাহলে পিঠ দেখালেন? তাই বলে এটাকে কেয়ামত মনে করার কোন কারণ নেই।'

'ঠিক,' তাকে সমর্থন করল কবীর চৌধুরী। 'প্ল্যান একটু বদল করতে হবে এই যা। আসলে, মার্কিন সরকার আমাদের সাইকোলজিক্যাল ওয়রফেয়ারের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কোন ভাবে সুবিধে করতে পারছে না, তাই নানা দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছে আমি যাতে কোন ভুল করে বসি।'

'যতই চাপ সৃষ্টি করুক, বা ধোঁকা দিক, কার্ড তো সব আমাদের হাতে—খেলায় আমরাই জিতব।' একটু চিন্তিত হলো হীল। 'প্ল্যানটা তাহলে বদলে ফেলতে হয়, স্যার।'

আপন মনে হাসল চৌধুরী। 'বিকল্প প্ল্যান করেই রেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যারিবিয়ানে যাবার প্ল্যানটাই ছিল আমার বিকল্প প্ল্যান। অরিজিনাল প্ল্যান ছিল, জিম্মিদের নিয়ে আমরা কিউবায় চলে যাব। কিউবাতেই যাব আমরা। মানে, প্ল্যান বদলের কোন দরকার নেই। একটা কথা কি জানো? কিউবায় যাবার প্রস্তাবটা পেরটই দিয়েছিল আমাকে।'

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকল হীল। তারপর জানতে চাইল, 'কিউবা এত বড় ঝুঁকি নেবে, স্যার?'

'সে-সব বিষয়ে ওদের সাথে আগেই কথা হয়েছে আমার। কিউবা আমার সাথে এ-ব্যাপারে হাত মেলালে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করে বসতে পারে, তাই না? কিন্তু কিউবা বলবে, ব্যাপারটার সাথে তারা জড়িত নয়। বলবে, চৌধুরী তোমাদের প্রেসিডেন্টের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে, এখন তোমরাই বলে দাও, কি করব আমরা।'

মুচকি হাসল হীল। 'তাছাড়া, কিউবার গুরু মস্কো, শিষ্যের ওপর কেউ আঘাত হানলে গুরু মুখ বুজে সহ্য করবে না। বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে, স্যার।'

'পারেই তো,' বলল কবীর চৌধুরী। 'অবশ্য তার আগেই জিম্মিদেরকে রেখে আমরা কেটে পড়ব—সাড়ে আটশো মিলিয়ন জায়গামত পৌঁছলেই। তাহলে ওটাই ঠিক হলো, আমরা হাভানা যাব। এবার, টিভি অনুষ্ঠান। আমাদের পরবর্তী শো ন'টায়। যন্ত্রপাতি, এক্সপ্লোসিভ সব রেডি করা আছে। আগের মতই হুয়ানই ইলেকট্রিক ট্রাকটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। শেষ বার এক্সপ্লোসিভ ফিট করেছে নটহ্যাম আর টেলর। চেসটন আর ব্যারি-র ধারণা, ওরা তাদের চেয়ে ভাল করবে।' হাসল সে। 'ওদেরকেও একটা সুযোগ দেয়া যাক। দেখো, যেন ওয়াকি-টকি নিয়ে যায়।'

বেডলারের দিকে ফিরল চৌধুরী। 'বার বার প্রেসিডেনশিয়াল কোচে ছুটতে চাই না। যেখানেই থাকি, হাতের কাছে যেন একটা টেলিফোন পাই। ডিকসনের

সাথে ডাইরেক্ট লাইন হওয়া চাই। আমাদের কোচে ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'লোকাল এক্সচেঞ্জের ভেতর দিয়ে হবে সেটা, স্যার।'

'তাতে কি! বলবে, লাইনটা সারাক্ষণ খোলা থাকে যেন। আর, লীড হেলিকপ্টার থেকে একটা রেডিও-টেলিফোন লিঙ্ক দিতে পারবে?'

'শুধু একটা নব ঘোরাতে হবে, স্যার।'

'ওটা দরকার হবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি পারো।'

ঘন নীল আকাশ, সোনালি রোদ, ফুরফুরে তাজা বাতাস— আরেকটা স্নিগ্ধ সকাল। কিন্তু কালকের মত পশ্চিম আকাশের এক কোণে কুয়াশার সমাবেশও লক্ষ্য করা গেল। তিনটে কোচের মধ্যে মাত্র একজন আজকের এই সুন্দর সকালটা উপভোগ করছে না।

নিজের সীটে বসে আছে রানা, জানালার কার্নিসে কনুই, একটা হাত চিবুকের কাছে উঠে আছে যাতে কেউ ঠোঁট নড়া দেখতে না পায়।

হ্যামিলটন বললেন, 'আওয়াজ কমিয়ে ট্র্যানসিভার কানে তোলো।'

'অসম্ভব। উইন্ডো লেভেলের ওপরে রয়েছে আমার মাথা আর কাঁধ। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিচের দিকে ঝুঁকতে পারি। তাড়াতাড়ি করবেন, প্লীজ।'

রানার ক্যামেরা ওর হাঁটুর ওপর উল্টো করা রয়েছে, পিছনের ঢাকনি সরে যাওয়ায় ভেতরে ট্র্যানসিভার দেখা যাচ্ছে। আওয়াজ কমিয়ে মাথা নিচু করল ও। প্রায় পনেরো সেকেন্ড পর সিধে হয়ে চারদিকে তাকাল। কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। আওয়াজ বাড়িয়ে দিল আবার।

'কি,' জানতে চাইলেন হ্যামিলটন, 'অবাক হওনি?'

'তেমন নয়। ওকে বলবেন নাকি?'

'এদিকের প্রস্তুতি এখনও শেষ হয়নি…'

'সি-ইউ-বি?'

'নন-লেথাল লেভেলে আনতে বলেছি,' হ্যামিলটন বললেন। 'কিন্তু এক্সপার্টরা এখনও কথা দিতে পারছে না।'

'তাহলে মাত্র দু'একটা সি-ইউ-বি ব্যবহার করুন। বাকিগুলো গ্যাস বোমা হলেই চলবে। টাওয়ারে ওরা যারা রয়েছে, আপনাদের সাথে যোগাযোগ আছে?'

'পিকি আর জসি। হ্যাঁ।'

'ওদেরকে বলুন, ওদের হাতে কেউ যদি ধরা পড়ে, টাওয়ারের পীয়ার দিয়ে যেন নামিয়ে আনে।'

'কেন?'

ব্যাখ্যা না দিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'অ্যাডমিরাল সোরেনসন আছেন ওখানে?'

কয়েক সেকেন্ড পর অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'বলো, রানা।'

'ছোট একটা বোট, বিশেষ ফটফট করে না, আছে আপনার?'

'ইলেকট্রিকে চলে?'

'ভাল হয়।'

'প্রচুর।'
'কুয়াশা এলে, দক্ষিণ টাওয়ারের পীয়ারের পাশে পৌছতে পারবে?'
'ধরে নাও পৌছে গেছে।'
'বয়া পিস্তল আর রশি নিয়ে?'
'কোন সমস্যা নয়।'
'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। মি. হ্যামিলটন?'
'হ্যাঁ।'
'অ্যাকশনের জন্যে লেজার ইউনিট রেডি তো? গুড। লীড হেলিকপ্টারের রোটরের ড্রাইভ শ্যাফটে তাক করতে হবে। এখুনি। নিশানা ঠিক করে লক করে দিতে বলুন, যাতে ঘন ধোঁয়ার মধ্যেও লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।'
'কিন্তু...'
'কেউ আসছে।'
চারদিকে তাকাল রানা। কেউ আসছে না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সাথে বক বক করার ইচ্ছে নেই বলে মিথ্যে কথা বলতে হলো। ক্যামেরার পিছনে ঢাকনি লাগাল ও। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল কোচ থেকে।

'সমস্যা, স্যার।' চৌধুরীর হাতে একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল বেডলার।
'চেসটন বলছি, স্যার।' ব্যারিকে নিয়ে দক্ষিণ টাওয়ারের পীয়ারের উদ্দেশে রওনা হয়েছে চেসটন, প্রায় মিনিট দশেক আগে। 'লিফট কাজ করছে না।'
'ধেত্তেরি! দাঁড়াও, দেখি।' হাতঘড়ি দেখল চৌধুরী। আটটা পঁচিশ। তার টিভি অনুষ্ঠান ন'টায়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রিয়্যার কোচে চলে এল সে। বেডলার এরই মধ্যে একটা ডাইরেক্ট লাইনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।
পুলিস চীফ বললেন, 'বলতে হবে না, জানি। ব্রিজ অথরিটির সাথে এই ক'মিনিট আগে কথা হলো। রাতে কোন একসময় টাওয়ার লিফটের ব্রেকার পুড়ে গেছে।'
'মেরামত করা হয়নি কেন?'
'তিন ঘণ্টা আগে কাজ শুরু হয়েছে।'
'আর কতক্ষণ?'
'আধ ঘণ্টা। কিংবা এক ঘণ্টা। ওরা ঠিক করে বলতে পারছে না।'
'মেরামত হয়ে গেলেই আমি যেন জানতে পারি।'
ওয়াকি-টকির কাছে ফিরে এল চৌধুরী। 'উপায় নেই, লিফট ছাড়াই উঠতে হবে তোমাদের। লিফট মেরামত হচ্ছে।'
অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা। তারপর চেসটন বলল, 'মাই গড! এত উঁচুতে...'
'হ্যাঁ, অনেক উঁচু, কিন্তু এভারেস্ট নয়। তোমাদের কাছে তো ম্যানুয়াল আছে।' ওয়াকি-টকি রেখে দিল চৌধুরী।

পশ্চিম ব্যারিয়ারের কাছে ডাক্তারের সাথে দেখা করল রানা। 'সি-ইউ-বি কি

জিনিস, জানেন?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

'ক্লাস্টার বম্ব ইউনিট,' বলল রানা। 'দু'এক ঘণ্টার মধ্যে রিজে ফেলা হতে পারে। বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় ওগুলো। ভিকটিমের কোথাও কোন চিহ্ন রাখে না।'

'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন?'

'না। দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় কম্বোডিয়া সরকার বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে। মার্কিন নেভী সাপ্লাই দিয়েছিল।'

'ওগুলো তো মারাত্মক। মানুষ মারা পড়বে।'

'পড়ার কথা। ওগুলোকে যদি নন-লেথাল লেভেলে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় তবেই ব্যবহার করতে বলেছি।'

'তা কি সম্ভব?'

'এক্সপার্টরা চেষ্টা করে দেখছে। রোদ তেতে উঠছে, ভালমানুষরা সবাই কোচের ভেতর থাকবে,' বলল রানা। 'কোচের এয়ার-কন্ডিশনও চালু থাকবে বলে ধরে নিচ্ছি আমি। তার মানে বন্ধ দরজার ভেতর ব্যবহার করা বাতাস রি-সারকুলেট হবে। কোচের ভেতর কারও কোন ক্ষতি হবে না। প্রথম দেখতে পাবেন স্মোক বম। দেখলেই ছুটে পালাবেন। অ্যাম্বুলেন্সের দরজা বন্ধ করতে যেন ভুল না হয়।'

এগিয়ে এল রানা, বিল গাইডেনের কাঁধ ছুঁল। 'আপনার সাথে দুটো কথা ছিল।' ইতস্তত করল গাইডেন, মাথা নাড়ল, তারপর অনুসরণ করল রানাকে। কাছাকাছি কেউ নেই দেখে থামল ও। 'আমাদের পরিচয় হয়নি। আপনি ই. পি.-র গাইডেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর আপনি রাজা-বাদশার ফুড-টেস্টার, প্রদ্যুৎ মিত্র। এবং দ্য নিউজের রিপোর্টার। আমার সন্দেহ, আরও পরিচয় আছে আপনার।'

'যেমন?'

'এফ. বি. আই. এজেন্ট।'

'না,' বলল রানা। 'এজেন্ট, তবে এফ. বি. আই-র এজেন্ট নই।'

গাইডেনের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল সে, 'আমার সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়!'

'সুবিধেই হলো, বিশ্বাস করাবার জন্যে কাঠখড় পোড়াতে হবে না।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছে দু'জন। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। খোলা টাওয়ারে বেরিয়ে এল চেসটন। পিছু পিছু এল ব্যারি। হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জসি। 'চৌধুরী একটা মানুষ নাকি? কেউ কাউকে এই রকম খাটায়!'

ঠিক ন'টায় শুরু হলো টিভি অনুষ্ঠান।

চৌধুরীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল বেডলার, 'তাড়াতাড়ি সারতে হবে, স্যার। কুয়াশা আসছে। মনে হচ্ছে, ব্রিজ ঢেকে ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল চৌধুরী, তারপব আবার মাইক্রোফোনে কথা বলতে শুরু করল, 'প্রেসিডেন্ট, বাদশা, প্রিন্স—ওঁদেরকেই আমি টাকার মাল বলি। বাকি যাঁরা আছেন, সব সিকি আর আধুলি। যাই হোক, আমার যুক্তিসঙ্গত দাবি মেনে নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে মার্কিন সরকার। তবে, টাকা জায়গামত পৌঁছবার ফাইন্যাল খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। ততক্ষণ খানিক পর পর, প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদেরকে আমরা আনন্দ বিতরণ করে যাব। আরও দুটো অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন বেলা এগারো আর একটায়। প্রিয় দর্শক ভাই-বোনদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, ওগুলো দেখবেন। কথা দিতে পারি, জীবনে আর কখনও এধরনের অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আপনাদের হবে না।

'আগের মতই, ইলেকট্রিক ট্রাকটাকে দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছেন আপনারা। ট্রাকে এক্সপ্লোসিভ আর ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এখন যদি ক্যামেরাম্যান জুম ক্যামেরা ব্যবহার করে, টাওয়ারের মাথায় আমার দু'জন লোককে দেখতে পাবেন আপনারা।' জুম ক্যামেরা টাওয়ারের দিকে মুখ করল। কিন্তু টাওয়ারের মাথায় কাউকে দেখা গেল না। এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড করে পুরো একটা মিনিট কেটে গেল। তবু কারও দেখা নেই।

'সাময়িক অসুবিধে,' সহজ সুরে বলল চৌধুরী। 'প্লীজ, সেটের সামনে থেকে সরবেন না কেউ।' চেহারায় আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। 'এক্সকিউজ মি।' হাত দিয়ে মাইক্রোফোন চেপে ধরে ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। 'ডিকসন?'

'লিফট মেরামর্ত হয়ে গেছে, মি. চৌধুরী।'

'এতক্ষণে? জানো, লিফট ছাড়া একজন লোকের টাওয়ারে উঠতে কতটা সময় লাগে?'

'আপনার লোকেরা লিফট ছাড়াই উঠছে? মাথা খারাপ নাকি!'

'ওদের সাথে ম্যানুয়াল আছে।'

'কিসের ম্যানুয়াল?'

'অরিজিন্যালের একটা কপি।'

'অরিজিন্যালটা তো বিশ বছর ধরে বহু বার বদল করা হয়েছে। ওরা যদি পথ হারায় দু'চার দিন কোন খবর পাবেন না।'

রিসিভার রেখে দিল চৌধুরী। হীলকে বলল, 'লিফট ঠিক হয়েছে। নটহ্যাম আর টেলরকে জলদি পাঠিয়ে দাও। বোমা আছে, মনে করিয়ে দিয়ো।' মাইক্রোফোন থেকে হাত সরাল সে। 'দুঃখিত, প্রিয় দর্শকমণ্ডলী। এখুনি আবার শুরু হবে অনুষ্ঠান।'

পরবর্তী দশ মিনিট গোল্ডেন গেট আর আশপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখানো হলো দর্শকদের। তারপর চৌধুরী আবার ফিরে এল মিনি পর্দায়। 'এবার দেখুন—দক্ষিণ টাওয়ার।'

টাওয়ারের মাথায় চেসটন আর ব্যারিকে দেখা গেল, কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করছে। এরপর কেব্‌লে বিস্ফোরক ফিট করার দৃশ্য দেখানো হলো।

কাজ শেষ করে কেব্‌ল্ থেকে টাওয়ারে চলে এল ওরা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের ওপর দিয়ে ওদের দিকে তাকাল জসি। 'সত্যি এক্সপার্ট তোমরা। কিন্তু লোক ভাল নও। পিকি, আরেক সেট ডিটোনেটর খুলে আনতে হবে।'

দর্শকদের উদ্দেশে বিদায় ভাষণ দিচ্ছে কবীর চৌধুরী, এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলল সে।

'অ্যাডমিলার হ্যামিলটন বলছি। আপনার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্যে দুঃখিত, মি. চৌধুরী। কিন্তু কি করব বলুন, এদিকে যে আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর সময় হয়ে গেছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, মিনি পর্দা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে আপনাকে, দর্শকরা এখন আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন। ওই একই চ্যানেলে। এইমাত্র আপনার উপভোগ্য অনুষ্ঠান দেখলাম আমরা। এবার আমাদেরটা দেখতে মর্জি হোক।'

টিভি পর্দায় ক্লোজ-আপে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখা গেল। অন্তত সান ফ্রান্সিসকোর দর্শকরা বুঝতে পারল ব্যাক-গ্রাউন্ডটা প্রেসিডিয়োর।

হ্যামিলটন বললেন, 'ক্রিমিন্যাল চৌধুরীকে ঠেকাবার পথ নেই। তবু এসবের ভেতর থেকে ভাল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন ডেভিড ল্যাংফোর্ড, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস।'

প্রকাণ্ডদেহী ভাইস-প্রেসিডেন্টকে মিনি পর্দায় অত্যন্ত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেখাল। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। বৈরী একদল শ্রোতাকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে জানেন তিনি। তাঁর শব্দ চয়ন এবং বাক্যবাণ হানার কৌশল, কোন তুলনা হয় না। কিন্তু আজ অল্প কথায়, সহজ সুরে ভাষণ দিলেন তিনি।

বললেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও, যা শুনলেন তা সবই সত্যি। আজকের পরিবেশ যতই তিক্ত আর অবমাননাকর হোক, আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমরা আমাদের প্রেসিডেন্টকে বিপদে পড়তে দিইনি এবং কোন অবস্থাতেই দেব না। প্রেসিডেন্ট, রাজকীয় মেহমানদ্বয় এবং আমেরিকার সুনাম, যে-কোন মূল্যে এগুলো আমরা রক্ষা করব। আর তাই, ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে মাথা নত করেছি আমরা। হ্যাঁ, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ক্রিমিন্যাল কবীর চৌধুরী আমাদের সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার নিয়ে পালিয়ে যাবে, আমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিতে বাধ্য। কিন্তু…কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই, চৌধুরী, খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনুন আপনি। আজ সকালে ইনফরমেশন পেয়েছি, ইনফরমেশন না বলে বলা উচিত প্রমাণ পেয়েছি, তা থেকে এ-কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আপনার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আপনার বন্ধুরা একে একে ছেড়ে যাবে আপনাকে। আশ্রয় মিলবে এমন কোন জায়গা আপনার থাকবে না। প্রমাণ চান?'

ভাইস-প্রেসিডেন্টের জায়গায় মিনি পর্দায় রস পেরট এবং অন্যান্যদের দেখা

গেল। ক্যামেরা রয়েছে খুব কাছেও নয়, আবার খুব দূরেও নয়। পাঁচজনের সাথে মাঝখানের চেয়ারে বসে রয়েছে পেরট। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল তাকে, পাশে বসা সঙ্গীদের সাথে কথা বলছে। একটু যেন বেশিই কথা বলছে। কি বলছে তা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না।

টিভি থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের গলা বেরিয়ে এল, 'বাঁ দিক থেকে অ্যাডমিরাল সোরেনসন—ন্যাভাল কমান্ডার ওয়েস্ট কোস্ট। চীফ অভ পুলিস আর্ল ডিকসন—সান ফ্রান্সিসকো। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন—নৃমা। এবং জেনারেল গারল্যান্ড—অফিসার কমান্ডিং, ওয়েস্ট কোস্ট। আপনারাই বলুন, যার ভাগ্যে এঁদের মত কীর্তিমান পুরুষের সঙ্গ জোটে, সে কি আর খারাপ থাকতে পারে?'

নিজের অনুষ্ঠানের সময় হাসছিল চৌধুরী, চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল। এখন সে-সব ভুলে গেছে। চেয়ারের একেবারে কিনারায় বসে আছে সে, এবং এই প্রথম মনের ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়। চোখেমুখে নিখাদ অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে সে মিনি পর্দার দিকে।

'রস পেরট,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কাল রাতেই দল বদল করেছে।' টিভিতে ফিরে এসেছেন তিনি। 'তার দল বদলের কারণ তার ভাষায়, চৌধুরীকে বিশ্বাস করতে পারেনি সে। তার বয়স কম কাজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এটাই সময়। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, অ্যাকটিং হেড অভ স্টেট হিসেবে, এরই মধ্যে রস পেরটকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। অতীতে যে অপরাধই করে থাকুক সে, তার কোন সাজা হবে না। আমার এই আদেশ, আর কেউ যদি দল বদল করতে চায়, তার বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। আবার রস পেরট প্রসঙ্গ। বলছে, চৌধুরীকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। কেন? কারণ হলো, চৌধুরী তার কাছে প্রস্তাব রেখেছিল, মোট সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার তারা দু'জন ভাগ করে নেবে। বাকি সবার কি হবে, রস পেরটের এ-প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী বলেছিল, জাহান্নামে যাবে, জেলে পচে মরবে। তোমার বা আমার তাতে কি! প্রিয় দেশবাসী, বুঝতেই পারছেন, চৌধুরীর এই কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় রস পেরট। তার সন্দেহ হয়, হাতে টাকা পাবার পর চৌধুরী তাকেও ঠকাবে, হয়তো তার পিঠে গেঁথে দেবে আমূল একটা ছোরা। এই পরিস্থিতিতে সে যদি দল বদল করে থাকে, তাকে আমরা বুদ্ধিমান না বলে পারি কি?

'রস পেরট আমাদেরকে আরও জানিয়েছে, ব্রিজ থেকে পালাবার আগে সে তার সহকর্মীদের দু'একজনের সাথে কথা বলে এসেছে। চৌধুরীর অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আভাস পেয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, তারা দল বদলের সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সুযোগ পেলেই কেটে পড়বে। আমাদের তরফ থেকে আমরা শুধু বলতে পারি, একটা মন্দ লোকের কাছ থেকে কেউ যদি পালিয়ে এসে প্রোটেকশন চায়, আমরা তা দিতে বাধ্য। গণতন্ত্র এবং মানবতা; জন্মলগ্ন থেকে এ দুটোই তো আমেরিকার সম্পদ এবং গৌরব।

'চৌধুরীর আরও লোক দল বদল করবে বলে আশা করছি আমরা। কাজেই টিভি থেকে খুব দূরে কেউ থাকবেন না, প্লীজ।'

'যীশু! যীশু!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকাল ডাক্তার। 'চৌধুরী এই আঘাত সামলাবে কিভাবে? মি. প্রদ্যুৎ, এই ধারণাটাও কি আপনার?'

'তাহলে খুশিই হতাম। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কি মনে করেন আপনি? শয়তানী বুদ্ধি আমার চেয়ে কম নেই তাঁর মাথায়।'

'কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি রস পেরট...'

'যা ভাবছেন তা নয়। সে দল বদল করেনি।'

'তাহলে?' অবাক হলো ডাক্তার।

'ক্যামেরা দূর থেকে ছবি নিয়েছে, দেখলেন না? ওষুধ খাইয়ে ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে পেরটের।'

'কিন্তু ব্রিজ থেকে গেল কিভাবে?'

'গেছে খুব ডাঁটের সাথে। সাবমেরিনে চড়ে।'

'সাবমেরিন? সাবমেরিন কোত্থেকে এল?'

'এসেছিল, আপনি জানেন না।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল ডাক্তার।

মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্টেশনে টিভি অনুষ্ঠান দেখছে ওরা। অনুষ্ঠান শেষ হতে সেটা অফ করে দিয়ে চার সঙ্গীর দিকে তাকাল বব ইয়ং। বলল, 'আমাদেরকে ঠকানো হয়েছে।'

সঙ্গীরা চুপ করে থাকল। বব ইয়ঙের সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করল না।

তিনি যে ব্যাপারটা উপভোগ করছেন না, এটা প্রমাণের জন্যে কঠিন চেষ্টা চালাচ্ছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'প্রিয় দেশবাসী, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়েই ভেসে যাবে কুয়াশা, কাজেই মিনিট দুই আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন না। তারপর, কুয়াশা কেটে গেলে, আপনাদের সবার জন্যে সুসংবাদ এবং ক্রিমিন্যাল চৌধুরীর জন্যে দুঃসংবাদ পরিবেশন করব আমরা। এইমাত্র খবর পেলাম, তার দল ছেড়ে আরও চারজন লোক পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এবার ক্রিমিন্যাল চৌধুরীকে বলছি। এতে কোন ভুল নেই যে টাকা আপনি পাবেন, কিন্তু টাকা পাবার পর চলাফেরায় সাবধান হোন। আমার জানা মতে, হাভানা এয়ারপোর্টের রানওয়ে ব্লক করতে ছয় মিনিটের বেশি লাগবে না।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল চৌধুরী, এগোল রিয়্যার কোচের দিকে। তাকে অনুসরণ করল হীল। চৌধুরীর নিজের লোকেরা হয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল, কিংবা বিমূঢ় চেহারা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। কোচে উঠে পিছন দিকে চলে গেল হীল, ফিরে এল এক বোতল স্কচ আর একটা গ্লাস নিয়ে।

'সকাল বেলা আমি খাই না,' বলল চৌধুরী। কিন্তু কথাটায় তেমন জোর

নেই। গ্লাসে স্কচ ভরে সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে, নিল সে।

মাত্র দুই চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করল। 'হীল, কি ভাবছ?'

'আমরা দু'একজন ছাড়া বাকি সব লোক নতুন, স্যার,' বলল হীল। 'এই টিভি অনুষ্ঠানের পর তারা যদি আপনার ওপর থেকে আস্থা হরিয়ে ফেলে, তাদের আপনি দুষতে পারেন না। এখানে আসার সময় ওরা আপনাকে কিভাবে দেখছিল, লক্ষ্য করেছেন?'

'হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। না, ওদেরকে আমি দোষ দিই না। রস পেরট। তোমার কি মনে হয়?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল হীল।

'যদি বিশ্বাস করি আজ রাতে সূর্য আকাশে থাকবে তাহলে বিশ্বাস করি পেরট দল বদলেছে,' বলল চৌধুরী। 'দেখলে না, ক্যামেরা একবারও তার সামনে গেল না! তাছাড়া, তাকে কথা বলারও সুযোগ দেয়া হয়নি। এসব থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, নেশার ঘোরে আছে সে। তাকে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।' বেডলারকে দোরগোড়ায় দেখা যেতেই চুপ করে গেল সে।

হীল বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে এসো। তোমাকে ম্লান দেখাচ্ছে!'

'মন ভাল নেই,' স্বীকার করল বেডলার। 'যে যাই বলুক, পেরট দল বদল করেছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। নটহ্যাম আর টেলর এত দেরি করছে কেন? ওদের তো আরও আগে ফিরে আসার কথা।'

'তাই তো!' চমকে উঠল হীল।

'আমার সন্দেহ,' বলল বেডলার। 'ওরা আর ফিরে আসবে না। ভাইস-প্রেসিডেন্ট যে চারজনের কথা বললেন, তাদের দু'জন নটহ্যাম আর টেলর না হয়েই যায় না।'

'বাকি দু'জন চেস্টন আর ব্যারি?' জিজ্ঞেস করল চৌধুরী।

'আমার তাই ধারণা, স্যার,' বলল হীল।

'এসব কেন ঘটছে? কিভাবে ঘটছে?' হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেহারা আগুন হয়ে উঠল চৌধুরীর। 'আমরা একমত, পেরট দল বদল করেনি। আমরা একমত, ড্রাগ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। সেটা জানতে পারলেই এই রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। ব্রিজ থেকে পেরট গেল কিভাবে?'

হীল মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তখন আমি এখানে ছিলাম না। রাতের বেলা দু'বার আলো চলে গিয়েছিল, তখনই হয়তো গেছে সে।'

'দু'বারই আমার সাথে ছিল সে,' বলল চৌধুরী।

'আপনাকে আমি আগেও একবার কথাটা বলেছি, স্যার,' বলল বেডলার। 'পচা আপেল। আমাদের মধ্যে কেউ একজন বেঈমান আছে।' ব্রিজের ওপর দিয়ে কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে, সেদিকে আনমনে তাকিয়ে আবার বলল সে, 'এই ব্রিজে আর একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

দশ

পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে পেরিয়ে গেল কুয়াশা। উজ্জ্বল রোদ মেখে আবার হেসে উঠল গোল্ডেন গেট ব্রিজ। ব্রিজের মাঝখানে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে কবীর চৌধুরী। বেডলারকে এগিয়ে আসতে দেখে থামল সে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ফোন, স্যার। দু'মিনিটের মধ্যে টিভি অন করতে অনুরোধ করলেন।'

কথা না বলে আবার পায়চারি শুরু করল চৌধুরী। এগিয়ে গিয়ে টিভি সেটটা অন করল বেডলার।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় এবার নিজেই থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তাঁর ভঙ্গিটা ভাইস-প্রেসিডেন্টের মত নয়, তবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে যথেষ্ট উপাদান থাকল। তাঁর কথা বলার ধরনটাই দারুণ উপভোগ্য।

'বাজারে জোর গুজব, বিপথগামী সম্রাট কবীর চৌধুরীর সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। তার প্রধানমন্ত্রী রুস পেরট আগেই বিদ্রোহ করেছে, সে-খবর আপনারা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার আরও চারজন সদস্যকে বিদ্রোহ করতে রাজি করিয়ে এসেছিল। আমাদের সবার জন্যে সুখবর, সত্যি সত্যি তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন। নিজের চোখেই দেখুন আপনারা।'

মিনি পর্দার ছবি বদলে গেল। লম্বা একটা টেবিলে চারজন বসে রয়েছে। কারও মুখে হাসি নেই, সবাই মাথা নিচু করে আছে। মিনি পর্দার এক কোণে দেখা গেল অ্যাডমিরালকে। 'এদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই, লেডিস এ্যান্ড জেন্টেলমেন! বাঁ দিক থেকে সর্বজনাব চেসটন, ব্যারি, নটহ্যাম এবং টেলর। আরও একটা খবর। চৌধুরী মন্ত্রীসভার একজন সিনিয়র মন্ত্রী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমরা সবিস্ময়ে ভাবছি, এরপর কি ঘটবে? আপনাদের সদয় মনোযোগের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ক্যামেরা ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় একজন পুলিস অফিসার অ্যাডমিরালের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনার টেলিফোন, স্যার। মাউন্ট টামালপাইজ থেকে।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে কমিউনিকেশন ওয়াগনে পৌঁছলেন হ্যামিলটন। রিসিভার কানে তুলে মনোযোগ দিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন তিনি। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন আর পুলিস চীফের দিকে তাকালেন। 'দুটো হেলিকপ্টার দরকার। একটায় থাকবে টিভি ক্যামেরা আর ক্রু। আরেকটায় থাকবে আর্মড পুলিস। পেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'দশ মিনিট,' আশ্বাস দিলেন জেনারেল গারল্যান্ড। 'খুব বেশি হলে বারো।'

*

'সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' পায়চারি থামিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'ইমার্জেন্সী টেক-অফের জন্যে প্রস্তুতি নেব আমরা। চারদিক থেকে খোঁচা মেরে আমাকে ওরা পাগল করে তোলার চেষ্টা করছে। আমি এর প্রতিশোধ নেব। ওদের এত সাধের গোল্ডেন গেট ব্রিজ আমি উড়িয়ে দেব।'

কেউ কোন কথা বলল না।

'উত্তর টাওয়ারের পশ্চিম কেব্‌লে এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ফিট করার জন্যে কাউকে পাঠানো বোধহয় বোকামি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বলল হীল। 'তাহলে আরও দু'জনকে হারাব আমরা।'

'এক কাজ করো, আমাদের লেভেলেই ফিট করাও ওগুলো। দুই হেলিকপ্টারের মাঝখানে, ওই একই কেব্‌লে। আমার মনে হয়, তাতেও গোটা ব্রিজ ভেঙে পড়বে।'

কাজটা সারতে আধঘণ্টা লাগল। কাজ শেষ হয়েছে এই রিপোর্ট দিয়ে বেডলার জানাল, 'হ্যামিলটন খবর দিলেন, স্যার। বলছেন, দু'মিনিটের মধ্যে টিভিতে একটা অনুষ্ঠান আছে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পাঁচ মিনিট পর ফোনে আপনার সাথে কথা বলবেন তিনি। জানালেন, পুব থেকে নাকি দারুণ মজার দুটো খবর এসেছে।'

'শয়তানের ধাড়ী আবার কি মতলব এঁটেছে কে জানে!' বিড় বিড় করতে করতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল চৌধুরী। তার পিছনের সীটগুলো দ্রুত দখল হয়ে গেল। জ্যান্ত হয়ে উঠল মিনি পর্দা।

প্রকাণ্ড সাদা একটা গলফ বলের মত দেখা গেল—মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্ক্যানার। তারপর ক্যামেরা জুম করল দশজন লোকের ওপর। আর্মড পুলিস। তাদের একটু সামনে দেখা গেল পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনকে, হাতে মাইক্রোফোন। খোলা একটা দরজার দিকে এগোলেন তিনি, তাঁকে অনুসরণ করল ক্যামেরা। খোলা দরজা দিয়ে একে একে বেরিয়ে এল পাঁচজন লোক, সবাই মাথার ওপর হাত তুলে আছে। পুলিস চীফের সামনে এক সারিতে দাঁড়াল তারা। তাদের মধ্যে একজন আরও দু'পা সামনে গিয়ে থামল।

পুলিস চীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বব ইয়ং?'

'জী।'

'আমি ডিকসন। চীফ অভ পুলিস, সান ফ্রান্সিসকো। তোমরা কি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছ?'

'জী।'

'কেন?'

'আপনাদের গুলি খেয়ে মরতে চাই না, আবার পিঠে চৌধুরীর ছুরি খেয়েও পটল তোলার ইচ্ছে নেই।'

'তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। যাও, ভ্যানে ওঠো।' ওদেরকে এগোতে দেখলেন ডিকসন, তারপর মাইক্রোফোনে কথা বললেন, 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা

অ্যাডমিরালের মত ভাষণ দেয়ার যোগ্যতা আমার নেই। সরল ভাষায় আমি শুধু বলতে চাই, এই তো মাত্র সকাল, এরই মধ্যে দশজন দল বদলেছে, সেটাকে কোন হিসেবেই মন্দ বলা চলে না। তাছাড়া, সকাল শেষ হতে এখনও তো দেরি আছে। একটি ঘোষণা! অন্তত আগামী এক ঘন্টা আমাদের আর কোন প্রোগ্রাম নেই।'

উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল রানা। মাত্র দু'সেকেন্ডের ব্যবধানে জেনারেল পীল আর ইউ. পি. রিপোর্টার বিল গাইডেনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো ওর।

রিপোর্টার আর জিম্মিরা ধীরে-সুস্থে যে যার কোচের দিকে ফিরে যাচ্ছে। রিপোর্টাররা রিপোর্ট লিখতে বসবে, কিংবা রিলোড করবে ক্যামেরা। আর জিম্মিরা, কোন সন্দেহ নেই, কোচে উঠেই প্রথমে গলা ভেজাবেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টকে দেখে রানার মনে হলো, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তাঁর। তাছাড়া, এই গরমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কোচ হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁদেরকে।

জিম্মিরা সবাই কোচে ওঠার পর তাদের পিছু পিছু গার্ড জ্যাকও উঠল। দরজার তালা বন্ধ করল সে, চাবিটা পকেটে ভরে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, তার দিকে পিস্তল তাক করে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল পীল। জ্যাকের হাতে মেশিন-পিস্তল রয়েছে, কিন্তু ব্যারেলটা নিচের দিকে তাক করা।

'চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। হাতের ওটা নড়তে দেখলেই গুলি করব, আমি।'

'কি ওটা? খেলনা পিস্তল?' জানতে চাইল জ্যাক। 'ওটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারলেও ব্যথা পাব না। কিন্তু আমি আপনাকে গুলি করে ছাতু বানিয়ে দিতে পারি।'

'খেলনা নয়, এটা একটা সায়ানাইড গান,' জেনারেল বললেন। 'বুলেট শুধু যদি তোমার চামড়া ভেদ করে, তাতেই তুমি সাথে সাথে মারা যাবে। মেঝেতে পড়ার আগেই।'

'আমার দেশে হলে,' রাজা বললেন, 'এতক্ষণে মারা যেত ও।'

'টিভি অনুষ্ঠান দেখেও তোমার চোখ খোলেনি?' জেনারেল জানতে চাইলেন, 'ভালয় ভালয় মেশিন-পিস্তলটা দিয়ে দাও।'

জ্যাক বোকা নয়। মেশিন-পিস্তল হস্তান্তর করল সে। তাকে নিয়ে কোচের পিছন দিকে চলে গেলেন জেনারেল। ওয়াশরুমের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে ফিরে এলেন।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

'দু'এক মিনিটের মধ্যে বাইরে বোমা পড়বে,' জেনারেল পীল বললেন। 'এই বোমার কাজ হলো বাতাস থেকে অক্সিজেন খেয়ে ফেলা। কাজেই আমরা কেউ বাইরে বেরুচ্ছি না। দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে।'

'আচ্ছা!' প্রেসিডেন্ট যার-পর-নাই বিস্মিত।

'পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলে আমাদের দু'একজনকে গুলি করে মারার জন্যে এই কোচে উঠতে চাইবে চৌধুরী,' আবার বললেন পীল। 'দরজা বন্ধ থাকায় তা সে পারবে না। তখন হয়তো গুলি করবে, কিন্তু কাঁচগুলো বুলেট-প্রুফ। সবশেষে, আমরা হয়তো হেলিকপ্টারে চড়তে যাচ্ছি। কিন্তু হেলিকপ্টার কোথাও যাবে না।'

'পীল, এসব ইনফরমেশন কোত্থেকে পেলে তুমি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'বিশ্বস্তসূত্রে। সে-ই আমাকে এই সায়ানাইড গান দিয়েছে। মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা! এসবের সাথে কিভাবে জড়িত সে? তাকে আমি চিনি বলে মনে হয় না।'

'পরিচয় হবে, স্যার। ছেলেটা বিদেশী। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তার একজন ভক্ত।'

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রেসিডেন্টের। 'বোধহয় ভুল করলে। বোধহয় উল্টোটা বলতে চাও।'

'না, স্যার,' পীল হাসলেন। 'হ্যামিলটনের সাথে কথা হয়েছে আমার। তাঁর মুখ থেকেই জানলাম। তিনিই রানার ভক্ত।'

'নিশ্চয়ই অসাধারণ গুণী ছেলে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু দুঃখ হলো, সবই জানি আমি, কিন্তু সবার চেয়ে পরে। কেউ আমাকে সময়মত কিছু বলে না।'

শেষ লোকটা না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ধাপ বেয়ে কোচে উঠেই গার্ড হুয়ানের ডান কানের পিছনে দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। মেশিন-পিস্তলটা সহ তাকে ধরে ফেলল ও। দরজা বন্ধ করার জন্যে চাবি বের করেছিল হুয়ান, জ্ঞান হারালেও সেটা এখনও তার হাতের মুঠোয় রয়েছে। মুঠো থেকে চাবি নিয়ে পকেটে ভরল রানা। অজ্ঞান হুয়ানকে তুলে বসিয়ে দিল ড্রাইভারের সীটের সামনে।

একমাত্র বিল গাইডেন ছাড়া রিপোর্টাররা চাপা গলায় হাজারটা প্রশ্ন করল ওকে। রানা নিরুত্তর। হুয়ানের চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করল ও। তারপর বের করল রেডিও। 'রানা।'

'ডিকসন।'

'রেডি?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এখনও কথা বলছেন চৌধুরীর সাথে।'

'কথা শেষ হলেই জানাবেন আমাকে।'

'টাকা তাহলে ইউরোপে পৌঁছে গেছে?' ফোনে বলল কবীর চৌধুরী। 'চমৎকার। কিন্তু একটা কোড-ওয়ার্ড থাকার কথা ছিল।'

'ছিল,' শুকনো গলায় বললেন হ্যামিলটন। 'এবারেরটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। "নিরুদ্দেশ"।'

মৃদু হাসল চৌধুরী।

রানার রিসিভার থেকে পুলিস চীফের গলা ভেসে এল, 'ওদের কথা শেষ হয়েছে।'

'ক্লিয়ার উইথ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'ক্লিয়ার।'

'নাউ।'

ক্যামেরা কেসে ট্রানজিসটার ঢোকাল না রানা। সেটা পকেটে ভরে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে রেখে দিল মেঝেতে। দরজার তালা খুলল ও, চাবি থাকল কী হোলে, কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রাখল একটা। রিয়্যার কোচ থেকে মাত্র নেমেছে চৌধুরী, এই সময় প্রথম স্মোক বোম বিস্ফোরিত হলো প্রায় দুশো গজ দূরে। পরেরটা ফাটল দু'সেকেন্ড পর, দেড়শো গজ দূরে। কোচ থেকে নেমে যেখানে দাঁড়িয়েছিল চৌধুরী, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ় এবং পঙ্গু মনে হলো তাকে। কিন্তু ডাক্তারকে লেজ তুলে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটতে দেখল রানা।

হঠাৎ করেই সংবিৎ ফিরে পেল চৌধুরী। লাফ দিয়ে কোচে উঠল সে। ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যামিলটন! ডিকসন!' তার মাথার ঠিক নেই। পাঁচ মিনিট আগে মাউন্ট টামালপাইজে দেখা গেছে পুলিস চীফকে, এত তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে আসতে পারবেন না।

'হ্যামিলটন বলছি।'

'ব্যাটা শয়তানের ধাড়ী! এসব কি শুরু হয়েছে?'

'ভদ্র ভাষায় কথা বলুন, মি. চৌধুরী।' অ্যাডমিরাল উত্তেজিত নন।

ঘন ধোঁয়া খুব বেশি হলে কোচের কাছ থেকে আর মাত্র পঁচাত্তর গজ দূরে হবে।

'প্রেসিডেনশিয়াল কোচে যাচ্ছি আমি,' হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'অনেক হুমকি দিয়েছি, আর নয়। এবার সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্টের কান কাটব আমি!' রিসিভারটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখল সে। 'হীল? সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলো, দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ হতে পারে। ওরা ঠিক পাগল হয়ে গেছে।' [illegible]চের পিছন দিক থেকে এগিয়ে এল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। তাদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিল সে। 'তোমাদের আমি কাছছাড়া করতে পারি না। এখানেই থাকো। তোমাকেও আমার দরকার, হীল। সবাইকে তৈরি থাকতে বলে ফিরে এসো এখানে। তারপর ফোনে শয়তানের ধাড়ীটাকে বলো আমি কি করছি।'

লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল চৌধুরী। ইতোমধ্যে আরও দুটো স্মোক বোম বিস্ফোরিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, ঘন ধোঁয়ার একটা উঁচু পাহাড় খাড়া হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে গেছে দক্ষিণ টাওয়ার। ছুটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে এসে দাঁড়াল চৌধুরী। খপ্ করে হাতল ধরল। টান দিল হ্যাঁচকা। কিন্তু এক চুল নড়ল না দরজা।

আরেকটা স্মোক বোম ফাটল। এটা ফাটল রিয়্যার কোচের কাছাকাছি।

দরজার গায়ে বসানো জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল চৌধুরী, সেই সাথে হাতের পিস্তল দিয়ে কাঁচে বাড়ি মারল। দেখল, ড্রাইভিং সীটটা খালি। ওটাতেই গার্ড জ্যাকের বসে থাকার কথা। জানালায় দেখা গেল জেনারেল পীলকে. সেই একই সময়ে স্মোক বোম ফাটল আরেকটা।

জেনারেলের উদ্দেশে চিৎকার জুড়ে দিল চৌধুরী। ভুলেই গেছে, কোচটা সাউন্ডপ্রুফ। আঙুল দিয়ে ড্রাইভিং সীটটা দেখাল সে। উত্তরে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল। পরপর চারটে গুলি করল চৌধুরী। কিন্তু তালার কোন ক্ষতি হলো না. দরজাটাও গোঁয়ারের মত অটল থাকল।

পরের বোমাটা ফাটল চৌধুরীর ঠিক উল্টোদিকে। ঘন আর ঝাঁঝাল, উৎকট গন্ধ নিয়ে তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ধোঁয়া। আরও দুটো গুলি করল সে, আবার হাতল ধরে টানল।

লীড কোচের কী-হোল থেকে চাবি বের করল রানা, নেমে এল রাস্তায়। দরজা বন্ধ করল, কিন্তু কী-হোল থেকে চাবি বের করল না। ঘুরতে যাবে, কাছাকাছি একটা বোমা ফাটল। নাক আর গলা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ধোঁয়া, কিন্তু অচল করে দেয়ার মত নয়।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ছুটল কবীর চৌধুরী। রিয়্যার কোচের দরজা বন্ধ দেখে খুলল সেটা, ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে আবার বন্ধ করল। ভেতরের বাতাস পরিষ্কার, আলো জ্বলছে। এয়ার-কন্ডিশন চালু। ফোনে কথা বলছে হীল।

খক্ খক্ কাশিটা এতক্ষণে থামল চৌধুরীর। 'ভেতরে ঢুকতে পারিনি। দরজা বন্ধ, জ্যাককেও দেখলাম না। এদিকের খবর?'

'হ্যামিলটনের সাথে কথা হলো। বলছেন, এ-ব্যাপারে কিছুই তিনি জানেন না। সত্যি না মিথ্যে, বুঝছি না। ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ডাকতে পাঠিয়েছেন তিনি।'

ছোঁ দিয়ে রিসিভারটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল চৌধুরী। কানে তুলতেই ডেভিড ল্যাংফোর্ডের গলা শুনতে পেল সে। 'কে?'

'কবীর চৌধুরী।'

'কোন হামলা চালানো হয়নি। কোন হামলা চালানো হবেও না। আপনি কি আমাদেরকে পাগল মনে করেন? সাতজন জিম্মির মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছেন, এই অবস্থায় কোন্ সাহসে আপনাকে আমরা ঘাঁটাতে যাই? কাজটা আর্মির। ঠিক আর্মিরও নয়। জেনারেল গারল্যান্ডের—হ্যাঁ, উন্মাদ হয়ে গেছে সে। একমাত্র ওপরওয়ালাই বলতে পারবেন এ থেকে কি আশা করে সে। ফোনে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাকে থামাবার জন্যে অ্যাডমিরাল সোরেনসনকে পাঠিয়েছি আমি। হয় তাকে থামতে হবে, নয়তো ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হবে।'

হীল জানতে চাইল, 'আপনার বিশ্বাস হয়, স্যার?'

'একমাত্র খোদাই বলতে পারে। এটা সম্ভব। যুক্তি আছে। এখান থেকে নড়বে না। দরজা বন্ধ থাকবে।'

কোচ থেকে রাস্তায় নেমে এল চৌধুরী। ধোঁয়া পাতলা হয়ে আসছে, তবু খক্

খক্ করে কাশতে শুরু করল সে। চোখ দিয়ে হড় হড় করে পানি নেমে আসছে। তিন পা এগিয়েছে, নরম কিছুর সাথে ধাক্কা খেলো। 'কে?'

'বেডলার, স্যার।' মুখ খুলেছে, অমনি প্রচণ্ড কাশি পেয়ে বসল তাকে। কাশতে কাশতেই জানতে চাইল, 'এসব কি, স্যার?'

'কি জানি। ল্যাংফোর্ড বলছে, কিছু না। আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখছ?'

বেডলার কিছু বলার আগেই বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। পর পর ছয়টা আওয়াজ হলো। 'স্যার! কি ওগুলো? স্মোক বোমার আওয়াজ তো এরকম না!'

একটু পরই পরিষ্কার হয়ে গেল, না, ওগুলো স্মোক বোম নয়। দু'জনেই অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস শুরু করল, কিন্তু প্রয়োজন মত পাচ্ছে না। কি ঘটছে, বুঝে নিল চৌধুরী। নিজের দম আটকে বেডলারকে ধরল সে, তাকে টেনে নিয়ে চলল রিয়্যার কোচের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোচে উঠল তারা। দরজা বন্ধ করল। ভেতরে ঢুকেই জ্ঞান হারিয়ে কোচের মেঝেতে পড়ে গেল বেডলার। চৌধুরী তার পাশে বসে পড়ল। জ্ঞান হারায়নি বটে, তবে আরেকটু হলে হারাত। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওরা সি-ইউ-বি ব্যবহার করছে।'

চমকে উঠল হীল। 'সি-ইউ-বি!' এই প্রথম তার চেহারায় ছায়া ফেলল মৃত্যু ভয়।

'হ্যাঁ। ওরা এখন সিরিয়াস।'

অন্তত জেনারেল পীল খুবই সিরিয়াস। জ্যাকের মেশিন-পিস্তল হাতে নিয়ে ওয়াশ-রূমের দরজা খুললেন তিনি। ঠাণ্ডা সুরে বললেন, 'আমি আর্মির চীফ অভ স্টাফ। এধরনের ইমার্জেন্সীতে আমার আচরণের জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি, এমন কি প্রেসিডেন্টকেও না। দরজার চাবি দাও, তা না হলে তোমার মাথায় গুলি করব।'

দু'সেকেন্ডের মধ্যে চাবিটা জেনারেলের হাতে চলে এল। তিনি আদেশ করলেন, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

জ্যাক ঘুরল, আর প্রায় সাথে সাথেই ঢলে পড়ল মেঝেতে। জ্যাকের মাথায় পিস্তলের বাড়িটা একটু হয়তো জোরেই মেরে বসেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে সবাই বুঝল মারটা মেরে দুঃখের চেয়ে আনন্দই বেশি পেয়েছেন তিনি।

ওয়াশ-রূমের দরজা বন্ধ করলেন জেনারেল। পকেটে চাবি ফেললেন। সামনের দিকে এগিয়ে এসে বিমূঢ় প্রেসিডেন্টের সীটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন মেশিন-পিস্তলটা। তারপর শান্ত ভাবে গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের সীটে। কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম আর নবের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর আন্দাজের ওপর একটা বোতামে চাপ দিলেন। কাজ হলো না দেখে আরেকটা নব ঘোরালেন। তারপর আরেকটা। এইভাবে চলল।

তারপর একসময় আওয়াজ পেলেন তিনি। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন,

দরজার গায়ে বসানো বুলেটপ্রুফ কাঁচ সরে যাচ্ছে। সীট থেকে উঠে এসে সাবধানে বাইরে উঁকি দিলেন জেনারেল। নাক কুঁচকে ঘ্রাণ নিলেন বাতাসের। তারপর এক ছুটে ফিরে এলেন ড্রাইভিং সীটে। শেষ নবটা এবার উল্টোদিকে ঘোরালেন তিনি। দরজার কাঁচ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার, এবার অত্যন্ত সাবধানে, মাত্র কয়েক চুল ঘোরালেন নবটা। মাত্র এক ইঞ্চি সরল দরজার কাঁচ।

দরজার সামনে চলে এলেন তিনি। দরজার চাবিটা এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়। ফিরে এসে ফাঁকটুকু বন্ধ করলেন।

বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে গেল সমস্ত ধোঁয়া, মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্রিজ। রিয়্যার কোচের দরজা খুলে উঁকি দিল কবীর চৌধুরী। বাতাস তাজা, মিষ্টি এবং পরিষ্কার। রাস্তায় নামল সে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোকে দেখল একবার করে। তারপর ছুটল। হীল, ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ অনুসরণ করল তাকে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে বেডলার, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়তে বারণ করা হয়েছে তাকে।

ব্রিজে পড়ে থাকা লোকগুলোকে পরীক্ষা করল ওরা। হীল বলল, 'সবাই বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই, তবে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই।'

ভুরু কুঁচকে আছে চৌধুরীর। 'সি-ইউ-বি ব্যবহার করা হলো, তারপরও? ব্যাপারটা বুঝছি না। এদের সবাইকে হেলিকপ্টারে তোলো, মারকুয়েজ। কাজ শেষ হলে টেক-অফ করবে।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে ছুটল চৌধুরী। দূর থেকেই দেখতে পেল চাবিটা পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে দরজা খুলল সে। ঢুকল কোচে। দেখল, ড্রাইভিং সীটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল পীল। কঠিন সুরে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে এখানে?'

'আপনার গার্ড বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ছুটে পালিয়ে গেল, এর বেশি আমরা কেউ কিছু জানি না,' জেনারেল পীল বললেন। 'ধোঁয়াটা এদিকে এগিয়ে আসছে দেখে ভয়ে কাঁপছিল সে।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল চৌধুরী। প্রথমে অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল। তারপর মাথা দোলাল ওপর-নিচে। 'কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।' বলে লীড কোচের দিকে ছুটল সে।

দরজায় চাবি রয়েছে দেখে সেটা ঘুরিয়ে তালা খুলল চৌধুরী। কোচের ভেতর ঢোকার মুখে প্রথমে তাকাল অজ্ঞান হুয়ানের দিকে। ওপরে উঠে এদিক ওদিক চোখ বুলাল। 'প্রদ্যুৎ কোথায়?'

'চলে গেছে,' মুখস্থ করা বুলি নিপুণ ভঙ্গিতে আউড়ে গেল বিল গাইডেন। 'তিনটে ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমি। আপনার গার্ডকে মেরেছে সে। তারপর কথা বলেছে একটা যন্ত্রের সাথে, দেখতে খুদে রেডিওর মত। সবশেষে, যখন ধোঁয়া এল, কোচ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। ছুটে কোথায় যে চলে গেল, আল্লা মালুম।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। 'দেখুন, মি. চৌধুরী,

আমরা সবাই নিরীহ দর্শক মাত্র, এ-দল ও-দল কোন দলেই নেই। আপনি আমাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলবেন কি, বাইরে আসলে কি ঘটছে?'

'কোন্‌দিকে ছুটল সে?'

'উত্তর টাওয়ারের দিকে। তবে দিক বদলে অন্য কোন দিকেও যেতে পারে। উত্তর টাওয়ারের দিকে গিয়ে থাকলে, অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে সে।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল চৌধুরী। তারপর শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এই ব্রিজ আমি উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি। তবে নিরীহ লোকদের মারব না। কোচ চালাতে পারবেন এমন কেউ আছেন?'

এক তরুণ রিপোর্টার উঠে দাঁড়াল। 'আমি পারব।'

'এই কোচ ইমিডিয়েটলি ব্রিজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ইমিডিয়েটলি। দক্ষিণ ব্যারিয়ার দিয়ে।'

লীড কোচের দরজা বন্ধ করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটল চৌধুরী। কাছাকাছি এসেছে, পিছনের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দেখা গেল ডাক্তার অ্যাম্বুকে। বলল, 'এই যে, মি. চৌধুরী! আসলে কি ঘটছে বলুন তো?'

'ব্রিজ থেকে সরে যান। এই মুহূর্তে।'

'সে কি! কেন?'

'ইচ্ছে হলে থাকতেও পারেন। এই ব্রিজ আমি উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।' চলে এল চৌধুরী। এখন আর ছুটছে না। দেখল, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রিয়্যার কোচ থেকে বেরিয়ে এল বেডলার। তাকে নির্দেশ দিল, 'প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

হীল আর ওয়াল্টার পিছনের হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেলিকপ্টারের একটা জানালা দিয়ে মুখ বের করে রয়েছে মারকুয়েজ। চৌধুরী বলল, 'যাও তাহলে। আবার দেখা হবে এয়ারপোর্টে।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পৌঁছয়নি চৌধুরী, তার আগেই ব্রিজ থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে গেল মারকুয়েজ।

লীড হেলিকপ্টারের পিছনের একটা সীটের তলায় গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিল রানা। আশপাশে কোন শব্দ নেই বুঝতে পেরে সীটের তলা থেকে বেরিয়ে এল ও। জানালার কোণ দিয়ে বাইরে তাকাল। সাতজন জিম্মিকে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে আসছে চৌধুরী, হীল আর বেডলার। আবার নিজের জায়গায় লুকিয়ে পড়ল রানা, রেডিও বের করে অন করল সুইচ। 'মি. হ্যামিলটন?'

'স্পিকিং।'

'হেলিকপ্টারের রোটর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা?'

'পাচ্ছি। তোমার ওপর গ্লাস ধরে আছি আমরা।'

'লেজার বীম দিয়ে রোটরটা নেই করে দিন।'

সাতজন জিম্মিকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। বাঁদিকে দুটো ফ্রন্ট সীটে

বসলেন প্রেসিডেন্ট এবং বাদশা। ডানদিকের দুটোয় বসলেন প্রিন্স আর জেনারেল পীল। তাঁদের পিছনে বসলেন মেয়র জেমস ফেয়ার আর তেল মন্ত্রী। তৃতীয় সারিতে বসলেন হীল আর বেডলার। ওদের দু'জনের হাতে একটা করে আগ্নেয়াস্ত্র।

দক্ষিণ টাওয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অ্যাম্বুলেন্স, এই সময় ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল ডাক্তার। জানালার কাঁচ সরে গেল।

'ফিরে চলো,' বলল ডাক্তার। 'আবার ফিরে চলো ব্রিজের মাঝখানে।'

'ফিরে যাব! কিন্তু স্যার, উনি বললেন ব্রিজ উড়িয়ে দেবেন...'

'হুঁহ! বললেই যদি উড়ে যেত! একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তুমি যা ভয় করছ তা নয়। নির্ভয়ে ফিরে চলো।'

সবশেষে হেলিকপ্টারে চড়ল ওয়াল্টার। সে তার সীটে বসতেই চৌধুরী বলল, 'ব্যস। টেক-অফ।'

কান ঝালাপালা করে দিল ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিন্তু তার সাথে বাইরে থেকে যে আওয়াজটা যোগ হওয়ার কথা, সেটা শোনা গেল না। সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াল্টার। সাথে সাথে সমস্ত শব্দ থেমে গেল।

'কি হলো? কি ঘটেছে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়াল্টার, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনি স্যার লেজার বীমের কথাটা ঠিকই বলেছিলেন। এইমাত্র গোল্ডেন গেটে পড়ে গেল রোটর।'

দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ নিল চৌধুরী। একটা ফোনের রিসিভার তুলে বোতামে চাপ দিল সে। 'মারকুয়েজ?'

'স্যার।'

'এখানে একটা সমস্যায় পড়েছি আমরা। ব্রিজে ফিরে এসে আমাদেরকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু, স্যার, তা সম্ভব নয়। আমিও এখানে সমস্যায় পড়েছি। দুটো ফ্যান্টম জেট খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। উপায় নেই, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে হবে আমাদের। আমাকে বলা হয়েছে, ওখানে আমার জন্যে একটা ওয়েলকাম কমিটি অপেক্ষা করছে।'

নিঃশব্দে নিজের পায়ে দাঁড়াল রানা, হাতে রয়েছে সাদা কলম। কলমের বোতামে দু'বার চাপ দিল ও। তৃতীয় সারিতে বসা দু'জন লোকই যে যার সীট থেকে ঢলে পড়ে গেল।

মেঝেতে মেশিন-পিস্তল পড়ার আওয়াজ শুনেই ঝট্ করে ঘুরল চৌধুরী, হাতে পিস্তল। রানার হাতে কলম রয়েছে কিন্তু সুঁইটা অতদূর যাবে না।

'প্রদ্যুৎ!' ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম! মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে যাও!'

সময় নিয়ে, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করল চৌধুরী। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তার বুকে। ট্রিগারটা পুরোপুরি টেনে দিতে একটু দেরি করছে সে, কারণ চরম শত্রুকে পরপারে পাঠাবার আগে তার চেহারাটা আতঙ্কে বিকৃত হয়ে ওঠে কিনা দেখতে চায় সে।

জোর করে একটু হাসল রানা। 'তার আগে চারপাশটা একটু দেখে নিলে ভাল হত না? কয়েকটা পিস্তল চেয়ে রয়েছে তোমার দিকে। জেনারেল পীলের হাতেরটা আবার সায়ানাইড গান।'

'ঠিকই বলেছে রানা।' পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল।

'রানা!' ভয়ানকভাবে চমকে উঠল কবীর চৌধুরী। 'তুমি রানা? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। সেই মাসুদ রানাই।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল!' কঠোর হয়ে উঠল চৌধুরীর মুখ। 'তুমিই···তোমারই জন্যে শেষ হয়ে গেল সব। মরব, কিন্তু একা মরব না, রানা! তৈরি হয়ে···উহ্!' ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে।

হাতের ছড়ি দিয়ে চৌধুরীর মুখে একটা খোঁচা মেরেছেন প্রেসিডেন্ট। সেই সাথে রানাও ডাইভ দিয়ে পড়েছে প্যাসেজে, মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে হীলের মেশিন-পিস্তল। হাত ঝাপটা দিয়ে প্রেসিডেন্টের ছড়ি সরিয়ে দিল চৌধুরী, কিন্তু ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে রানা। প্যাসেজে শোয়া অবস্থা থেকে চৌধুরীর মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছে ও। বলল, 'পিস্তল ফেলে মাথার ওপর হাত তোলো, চৌধুরী! পাগলামি কোরো না।'

খটাশ করে পড়ল পিস্তল। মাথার ওপর উঠে গেল দুই হাত।

এক ধারে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা। একধারে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে। দলে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সাতজন ডিসিশন-মেকার।

এবং রানা।

সবুজনয়না জুলির একটা হাত ধরে আছে মাসুদ রানা। হেলিকপ্টার থেকে স্ট্রেচার নামানো হচ্ছে। একদল পুলিস আর সৈনিক সেগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দিচ্ছে মিলিটারি হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সে। সবাই দেখছেন দৃশ্যটা। কারও মুখে কোন কথা নেই। বলার আছেই বা কি!

প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'আমাদের রাজকীয় বন্ধুরা?'

'সান রাফায়েলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন,' ডেভিড ল্যাংফোর্ড বললেন। 'কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না।' হাসলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'গোটা ব্যাপারটাকেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন তাঁরা। বললেন, দারুণ উপভোগ করেছেন। যতদূর বুঝতে পারি, এই ঘটনার ফলে যাঁর যাঁর দেশে তাঁরা বীর হিসেবে অভ্যর্থনা পাবেন। নিজেদের ঢাক পেটাবার মস্ত একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন তাঁরা।'

'আমারও তাহলে যাওয়া উচিত,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওঁদের সাথে কথা বলতে হবে।'

ভাইস-প্রেসিডেন্টকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ঘুরে দাঁড়ালেন. এই সময় রানা বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

চোখেমুখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাকে? তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ? আমিই তো তোমাকে ইতিমধ্যে একশো বার ধন্যবাদ দিয়েছি!'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কারও কাছে ঋণী থাকতে পছন্দ করি না, কিন্তু প্রাণের ওপর দরদ আছে তো. সেটা রক্ষায় যদি কেউ সাহায্য করেন ঋণী না থেকে উপায় কি।'

নিঃশব্দে হাসলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর ভাইস-প্রেসিডেন্টকে নিয়ে চলে গেলেন।

'রানা, আমার সাথে তোমাকে একবার পুলিস হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। তুমি একটা রিপোর্ট লিখে দিলে আমার খুব সুবিধে হয়। সিনেট আর কংগ্রেসকে তাহলে খুব সহজে সব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব।'

'এখন?' মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আগের কাজ আগে। দেখতে পাচ্ছেন না, আমার সাথে সবুজ একজোড়া চোখ রয়েছে? ওকে কথা দিয়েছি, ডিনার খাওয়াব। ইতিমধ্যে দাড়ি কামাতে হবে আমাকে, শাওয়ার নেব—অর্থাৎ আজ একদম সময় হবে না। কাল দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে,' হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আর, এসবের বদলে কোন উপকার যদি দরকার হয়, সেটা কি, ঠিক করে এসো। আমার সাথে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তা তো তুমি জানোই।'

জুলিকে নিয়ে ডাক্তার অ্যাম্বুর দিকে এগোল রানা। নিজের অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ডাক্তার। মুচকি হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

* * * *